বার-ভূঞা

বা

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস

শ্রীআনন্দনাথ রায়

প্রণীত

কলিকাতা

১৬ নং সাগর ধরের লেন,

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কর্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৮ সাল

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা মাত্র

সাথী প্রেস
২১।১, পটুয়াটোলা লেন
শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

— প্রাপ্তিস্থান —

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।
২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।
লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা আশুতোষ লাইব্রেরী।
৩৯, হ্যারিসন রোড, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়
মগর পোঃ উপসী, জেলা ফরিদপুর,
শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট।

গ্রন্থকারের ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড, মূল্য ॥০ আট আনা।
এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

ভূমিকা

দূরবর্ত্তী প্রদেশের বিবরণ বাঙ্গালী যতটা পরিজ্ঞাত, অদ্যাপি স্বদেশকে তাহারা ততটা চিনিয়া লইতে পারে নাই ; কারণ কত স্তূপের নিম্নে, কত স্রোতস্বতীর তলগর্ভে যে, উহার অত্যুজ্জ্বল রত্ননিচয়ের সমাধিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কয়জনে লইয়া থাকেন ? একমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীর সহিত যেটুকু জড়িত হইয়া রহিয়াছে, আমরা উত্তরাধিকারীসূত্রে তাহারই অধিকারী হইয়া রহিয়াছি। মূল মালমসল্লা নাই বলিতে কিছুই নাই। বর্ত্তমানে দেশীয় কতিপয় মাননীয় তত্ত্ববিৎ তদুদ্দেশ্যে বিস্তর গবেষণা করিতেছেন বটে, কিন্তু এই রত্ন-রাজির যথার্থ উদ্ধারণ কতদিনে সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন।

বারভূঞার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় কিছু ততটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। তথাপি উহার উপর এমন একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছে যে, মাজিয়া ঘসিয়া উহাকে প্রকৃত উজ্জলতায় উপনীত করিতে আরও কতকটা সময়-সাপেক্ষ। নানাকথার অসামঞ্জস্য এখনও রহিয়া গিয়াছে, উহার মীমাংসা সংসাধন ক্রমে হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

দেশের অবস্থানুসারে কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে মনে স্বতই একটা আশঙ্কার উদ্রেক হয়, কারণ ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচনার অধিকারী। অথচ স্বদেশের প্রকৃত তথ্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত, কয়জনে কতদূর অবগত আছেন, তাহা অদ্যাপি পরিজ্ঞাত হইতে পারি

নাই। তথাপি সুখের কথা এই যে, বঙ্গদেশীয় সমালোচক মাত্রেরই একাধারে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি সমালোচনা করিবার যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছে, পৃথিবীর উন্নত-সমাজেও সেইরূপ লোক বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। শুনিয়াছি ঐ সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকগণ দ্বারা ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সমূহের সমালোচনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কথায় আছে, "যিনি অগ্রে গমন করেন, তাঁহারই ব্যাঘ্রের ভয়," যশঃ নাই, অযশঃ আছে ; তাহা বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে ত কোন কার্য্য কখনই হইয়া উঠিতে পারে না। সমালোচনার ফলে ও বাদ প্রতিবাদে সময়ক্রমে সত্য অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িবে, তখন উহা মানিয়া লওয়াও সুসঙ্গত। *

বর্ত্তমান গ্রন্থমধ্যে অনেক অভিজ্ঞ লোকের লেখার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা বলিয়া লেখক যদি মনে করে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অবিজ্ঞ তবে তৎসদৃশ অব্যবস্থিতচিত্ত আর কেহই হইতে পারে না। তাহার মন্তব্য দোষযুক্ত প্রতিপন্ন হইলে, বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে। কয়েকটী প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক নানারূপ অগ্নি-পরীক্ষা মস্তকে ধারণ করিয়াই লেখককে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইল।

বারভূঞা বা দ্বাদশ মণ্ডলেয় প্রথা ভারতের নানা অংশে বিশেষতঃ আসাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় বারভূঞাদের মধ্যে প্রধানগণ কায়স্থবংশীয় ছিলেন।

---

* দেশের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া প্রতিবেশীদের নিকট কতটা সাহায্য পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা মনের আবেগে ১৭১ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি, এজন্য তৎসম্বন্ধে আর কোন কথা এই স্থানে উল্লেখ করিলাম না।

অতএব এই ইতিহাস ঐ যুগের কায়স্থ কীর্ত্তির এক প্রধান উপাদান; অন্য হিসাবে বাঙ্গালীর অক্ষয় গৌরবাত্মক নিদর্শন। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই যে সেইকালে রণনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসাময়িক বিবরণ পাঠে তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

বারভূঞার মত একখানা প্রাচীন ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিব বলিয়া কোন কালেও মনে স্থানপ্রদান করি নাই! ভূতপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত পত্রিকায় বারভূঞা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি কিন্তু এই কার্য্যে প্রথমতঃ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই; কিন্তু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় ঔৎসুক্য আমি কোনমতে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইলাম না। ১৩০৭ সনের বৈশাখের নির্ম্মাল্যে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রবন্ধের অবতারণা হয়। সমালোচনা-ক্ষেত্রে সাহিত্য, এডুকেশন গেজেট ও বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় এই প্রবন্ধটীর সমালোচনা আমার নিকটে নিতান্ত উৎসাহের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয়ও উহার অন্যতম কারণে। কিছুদিন পরে নির্ম্মাল্য বৃন্তচ্যুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, এই প্রবন্ধ ক্রমশঃ নব্যভারত-পত্রিকায় ১৩১০ সন পর্য্যন্ত বাহির হয়। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রবন্ধের আরম্ভ ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের উৎসাহে অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়; এইজন্য ইঁহারা উভয়েই ধন্যবাদার্হ।

সাধারণভাবে বারভূঞার বিবরণ লিখিত হইলে পর, উহা সুধু গল্পের ন্যায় কল্পিত বিবেচিত হইয়া পড়ে, এইজন্য পূর্ব্ব লেখার ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত করিবার জন্য, নূতনভাবে গঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইলিয়ট লিখিত আকবরনামার অনুবাদই প্রধানতঃ আমার অবলম্বনীয় হইয়াছে; তৎপরে স্থলবিশেষে

পারস্যভাষায় লিখিত আকবরনামার অনুবাদ করাইয়াও ইহার সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৮৭৩ খৃঃঅব্দে জেমস্ ওয়াইজ্ এসিয়াটীক্ জার্ণেলে বারভূঞা-সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তৎপরে প্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভারতী-পত্রিকাতে ঐ সকল প্রবন্ধের আলোচনা করেন। তাঁহারা সমুদয় ভূঞাগণের বিবরণ পরিসমাপ্ত না করিয়াই, প্রবন্ধ প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন; তৎপরে এতদালোচনায় আর কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই।

প্রায় আমার আলোচনার সমকালেই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী, বি-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক "বঙ্গীয়-সমাজ" নামে একখানা পুস্তক প্রণীত হয় ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় মহারাজ "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য এই উভয় গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইবার সুবিধা ঘটে। অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ঐতিহাসিক চিত্রে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-সম্বন্ধেও অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করেন; তাহা হইতে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তক হইতেও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের অনেক তথ্য পাইবার সুযোগ ঘটে। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিখিলবাবুর নিকটে আমি নানারূপে উপকৃত, এমন কি তদীয় প্রবন্ধ হইতে আমি অনেক স্থান অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। প্রকারান্তরে পরস্বাপহারী হওয়া অপেক্ষা প্রকাশ্যভাবেই এইরূপ উদ্ধৃত করা আমি শ্লাঘ্য বিবেচনা করিলাম। বারভূঞা সঙ্কলন ব্যাপারে আমি উক্ত মহোদয়গণের নিকট যথার্থই ঋণী, তবে প্রয়োজনানুরোধে, স্থলবিশেষে তাঁহাদের কথার প্রতিবাদও করিতে হইয়াছে, ভরসা করি, আমি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছি, এইরূপ প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে উহা অবশ্যই সংশোধিত হইবে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক অন্তঃপুর প্রেসে মুদ্রণ জন্য দেওয়া হয়, তিন ফর্‌মা মুদ্রিত হইলে পরে ঐ প্রেস উঠিয়া যায়, বিবিধ কারণে আমাকেও মুদ্রণকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। জন্মভূমি কীর্ত্তি-নাশার কুক্ষিগত হইলে নানাবিধ দৈবদুর্ঘটনায় পতিত হওয়াই উহার প্রধান কারণ। পুনরায় পুস্তক মুদ্রিত আরম্ভ করিতেই আবার যুগপৎ দুইটি বিপদ উপস্থিত হইয়া আমার হৃৎ-তন্ত্রীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উহার প্রথমটি পিতৃহীন একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু, আর দ্বিতীয়টি জ্যেষ্ঠ জামাতাটির অকস্মাৎ পরলোক গমন। এই দুই শোকাবহ ঘটনায় আমি উপযুক্তরূপে পুস্তকের যত্ন লইতে পারি নাই, কাজেই স্থানে স্থানে ভুল ও অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। পাঠক মহোদয়গণের হস্তে উহা পড়িলে দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন, পরবর্ত্তী মুদ্রণকালে তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন, কবিরত্ন বি, এ, ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় প্রুফ দেখার পক্ষে সাহায্য করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

নোয়াখালি অবস্থানকালে, তত্রত্য প্রাচীন উকীল দক্ষিণবিক্রমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের নিকটে কেদার রায় ও মানসিংহের মধ্যে যে পত্রবিনিময় সাধন হয়, তাহা অবগত হইয়া শ্লোক দুইটি সংগ্রহ করি, ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ উহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হুদা ভুলুয়ার ভূতপূর্ব্ব নায়েব ৺চন্দ্রমোহন নাগ মহাশয়ের নিকট লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধীয় একখানা হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ ছিল, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয় উহা আমাকে প্রদান করায় আমি উহা হইতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হই। শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস হইতেও অনেক

বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি। রায় মহাশয়ের লেখাতেও চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে সুবর্ণগ্রামের দনুজমাধবের-বংশ বলিয়া অনুমিত হয় না। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধীয় প্রাচীন কিংবদন্তী তদীয় বংশধরগণের নিকট হইতে প্রাপ্তির সুবিধা ঘটে, উহা সর্ব্বজন বিদিত। চাঁদ ও কেদার রায়ের অমাত্যগণের নাম ও পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। অন্যান্য ভূঞাগণের বিবরণও অনেকটা স্বচেষ্টাতেই সংগ্রহ করিয়াছি, কেবল বারেন্দ্র রাজগণের তথ্যাবলী শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনেকটা সংগ্রহের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু সান্যাল মহাশয় কোথা হইতে কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট না লেখায় অনেক কথাই সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

মূল আকবরনামা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হইয়া কতকটা অনুবাদ করান হয়, কতকটা বসুমতী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আইন-ই-আকবরি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইতিহাসের সহিত যে সকল স্থানের সম্বন্ধ আছে, উহার পরিচয় অনবগত থাকায় পাঠকের পক্ষে পাঠোপভোগ প্রীতিপ্রদ হয় না, এইজন্য পরিশিষ্টভাগে ঐ সকল স্থানগুলির নির্দ্দেশ সম্বন্ধীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। উহা নানা ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তবে ব্লকম্যান এসিয়াটিক্ জার্ণেলে বাঙ্গালার প্রায় ঐতিহাসিক স্থানগুলিরই পরিচয় প্রদান করিতে যত্নপর হইয়াছেন, অতএব ঐ জার্ণেলের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আংশিক বিবরণ ব্যতীত ঐ সকল সঙ্কলিত বিবরণের সম্যক ব্লকম্যানের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইল না। বাস্তবিক আমাদের দেশে ভূগোলের আলোচনা না থাকায়, ইতিহাস পাঠের সম্যক

ফলোপভোগ হইয়া উঠে না, ইহা অনুধাবন করিয়া এই নবপ্রথার প্রবর্ত্তনা করিতে বাধ্য হইলাম।

একই নামধারী জনগণ ও এক নামের স্থানসমূহের পরিচয়দানে আমরা অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া থাকি, কিন্তু একই নামে যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থান থাকিতে পারে, উহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। এই কথা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অতঃপর বাঙ্গালার ইতিহাস সংগ্রহ ব্যাপারে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে, এই কথাটি যে মূল্যবান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের একমাত্র যশশ্চন্দ্ররূপে ত্রিপুরার রাজবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। সেই বংশপ্রভব স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যকল্পে একশত টাকা দান করিয়াছিলেন, তদীয় অর্থবলেই প্রথম উহার মুদ্রাঙ্কনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তদুদ্দেশ্যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ দ্বারাও উপকৃত হইয়াছি। এই লেখকের সহায় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নামও এস্থানে উল্লেখ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। সুহৃদ্বর উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, স্বদেশহিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, প্রাজ্ঞ কবিরাজ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম, এ, মহোদয় প্রভৃতির নিকটে লেখক নানাপ্রকার কৃতজ্ঞতাতে আবদ্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে লেখক কৃতিপুরুষগণের অধম সন্তান। সাধক কবি রামগতি, কবিবর জয়নারায়ণ, রাজনারায়ণ, বিদুষী গঙ্গামণি

ও আনন্দময়ী প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় কবিতা-বীণার ঝঙ্কারে একদা যে কানন মুখরিত করিয়াছিলেন, লেখক অধুনা তথায় বায়স-রবের অনুকরণ করিতেছে মাত্র। মনীষাসম্পন্ন সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার অমর গ্রন্থে এই সকল কবিগণের পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য সেন মহাশয় লেখকের নিকটে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। * পাঠক মহোদয়গণের নিকটে শোকার্ত্ত লেখকের সহানুভূতি প্রার্থনাই একমাত্র উপায়, ইতি।

জপসা, ছয় হাবেলী,
লালা বাবুর কুটীর
২৯শে পৌষ, ১৩১৮

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

---

* আমি যে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইতিহাসচর্চ্চায় রত হইয়াছি তাহা এই পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তি হইতে ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে; অতএব পুনরোল্লেখ অনাবশ্যক।

উৎসর্গ

স্বসমাজ স্বদেশপ্রতিষ্ঠ

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব,

৺হরনাথ রায় মহাশয়ের

ও

পুণ্যবতী মাতৃঠাকুরাণী

স্বর্গীয়া

মহামায়া দেবীর

শ্রীচরণে

ভক্তি-সহকারে

তাঁহাদের দীন-সন্তানকর্ত্তৃক

এই

ইতিহাসখানা

উৎসর্গীকৃত হইল

কয়েকটি সংশোধিত কথা

সূচনাতে সাতৈর রাজা রামকৃষ্ণকে বারভূঞার অন্তর্গত করা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক, সেই সময়ে গদাধর সান্যাল সাতৈরের রাজা ছিলেন। সূচনাতে যে সংগ্রামসাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাকে ভূষণার সংগ্রাম নির্দ্দেশ করা উচিত হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। ১২০ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস দনুজ রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, তৎস্থানে কীর্ত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা হইবে। ১৪০ পৃষ্ঠায় সংগ্রামকে সীতারামের পরবর্ত্তী লেখা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংগ্রাম পূর্ব্ববর্ত্তী বটেন। সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী প্রণেতা বলিয়া সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের নাম করা হইয়াছে, তৎস্থানে ঐ ঠাকুরের পুত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর হইবে। ইহার সমকালে পূর্ণানন্দ গীর কর্ত্তৃক শ্যামারহস্য নামক তান্ত্রিক গ্রন্থ বিরচিত হয়। চণ্ডী প্রণেতা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ এই শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড গীরের প্রকৃত নাম ব্রহ্মানন্দ গীর, এই মহাত্মাও এই সময়ের লোক ছিলেন।

ওসমান খাঁর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই "ষ্টুয়ার্ট তাহাকে কতুলু খাঁর পুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু 'মখজানে আফগান-ই' গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। কতুলু খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহিনী আফগানের অধিনায়ক হন। নজীর খাঁ, লোদি খাঁ ও জামাল খাঁ নামে কতুলু খাঁর তিন পুত্র ছিল। ঈশা খাঁর খাজে সুলেমান, ওসমান আলি, ইব্রাহিম এই কয় পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া

যায়। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে প্রথমতঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান, তৎপরে ওসমান আফগানগণের নেতা হন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধ কালে তদীয় পুত্র হিম্মৎসিংহ সুলেমানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তীরে ইহাদের জায়গীর ছিল।” ওসমানের এই পরিচয় সম্ভবতঃ প্রকৃত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত “সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ।”

প্রতিভা, ১৩১৮ সন ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা।

সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাদের জন্মভূমি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া যথার্থই আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদ কথার অনুসরণ করিয়া তিনি চাঁদ ও কেদার রায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধই ঠিক করিয়াছেন, পূর্ব্বে আমার এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আমি বর্ত্তমানে উহাই সমীচীন বোধ করি।

বারভূঞা

বা

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস।

সূচনা।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী, একমতাবলম্বী হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা বারভূঞা নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভূঞার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহাদের কীর্ত্তির ও কার্য্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্ত্তমান থাকিয়া অদ্যাপি সেই সেই মহানুভবগণের প্রাচীন লুপ্ত স্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ সদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভূঞার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ; কিন্তু প্রবাদ-বাক্যানুসারে তন্মধ্যে জন কয়েক নির্ব্বিবাদে দখলিস্বত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ জানা যায়; যথা—১ম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য় চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য় বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ৫ম সাঁতৈলের রামকৃষ্ণ, ৬ষ্ঠ ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৭ম ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৮ম চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী ৯ম সোনারগাঁর ঈশা খাঁ মসনদাইয়ালি ইঁহারাই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন

কেহ কেহ দিনাজপুরের, পুঁটীয়ার, তাহেরপুরের রাজবংশীয়দিগকেও ভূঞা সংজ্ঞার মধ্যে ধরিয়া দ্বাদশজন পূর্ণ করিয়া থাকেন; কিন্তু শেষ তিনটী সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সিংহরাজবংশ এবং "বঙ্গীয় সমাজ" প্রণেতার মতে ভাওয়ালের ব্রাহ্মণরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষও এই বারভূঞার অন্তর্গত; কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভাওয়াল গাজীবংশের করায়ত্ত ছিল। বর্ত্তমান জয়দেবপুর, পুবাইল, গাছা, বলধার জমিদারের পূর্ব্বপুরুষেরা গাজীদের চাকুরি করিয়া পরে ঐ জমিদারি আত্মসাৎ করেন। ঐ লেখক * মহোদয় এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনীলেখক (১) এই উভয়েই বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বীরকেও বারভূঞার অন্যতম বলিয়া প্রকাশ করেন কিন্তু আমরা জানিতে পাই তিনি মোগলের পক্ষে থাকিয়া, উড়িষ্যার পাঠানদের হস্ত হইতে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে উদ্ধার করেন। অতএব তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। (২) রাজা গণেশকেও কেহ কেহ বারভূঞার অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহা একেবারেই অযৌক্তিক কথা, কারণ পাঠান শাসন সময়ে ১৪০৫ খৃঃ অব্দে রাজা গণেশ পশ্চিম বাঙ্গালায় একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে মোগল শাসনের সময়ের বারভূঞার তালিকার অন্তর্গত করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(১) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

(ক) আকবরনামা ভঃ ৫ পৃষ্ঠা ৪৬৫। ইলিয়ট ৮৫ পৃষ্ঠা।

মিঃ বিভারিজ তৎকৃত ইতিহাসের (১) একস্থানে লিখিয়াছেন, পাদ্রী মিঃ সুইট্ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎ সময় তিনি স্থানীয় দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারীর মধ্যে নয় জনকে মুসলমান বলিয়া জানিতে পান। তিনি আরও বলেন, তাঁহারা খৃষ্টিয়ানদিগকে আদর করিতেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় খ্রীষ্টিয়ানেরা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপাসনা করিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার কথা সমর্থন করি। কারণ এই সময়ে বহু বিদ্রোহী পাঠানের নামই অবগত হওয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু বাদসাহের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ সমুদয় বঙ্গদেশীয় জনগণ যে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল তাহা নয়; অধিকাংশ স্থান তখনও বাদসাহের শাসনান্তর্গত ছিল। আমরা বাদসাহের পক্ষীয় ও বিদ্রোহীদলের দুইটী তালিকা পশ্চাৎ প্রকাশ করিলাম, তদ্দৃষ্টেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

বারভূঞা যে কেবল বারজন ভূম্যধিকারীর সমষ্টি ছিল তাহা নয়; বহু লোকে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যেমন তাহাকে পঞ্চায়েতের কার্য্য বা বারইয়ারীর কার্য্য বলে, উহাও তদ্রূপ ছিল। বিশেষ এইরূপ আধিপত্যশালীর উপর যিনি প্রাধান্য লাভ করিতেন তিনিই নৃপতি বা সম্রাট্ নামের যোগ্য হইতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ বারভূঞার নাম অবগত হই (২)। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন

(১) বাখরগঞ্জের ইতিহাস।

(২) অভিষেক করাইল বসাইল খাটে। আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে॥
নিজহস্তে নরপতি টী . দিলা ভালে। যত ভূঞা মিলিয়া খাটায় তার তলে॥
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ১০০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থাদিতেও বারভূঞার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় (১)। সামন্ত, মণ্ডল, ভূঞা প্রভৃতি একার্থবোধক। এই ভূম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে, বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্যবোধে আমরা এ স্থানে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত, বাদ সাহের প্রতিনিধি স্বরূপ মুসলমান নবাব বা সুবেদারের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণ প্রজা কিম্বা দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এইজন্য প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর অধীনেই পদাতি, অশ্বারোহী নৌ-সৈন্যের গমনোপযোগী যানসকল সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতি, ১৭০টী হস্তী, ৪২৬০টী কামান, ৪৪০০ যুদ্ধপোত, সর্ব্বদা সম্রাটের জন্য প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট্ যখন আদেশ প্রদান করিতেন, তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি লইয়া তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত

গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজা। আর যত ভূঞা রাজা সবে করে পূজা॥
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী—১০৩ পৃষ্ঠা।
সামন্তের অধিপতি সামন্তের মামা। সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা॥
ঐ ৯৪ পৃষ্ঠা।

(১) মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকং ইতি মেদিনী। সম্রাট্ যেন রাজসূয়েন ইষ্টং। যে মণ্ডলস্যেশ্বর আজ্ঞায়া রাজ্ঞঃ শাস্তি যঃ, ইত্যমরঃ। রাজসূয় শচক্রবর্ত্তি সাধ্যো যাগ বিশেষঃ। তেন যেন ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ। যো মণ্ডলস্য দ্বাদশ রাজমণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ ইতি ভরতঃ। শব্দকল্পদ্রুমের মণ্ডল ও সম্রাট্ শব্দ দেখ।

বলিয়া বোধ হইলেও জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র মহীপালগণের মত বলসম্পন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ রেসিডেণ্ট-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া সময় সময় যেমন ত্রাহি চীৎকারে সুধাধবলিত হর্ম্ম্যাবলীকেও বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, তখনকার জমিদারগণ এতদপেক্ষা সুখস্বচ্ছন্দে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। একমাত্র নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই তাঁহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারি-তেন। জানি না, কোন্ যাদুকরের কুহকে আমাদের সেই মাহেন্দ্র যোগ অন্তর্হিত হইয়া শূন্যে পরিণত হইয়াছে।

পাঠানেরা প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন, এই সময় মধ্যে হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের অনেকটা মেশামিশি হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এই রাজভক্ত জাতি রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় তাতারের মোগলেরা তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন কাড়িয়া লন। পাঠানশক্তিসম্পন্নগণ তৎকালে মোগলের বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, এই দেশীয় লোক-দিগকে তাঁহাদের পক্ষে না রাখিলে কোন মতেই মোগল অনীকিনীর সম্মুখে তিষ্ঠান যাইতে পারিবে না, তাই হিন্দুদিগকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন। এই রাজভক্তজাতি রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বড়ই অসম্মত হইয়া দাঁড়াইল; যদিও অনেকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মোগলের শরণাগত হন, কিন্তু শাসন কর্ত্তাদের কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের শাসনকর্ত্তাদের চরিত্র সম্বন্ধে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তদীয় চণ্ডীগ্রন্থে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার কতকটা সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ
গৌড়—বঙ্গ উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ॥
উজীর হইলা রায় জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি (খতি)
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়'ই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডীহীদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ারে চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী—৫ পৃষ্ঠা।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এইরূপ অত্যাচার জন্যই তৎকালে বঙ্গবিহারবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। এই বিপ্লবে জমিদার, তালুকদার, প্রজা কাহারও অব্যাহতি ছিল না। তালুকদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হইতে এবং কবিকঙ্কণ জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ঘটনা তৎসময় বহু পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

মিঃ ফার্ণেনডের লিখিত বিবরণীতে, আরাকান, শ্রীপুর, চণ্ডীখান (যশোহর) এই তিনটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা শ্রীপুর ও চণ্ডীখানের রাজাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতে পারি। রালফফিসের ভ্রমণবিবরণীতে উল্লিখিত তিনটী রাজা ভিন্ন বাক্‌লার রাজার নামও প্রাপ্ত হই। অতএব আমরা তিনজন হিন্দু ভূঞা প্রাপ্ত হইলাম। অতঃপর ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁর মৃত্যুর পর মুকুন্দরাম জমিদার প্রথমে বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরে বিদ্রোহী হন। স্থানান্তরে এতৎ বিষয় বলা হইবে। এই উপলক্ষে চারিজন বিদ্রোহী হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে স্থিরীকৃত হইয়াছেন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের যে পরিচয় পাই, তাহা ততদূর সন্তোষপ্রদ নয়; তথাপি আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বঙ্গীয় পূর্ব্বোক্ত কায়স্থ তিন রাজার সহিত তদীয় ঘটনাবলীর এত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে যে, আমরা তাঁহাকে এ প্রবন্ধে স্থানদান না করিয়া পারি না। সাতৈলের রামকৃষ্ণের স্ত্রী সর্ব্বাণী নাটোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক, অতএব তাঁহাকে কিরূপে আমরা আকবর বাদসাহের সমকালীন লোক নিরূপণ করিতে পারি, কষ্টকল্পনা হইয়া পড়ে। তবে লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ কষ্টকল্পনা হইয়া পড়ে। তবে আমরা যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যদি ভুল হয় তবে

একরূপে গোলযোগের মীমাংসা হইতে পারে। বংশাবলীর প্রতিই সন্দেহ হয়। যাহা হউক আমরা উল্লিখিত হিন্দুদিগকেই বারভূঞার অন্তর্গত বলিয়া মাত্র তাঁহাদের বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিব। সংশয় ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাহারও কথা উল্লেখ করিব না। তবে বর্দ্ধমানের উত্তর কোকরার জমিদার মধুসিংহ ভূমী (ভূঞা) বিষ্ণুপুরের হামীর বা হাম্বীর মল্ল এবং কুতল খাঁর পুত্রের সহিত সুজন নামক একজন হিন্দু বিদ্রোহীর পরিচয় পাই। তাঁহারা সম্ভবতঃ বারভূঞা দলের অন্তর্গত হইবেন। আরাকানের ও ত্রিপুরার রাজা ইঁহাদের সহায়তা করিতেন। এ কথার প্রমাণ আমরা মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহা হইতে জানিতে পাই; যথা—"ত্রিপুর, মঘ বাঙ্গালী, কাক কুলী, কাচিলী" ইত্যাদি।

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ এবং উড়িষ্যা, বিদ্রোহী ভূঞাগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র ছিল, গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর তট হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্র তীর ধরিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি ছিল। (১) তৎকালে বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উঁহারা মোগলের গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করার আশাটা তত অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না; তবে বিধাতা চিরকাল

---

(১) মিঃ কল ও মিঃ উইলফোর্ড এ সম্বন্ধে যে বিবরণী লিখিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুই নদীর মধ্যগত গঙ্গার "ব" দ্বীপাকৃতি বিস্তৃত ভূভাগ যাহা বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণ রাজ্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এই কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। বিক্রমপুর, ভাওয়াল, সোণারগাঁ পদ্মার পূর্ব্বে ও মেঘনার পশ্চিম, এতদ্ভিন্ন ভুলুয়া মেঘনারও পূর্ব্বতটে সংস্থাপিত। তবে "ব" দ্বীপাকৃতি স্থানে মাত্র যশোহর চন্দ্রদ্বীপ, ভূষণা এই তিনটী পরগণা বিদ্যমান।—এসিয়াটীক রিচার্স ভঃ ১৪ পৃষ্ঠা ৪৫১।

যাহাদের প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরকাল স্বদেশদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্য্যন্ত যাহাদের নিয়ত কার্য্য, সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? ভূঞারা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় তাঁহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কূল কিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহীরা তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মায়ের সুসন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারিজন ব্যক্তি দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুরুষগণের ভয়ে অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া রাজার জয় জয়কার দিতে বসিল।

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে প্রথমতঃ হোসেনকুলী খাঁ, ২য় মুজাফর খাঁ ও ৩য় রাজা তোড়লমল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে প্রাদেশিক গোলযোগ বঙ্গদেশে বড় ছিল না, কেবল পাঠান সর্দ্দারেরা উড়িষ্যায় কেন্দ্রস্থান করিয়া, বাদসাহের প্রতিকূলাচরণ করিতে থাকে। তোড়লমলের সময় বঙ্গদেশ যে একরূপ নিরুপদ্রব ছিল, তাঁহার কৃতকার্য্য বন্দোবস্ত দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালীদিগকে অসন্তুষ্ট না করিয়া তুলিলে বিশেষ অর্থঘটিত ব্যাপারে তাহারা পারত পক্ষে কখনও রাজার প্রতিকূলাচরণ করে না, তবে অনর্থক তাহাদিগকে অপমান বা অবহেলা করিতে গেলে, তাহারা মর্ম্মে বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হয়।

তোড়লমলের পর আজিজ খাঁ আজম ও তৎপর সাহাবাজ খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। শেষোক্ত সুবেদার বড়ই দুরন্ত

ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী কেন—স্বীয় দলস্থ আমীরদিগকেও অবহেলা করিতেন। আজিজ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম বদ্‌মেজাজী হইলেও বাঙ্গালী-দিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। সাহাবাজের উদ্ধতপ্রকৃতিতে তদধীন সামন্তেরা পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহ সদনে চলিয়া যায়, বাদসাহ স্থিরবুদ্ধিতে অন্য আমীর ওমরা প্রেরণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই বিবেচনায়, তদুপায়ই অবলম্বন করেন। এই নূতন সহকারী প্রাপ্ত হইয়া সাহাবাজ কতকটা কৃতকার্য্য হন বটে, কিন্তু তাঁহার বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচালন সত্ত্বেও সম্যক্ বিদ্রোহ নিরাকৃত হয় নাই। উড়িষ্যার কুতল খাঁ ও বাঙ্গালার মাসুম্ কাবুলী ও ঈশা খাঁ মসনদই আলী তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া-ছিল, তাঁহারা রণে পরাজিত হইয়াও হার মানে নাই। কতবার বিরক্ত হইয়া সাহাবাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দূরদর্শী বাদসাহ এইরূপ অকৃতকার্য্যাবস্থায় তাঁহাকে কোন মতেও বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। পরে সাহাবাজ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তৎস্থানে উজির খাঁ নিযুক্ত হন। তিনি কয়েক মাসমাত্র রাজকার্য্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার বিদ্রোহিগণের প্রবল প্রতাপ বাড়িয়া উঠে, এজন্য বাদসাহ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহকে বঙ্গ-দেশের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন্। মানসিংহ ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকার্য্য করেন বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল বঙ্গদেশেই অতিবাহিত করেন না, মধ্যে একবার স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। পরে যখন ১৬০১ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যার ওসমান, বাঙ্গালার মাসুম, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া বিদ্রোহের প্রসার বর্দ্ধিত করিয়া

তুলেন, তৎ সময় পুনরায় বাদসাহের আদেশে বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করেন।

১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ কুলতিলক জালাল উদ্দীন আকবর প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই বৎসর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন বাঙ্গালায় ঘোর বিদ্রোহ দাবানল জ্বলিয়া উঠে। একে ত তৎ সময় পর্য্যন্ত মোগল শাসন পক্ষে কেহই অনুকূল ছিল না, তৎপর রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াই জাহাঙ্গীর এমন একটী কার্য্য সম্পাদন করেন, যাহাতে সমুদয় বঙ্গবাসীর চক্ষে তৎসময় তিনি নরপিশাচ বলিয়া প্রদর্শিত হন। তখন তাঁহার উপর আর কাহারও আস্থা রহিল না।

মহাত্মা আকবরের রাজত্ব সময়ে যদিও বঙ্গদেশ বিদ্রোহীপূর্ণ ছিল, তথাপি অধিকাংশ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিত। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদসাহের সহিত তাঁহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না। কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য ভূম্যধিকারীরা বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তাহার বিবরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে, তৎকাল পর্য্যন্ত যদিও মোগল বাদসাহ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানেরা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করিত; এমন কি সময় সময় তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ যদি তাঁহারা বুঝিত মোগলেরা তাঁহাদের স্বশ্রেণী কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তখন তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। আপনাদের পূর্ব্ববল ও অধিকার মনে ভাবিয়া তাঁহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ বিবেচনা তাঁহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইতনা। কেবল প্রতিহিংসা ও পূর্ব্বাধিকারের পুনরভ্যুদয় তাঁহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত

হইয়া তাঁহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। সের আফগানের পরিণীতা বনিতা অসামান্য রূপলাবণ্যলতী মেহের উন্নেসাকে অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করায় বাদসাহের প্রতি আর কাহারও বিশ্বাস বা ভক্তি ছিল না। অথচ এইরূপ রাজার অবিচার সত্বেও একজন মুসলমান ঐতিহাসিক এতৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালার জমিদারগণকেই দোষী স্থির করিয়া স্বীয় লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জাফর খুলনাৎ উং তওয়ারিথ" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষৌ নিবাসী সোর আলিজাফর "আরশ-ই-মহামিন্দ" নামক যে উর্দ্দূ গ্রন্থ ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে, "বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বাদসাহ সরকারে রাজস্ব দেয় না, উহারা তাহার প্রতিফলও পাইয়াছে।" বলা বাহুল্য উহা ভূঞাদলের পতনের পর—মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। জেতা জিতের উপর যতদূর ঝাল ঝালিতে পারেন গ্রন্থকর্ত্তাও সেই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। ঐরূপ প্রথা পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও তদ্রূপ আছে, চিরকাল একই ভাবে পরিচালিত হইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করিলে এ প্রহেলিকা ভেদের আর অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। মুসলমান ইতিহাসলেখক হিন্দু ও পাঠান জমিদারগণ সম্বন্ধে, যতই অভদ্র শব্দ প্রয়োগ করুন বা ততোধিক বিশেষণে বিশেষিত করুন না কেন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারাই যে, সকল গোলযোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনর্থক জেদ বজায় রাখিতে যাইয়াও অনেক শাসনকর্ত্তা নিরীহ প্রজাগণকে উত্তেজিত

করিয়া তুলিয়াছিলেন। মোগলগণের প্রথম আগমনে, হিন্দু এবং মুসলমান পাঠান উভয়েই উহার ফল সমানভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য এ স্থানে মোগল পক্ষীয় এবং পাঠান ও হিন্দু বিদ্রোহিগণের তালিকা প্রদান করা গেল। ইহা অবগত থাকিলে, এই ইতিহাস পাঠে বিশেষ সুবিধা ঘটিবে।

মোগল পক্ষীয় শাসনকর্ত্তা।

১। মামুদ সা—বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা, বাদসাহ হুমায়ুনের অধীনে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে।

২। তাজ খাঁ	বাঙ্গলার	শাসনকর্ত্তা	১৫৬৪ খ্রীঃ
৩। মুনেম খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৫ ”
৪। হুসেন কুলী খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৬-১৫৭৮ ”
৫। মুজাফর খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৯-৮০ ”
৬। টোডর মল্ল	ঐ	ঐ	১৫৮০-৮২ ”
৭। আজীজ বা খানী আজীম		ঐ	১৫৮২-৮৪ ”
৮। সাহাবাজ খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৮৪-৮৭ ”
৯। উজির খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৮৮ ”
১০। মানসিংহ	ঐ	ঐ	১৫৮৭-১৬০৬ ”

প্রথম ব্যতীত আর সকলেই আকবরের রাজত্ব সময়ে নিযুক্ত হন।

মোগল পক্ষীয় সেনাপতি।

১। মাক্কু খাঁ
২। ফায়রৎ খাঁ
৩। সুজাদালী
৪। আরব বাহাদুর

৫। খুদাদ
৭। সুজাসম সুদ্দিন
৭। সাধী খান্
৮। সেখ ফরিদ বোখারী
৯। সেখ ইব্রাহীম
১০। টারসিন বা তারসুন খাঁ
১১। ওয়াদের খাঁ
১২। শাকুলী খান
১৩। মহীদালী খান
১৪। সায়েদ হোসেন
(ঢাকার থানাদার)
১৫। মীর আদনের পুত্র
১৬। মহম্মদ গজনবী
১৭। সায়েদ খাঁ
১৮। উজীর খাঁর পুত্র
১৯। বাবুই মঙ্গলী
২০। বিহার খাঁ
২১। বাহাদুর
২২। জগৎ সিংহ
২৩। তোগ্‌াক খাঁ
২৪। প্রতাপ সিংহ
২৫। বাজবাহাদুর।
২৬। সুলতান কুলী খাঁ
২৭। ইব্রাহীম আকরৎ
২৮। বিলমক
২৯। খান্ জাহান

মোগল সহকারী হিন্দু।

১। হামীর বা হাম্বীর্ মল্ল (বিষ্ণুপুর)
২। দলপৎ রায়
৩। রঘু দাস
৪। নারায়ণ ভূগী বা কন্দর্প নারায়ণ রায় ভূঞা (বাকলা)
৫। সংগ্রাম (ভূষণা।)

মোগলদ্রোহী সুররাজবংশ।

ও পাঠান সর্দ্দারগণের নাম।

১। সের সাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া করিয়া—বাঙ্গালা ও দিল্লী অধিকার করেন,

২। সলিম সাহ-সেরের পুত্র
৩। সুলেমান কেরাণী
৪। কালাপাহাড়
৫। বয়াজিদ
৬। দায়ুদ
৭। বাবুইমঙ্গলী
৮। আদম খাঁ সুলতানী
৯। দঁড়িয়ার খাঁ
১০। মীর সাহা বুদ্দিন
১১। কুতল খাঁ
১২। মাসুমকাবুলী
১৩। জাবোরক
১৪। কাজাজেদা
১৫। ঈশা খাঁ
১৬। বাগবাহারী
১৭। খাম্মার খাঁ
১৮। মীরজানজাদ
১৯। ওসমান
২০। গজনবী (ভাওয়াল)
২১। আহাম্মদ (কেদার রায়ের সাহায্যকারী বিদ্রোহী)
২২। জালাল খাঁ লোহিনী

কাকষাল দেশীয় বীরগণের নাম।

১। বাবাহাককাকষাল ২। মৃজাবেগ কাকষাল
৩। খালবদী বা খালীদ (বাদসাহের পক্ষে)
৪। মৃজামহাম্মদ (কাকষালদের একজন নেতা)
৫। ওয়াজির জলিমকাকষাল
৬। মুরাদ ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা পরে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন। ৭। দস্তান কাকষাল

বিদ্রোহী নেতাগণের পরিচয়

বারভূঞার প্রধান।

১। উড়িষ্যার, বায়াজিদ, দায়ুদ, কুতল খাঁ, নসীব খাঁ, ওসমান প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে। ২। মাসুম কাবুলী। ৩। কাজীজেদা। ৪ ঈশা খাঁ। ৫। মৃজামহম্মদ। ৬। গজনবী। ৭। আহম্মদ। ৮। জালাল খাঁ লোহিনী। ৯। বাবুইমঙ্গলী। এই নয়জন মুসলমান পাঠান। ১০। কেদার রায়। ১১। প্রতাপাদিত্য। ১২। মধুসিংহ ভৌমী। এই তিনজন হিন্দু বারভূঞা।

বার-ভূঞা।

প্রথম অধ্যায়।

পাঠান রাজত্বকাল।

বঙ্গদেশ পাঠানকরতলগত হইবার পর, পশ্চিম বঙ্গের গৌড়ে এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের রাজশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া সোনারগাঁয়ে সংস্থাপিত হয়। প্রবাদ, শেষ হিন্দু রাজা দ্বিতীয় বল্লাল বা পোড়া রাজা বাও আদব নামে একজন মুসলমান সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করেন। পোড়া রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহার রক্ষিত বার্ত্তাবহ কপোত তৎপূর্ব্বেই উড্ডীয়মান হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হয়; তদ্দৃষ্টে রাজ-পরিজনেরা রাজার পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পরে রাজা সেই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শোকাকুল চিত্তে স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে যেমন ইয়োরোপ খণ্ডের যুদ্ধবার্ত্তাবহনের জন্য কপোত ব্যবহারের প্রথা দেখা যায়, আমাদের দেশে উহা বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এইরূপে শেষ হিন্দু স্বাধীনতা বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে পর সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে পরিণত হয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকাদেশের "ইবেনবতুতা" নামক পর্য্যটক দুর্ভেদ্য দুরাক্রম্য সোণারগাঁ নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় যাবাদ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্যজাহাজ সকল দর্শন করিতে পান। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে "সার জন হারবার্ট" সোণারগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর ও চাটীগাঁ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরী সকলের কথা উল্লেখ করিয়া

গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক "রালফিস্" চাটীগাঁ, বাকলা শ্রীপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা যথা স্থানে উল্লেখ করা যাইবে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে "পিটার্ হেলেন" সোণারগাঁকে একটী দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক ইয়োরোপীয় ভ্রমণ কারীরা যে বাকলা, শ্রীপুর, সোণার গাঁ প্রভৃতিকে দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপ্রকৃত নয়। কারণ, এই স্থান গুলির চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ঐ গুলিকে দ্বীপ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

সুপ্রসিদ্ধস্থান গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ফিরোজসাহের আদেশে তৎপুত্র বাহাদুরসাহ কর্ত্তৃক ১৩১১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত শেষ হিন্দু রাজা এই যবন রাজের অধীনে করদ রাজারূপে সোণারগাঁ ও বিক্রমপুরের শাসন পরিচালন করিতে স্বীকৃত হন। বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিহাবুদ্দিনকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এ জন্য সিহাবুদ্দিন দিল্লীতে গিয়াসুদ্দিনের শরণাপন্ন হন। গিয়াস বাহাদুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করায়, ঢাকার নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। বাহাদুর ও শেষ হিন্দু করদ রাজা একমতাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া রাজা নিহত এবং বাহাদুর বন্দীকৃত হন। এই সময়েই পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম দিল্লীশ্বরের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। ১৩২০ হইতে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময় মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটন হয়।

আজিও পূর্ব্ববঙ্গে গাজির গীত শ্রুত হওয়া যায় ; তাহাতে পোড়া রাজার পরে গয়েন, তৎপর সিকন্দর, তৎপর বরণগাজি, তৎপর কালুর নাম গ্রথিত আছে। ইঁহারা প্রায় সকলেই সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। কালু একজন হিন্দু সন্তান পরে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বদেশের যাবতীয় গোপনীয় সংবাদ মুসলমানদিগকে বলিয়া দেয়; তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া দেশ আক্রমণকরতঃ অনায়াসে উহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়। মুসলমানেরা ফকির ও ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া এই দেশের যাবতীয় গুপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিত, পরে সুযোগ বুঝিয়া অস্ত্র ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। শ্রীহট্টে ৩৬০ জন ফকিরের সাহায্যে ফকির সাহাজালাল মুসলমানজয়পতাকা উড্ডীন করেন। এই ফকিরেরাই গাজি নামে বিখ্যাত ছিল।

গাজি পঞ্চকের নাম।—গয়েসদি (বাদসাহ গয়েসউদ্দীন), সমস্‌দি (পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শাসন কর্ত্তা সমস্‌দ্দীন), সেকন্দর (যাহার দ্বারা দেশে জরিপের প্রথা সৃষ্টি হয়), গাজী (ধর্ম্মযোদ্ধা গাজীসাহ), কালু (হিন্দু কুলাঙ্গার ফকির ও গাজী সাহের মন্ত্রী)। পিতা সেকন্দরের বর্ত্তমানেই গাজীসাহ মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীর পাণি গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে ক্রমে পূর্ব্বভাটীরদিক্ অগ্রসর হন। একদিকে ধর্ম্ম অন্যদিকে রাজ্য বিস্তার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি ভাঁটি প্রদেশে এই সময়ে বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য ঐ সকল স্থানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে অত্যধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাঁচ গাজীর পাঁচটী মসজিদ, নেমাজের জন্য সোণারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজগণের রাজ্য বিলোপ হইলে, সমসুদ্দীনফিরোজসাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রথমতঃ সুবর্ণ গ্রামের টাঁকশালে প্রস্তুত হয়।

বাহাদুর পুনর্ব্বার সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। পরে স্বনামে মুদ্রাপ্রচার ও শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এজন্য দিল্লীপতি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া

নিহত করেন। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী "ইবেনবতুতা" বলেন, অকৃতজ্ঞ নরাধম শাসনকর্ত্তাদিগকে সাবধান করিবার জন্য, তাহার চর্ম্ম তৃণপূর্ণ করিয়া, সুবর্ণগ্রামে প্রদর্শন ও গৌড় এবং সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাহাদুর সুবর্ণগ্রাম শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়, সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম এই তিন স্থান তিনজন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তদীয় বর্ম্মবাহক তাতার "বহরম খাঁ" উপাধি গ্রহণ করিয়া সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপর ফকিরদ্দীন "সুলতান সেকন্দর" উপাধি ধারণ করিয়া ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম শাসন করেন। তৎপর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে মুজাফরগাজিসাহ সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদন্তর ইলিয়সখাজেসুলতান সমসদ্দীন পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। দিল্লীপতি এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে আগমন করিলে, সমসদ্দীন সোনারগাঁর অন্তর্গত সুদৃঢ় একডালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর সহজে উহা হস্তগত করিতে পারেন না। পরে সন্ধি করিয়া নামে অধীনতা স্বীকার করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

সমসদ্দীনের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সেকেন্দর সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, দিল্লীপতি পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু বাদসাহ এইবারও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ৪৮ টা হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইল। সেকেন্দর একডালায় অবস্থান করিতেন। ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশ জরিপ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্য শ্রুত হওয়া যায়; যথা—

"আরে লকড়ি, তোমকি পাকড়ি
তোমকে কেলেয়া, হামকে সেকন্দর বাদ্‌সা লেয়া
তোম ক্যাকরনেকো, হাম জরিপ কর্‌নেকো।"

সেকেন্দরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গয়েস্‌উদ্দীন ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। এতদ্ভিন্ন গিয়াস্‌ সম্বন্ধে আর কোন দুর্নাম শ্রুত হওয়া যায় না। এই নবাব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পারসিক কবি হাফেজকে এদেশে আনয়ন জন্য ইনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই শাসনকর্ত্তা অতি সুবিচারক ছিলেন। জাতিগত বিদ্বেষ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। একদা তীরপরিচালনা কালে, নবাব-নিক্ষিপ্ত একটী তীর কোন দরিদ্র বিধবার একটীমাত্র পুত্রের চক্ষে প্রবিষ্ট হয়। ঐ বিধবা এই জন্য নবাবের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। কাজি প্রথমতঃ এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়া পরে ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া নবাবের নামে শমন বাহির করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবাব বাহাদুর কাজির বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তে কাজী নবাবকে দোষী বলিয়া স্থির করেন। তখন নবাব বাহাদুর সাহ কাজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি তোমার বিচারে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি অন্যায় বিচার করিতে, তবে আমার এই হস্তস্থিত অস্ত্র তোমার দেহকে নিশ্চয় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিত। তখন ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক কাজিও সদম্ভে বলিলেন, যদি এই ধর্ম্মাধিকরণে নবাব সাহেব আমার এই বিচারের প্রতিকূলতায় কোনরূপ অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তবে আমার হস্তস্থিত এই ন্যায়যষ্টিও নবাব সাহেবের পৃষ্ঠদেশে নিপতিত হইত। বলা বাহুল্য পরে, ঐ বিধবাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া নবাব সাহেব পরিতুষ্ট

করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, মুসলমান শাসনকালে একেবারে ন্যায় বিচার ছিল না, তাঁহারা একবার এই বিষয়টীর উপর মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, তবেই তাঁহাদের সেই কুবিশ্বাস অনেকটা সংশোধিত হইতে পারিবে।

গিয়াসের পরে তৎপুত্র সইসউদ্দীন আমেদ সা দশ বৎসর এবং পৌত্র সমসুদ্দীন দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে রাজা গণেশ স্বাধীনতাবলম্বন করায় তদ্বংশীয়েরা ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তৎপর ইলিয়সশাহী, তদনন্তর হাবসিরা এদেশে কতককাল রাজত্ব করিলে পর, ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে সৈয়দআলালুদ্দীন হোসেন সাহ সুবর্ণগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫২১ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। পরে লোদীবংশের হস্ত হইতে মোগল বাবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লন (১৫২৭খৃঃঅব্দে)। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পরে সুরবংশীয় সেরসাহ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল্লী ও বঙ্গবিহার অধিকার করেন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তদ্‌বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। তৎপর ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে হুমায়ূন পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোগল রাজত্বে মুনেম খাঁ, হুসেন কুলী ও মুজাফর খাঁ।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ দিল্লীর রাজতক্তে আরোহণ করেন। তৎকাল পর্য্যন্ত বঙ্গ বিহার বা উড়িষা মোগলকরগত হয় নাই। পাঠান জাতি ঐ সকল প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সের সাহের পর, তৎপুত্র সলিম সাহ যখন দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎসময় মহম্মদ খাপুর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে বহু বিপ্লবের পর, পাঠান কেরানীবংশোদ্ভব সুলেমান বাঙ্গালার কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজখাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান গৌড় অধিকার করিয়া তাণ্ডানগরীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করেন (১৫৬৭ খৃঃ অব্দ)। কালাপাহাড়ের পূর্ব্ব নাম ছিল "রাজু"। হিন্দু-ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন। তৎকর্ত্তৃক বহু হিন্দুবিগ্রহ বিনষ্ট এবং তদীয় বাহুবলে কামরূপ প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হয়।

১৫৭২ খৃঃ অব্দে সুলেমান কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র বয়াজিদ বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব বলিয়া পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরেই স্বীয় ভ্রাতা দায়ূদ কর্ত্তৃক হত হন। দায়ূদ বাঙ্গালা বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া আপনার প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রচার করেন।

এই সময়ে বঙ্গ বিহারের প্রতি বাদসাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদিও ঐ স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা রাজকার্য্যে বাদসাহের প্রাধান্যই স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাকে মান্য করিতেন না। কর প্রদান করিতে পর্য্যন্ত সম্মত হইতেন না। খৃঃ ১৫৭২ অব্দে ঐ প্রদেশ জয় জন্য

বিপুল আয়োজন হয়। আকবর যখন দ্বিতীয় বার গুজরাটে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসময় পাঠানরাজ সুলেমানের মৃত্যু হয়। তৎপর, তাহার দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারূঢ় হন। ২য় পুত্র দায়ূদের রাজ্য প্রাপ্তির পর, লোদী বংশীয় একজন আমীর বিদ্রোহী হন। পরে সাহাবাদ প্রদেশে রোটাসগড়ে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। দায়ূদ তাহার সহিত সন্ধি করিয়া, পরে চক্রান্ত করিয়া তাহার প্রাণবধ করেন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জৌনপুরের মোগল গবর্ণর কর্ম্মনাশা পার হইয়া পাটনায় উপস্থিত হন। দায়ূদ তৎকালে পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, কিন্তু বাদসাহ সংবাদ পাঠান যে, তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেন, যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয়। বাদসাহ আজমীর হইতে একদল সৈন্য লইয়া জলযানে এলাহাবাদে অগ্রসর হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া তিন দিবস তথায় বাস করিয়া পুনরায় গোমতী সঙ্গমে উপস্থিত হন। তথায় কোন সংবাদ না পাইয়া জৌনপুরে উপনীত হন। পরে তথায় স্বীয় পরিবার রক্ষা করিয়া চৌসায় আসিয়া পৌছেন। এই চৌসাতে সেরসাহ হুমায়ূন বাদসাহকে প্রথম পরাস্ত করেন। এই সময় সংবাদ আইসে বিপক্ষেরা পাটনায় আসিয়া মোগলপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। আকবর সাহ তৎসাহায্যের জন্য তরী আরোহণে পাটনায় যাত্রা করিয়া সাতদিনে তথায় উপনীত হন।

তৎসময় যে পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হয় অগ্রে দুর্গ আক্রমণ না করিয়া পাটনার নিকটবর্ত্তী হাজীপুর আক্রমন করা কর্ত্তব্য। তাহাই হইল। দায়ূদ ভয়ে সেই রাত্রিতেই পলায়ন করিল। বাদসাহ প্রচুর প্রমোদ আহ্লাদে পাটনায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শত্রুর অনুসরণে নিরস্ত থাকা কর্ত্তব্য নয় বিবেচনায়, একজন সেনাপতির উপর নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে দায়ূদের

পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বাদসাহ পুন্‌পুন্ নদী পার হইলেন। দায়ূদের অনেক অনুচর ও দুইশত পঁয়ষট্টিটা হস্তী বাদসাহের বন্দী হইল। দড়িয়াপুরে পৌছিয়া, মুনেম খাঁ ও রাজা টোডরমল্লকে দায়ূদের অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না।

পাটনা বিজয়ের সহিত সমুদয় বিহার প্রদেশ বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিল। বাদসাহ তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথাকার সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিলেন, রাজকর অধিক ধার্য্য হওয়ায় ও জমি তত্দূর উর্ব্বরা না হওয়া প্রযুক্ত প্রজারা কর আদায় করিতে পারিতেছে না। এজন্য উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ রাজকর স্বরূপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন। একজন কর্ম্মচারী জমি আবাদের সুবিধার জন্য নিযুক্ত হইল। দায়ূদ অনন্যোপায় হইয়া মোগল বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করে। দুই বৎসর সুখশান্তিতে অতিবাহিত হইলে দায়ূদ পুনরায় বিদ্রোহী হন।

এই বৎসরের একটী প্রধান ঘটনা ফতেপুর-সিকরিতে এক "ইবাদত-খানা" নির্ম্মাণ। ইহার বাঙ্গালা অর্থ—পণ্ডিতের অভ্যর্থনা গৃহ। ইমারত নির্ম্মিত হইলে প্রতি শুক্রবার রজনীতে এবং প্রত্যেক পর্ব্বাহের রজনীতে বাদসাহ স্বয়ং তথায় গমন করিয়া সমস্ত রজনী পণ্ডিতগণের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন। পণ্ডিতেরা যোগ্যতানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।

আকবর বাদসাহের শাসনের সপ্তদশ বৎসরে বঙ্গবিজয় জন্য বিপুল আয়োজন হয়। বাদসাহের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি মুনেম খাঁ ও রাজা টোডর মল্ল স্বসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী

"তুকারাম" নামক স্থানে মোগল সৈন্যের সহিত দায়ূদের ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটন হয়; পরে কিন্তু দায়ূদ পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন। মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজিত হইলে সেনাপতি মুনেম খাঁ তাণ্ডাতে উপস্থিত হইয়া গৌড় নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এই বৎসর গৌড় রাজ্যে মহামারী উপস্থিত হইয়া বহু মনুষ্যকে কালসদনে প্রেরণ করে; সেনাপতি মুনেমখাঁও গতায়ুঃ হন। ইতোপূর্ব্বে বঙ্গবিজয়লব্ধ ৫৪টা হস্তী সহ তোডর মল্ল সম্রাট্ সদনে চলিয়া যান। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দায়ূদ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করে, কিন্তু বাদসাহ প্রেরিত সুবিখ্যাত সেনানায়ক হুসেন কুলী খাঁর ও খাঁজাহান তোর্কমান দ্বারা পুনরাক্রান্ত হইয়া পরাস্ত ও হত হন। হুসেন দায়ূদের ছিন্নমস্তক বাদসাহ সদনে প্রেরণ করেন। ৯৮৭ হিঃ অব্দে (১৫৮১ খৃঃ অব্দ) খাঁজাহানের মৃত্যু হয়।

বাদসাহের শাসনের বিংশতি বৎসরের (১৫৭৬ খৃঃ অব্দ) যে কালে খান্ খানান্ (মুনেম খাঁ) দায়ূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসময় তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া, কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী প্রভৃতি পাঠান সর্দ্দারগণ কাকষাল জাতিকে আক্রমণ করে। পাঠানেরা উহা-দিগকে তাণ্ডা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া ঘোড়াঘাট প্রদেশ অধিকার করিয়া-ছিল। পরে মোগল সেনাপতি মাঞ্চু খাঁ পুনরায় ঘোড়াঘাট বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লন। হুসেন কুলী খাঁ অল্পদিনমাত্র বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তৎপর মুজাফার খাঁ বঙ্গদেশের নবাবী পদে নিযুক্ত হন।

মুজাফরের শাসনকালে রোটাস দুর্গ পাঠানদের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই, এজন্য বাদসাহপ্রেরিত সেনাপতি ফারহাৎ খাঁ উহা অধিকার করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার সাহায্যজন্য বাঙ্গালার শাসন-

কর্ত্তার উপরও অনুমতি প্রদান করা হয়। এই সময় সংবাদ আসিল রোটাসস্থ সমগ্র পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছে। তৎসময় বাদসাহ বলিয়া পাঠাইলেন যদি তোমরা রোটাসের গোলযোগ সম্পূর্ণ রূপে শীঘ্র নিবারণ করিতে সমর্থ হও, তবে তাহার চেষ্টা দেখিতেই প্রয়াস পাও; অন্যথায় বাঙ্গলার বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হও।

হিজরী ৯৭৬ সনে (১৫৭০ খৃঃ অব্দে) আকবর বাদসাহের বঙ্গাধিকারের প্রাক্কালে, মোরাদ খাঁ কাক্‌ষাল সুবেদার দায়ূদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারী (তুকারাগ বা তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে)। তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর থামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীর জানজাদ খাঁ সহজেই মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হুসেন কুলী খাঁর মৃত্যু হইলে পর পাঠান কুত্তল খাঁ একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। বিশেষতঃ, যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল বাদসাহের শরণাগত হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বিস্তারিত ভূষণার মুকুন্দরায় প্রবন্ধে উল্লেখ করা যাইবে।

মুজাফর অতি বিচক্ষণ বীরপুরুষ ছিলেন; তাহার বিবেচনায় অগ্রে বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল, ও তদনুসারে তিনি বিহার হইয়া বঙ্গাভিমুখে যাইবার মনন করিলেন।

মুসলমান সেনানায়কগণের পরস্পর অমিলে সময় সময় বহু বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, এস্থলেও তাহাই ঘটিল। অপর মোগল সেনাপতি

সুজাদালী খাঁর সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইল। একমাত্র সেনাপতি আরব্ বাহাদুরের সৈন্যের সহায়তা পাইয়া বিদ্রোহী আদাম খাঁ মুলতানীকে ইব্রাহীমপুরে এবং দরিয়াখান্‌কে ঝারখণ্ডে তাড়াইয়া দিলেন।

মুজাফরের কার্য্যদক্ষতায় ও সুনামের জন্য ক্রমে সমুদয় মোগল-সেনাপতিরাই তাঁহাকে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এমন কি, পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে নানা পথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ মুজাফর কিছুতেই ভীত না হইয়া দুই জন অধীনস্থ যোদ্ধার সহিত ঝুন্দ ও সাসিরামেরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ যোদ্ধা-দ্বয়ের একের নাম খুদাদ অপরের নাম সুজাসমসদ্দীন। তাহারা পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন রোটাসের বিপক্ষগণ ঐ দুই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বীরগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সাসিরামে উপস্থিত হইলেন। পরে বহু বীরত্ব প্রদর্শনে বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া ঐ স্থানদ্বয়ের উদ্ধার সাধন করিলেন। এই উভয় স্থান বাদসাহের নিজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে পুনরায় বিহারে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই সকল কারণে সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ মুজাফরকে দিল্লীর দরবারের এক উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ও তথায় যাইতে আদেশ প্রদান করিয়া, তৎপদে রাজা তোডরমল্লকে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশের শাসনজন্য প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজা তোডর মল্ল।

আকবর নামা প্রণেতা বলেন, তুকারোর যুদ্ধের জয়বার্ত্তা লইয়াও ৫৪টা হস্তী উপহার সহ তোডরমল্ল যে দিন বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই দিন সম্রাট তাঁহার উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজস্ব বিভাগের ভার অর্পণ করেন।

লেখক আরও বলেন, তোডরমল্ল নিষ্ঠাবান ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কখনও লোভে পড়িয়া কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। তবে তাঁহার প্রকৃতি হিংসা ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত ছিল না; যদি তাহা থাকিত তবে তাঁহার চরিত্রে যে একটুকু কঠোরতা ছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিত না।

বাদসাহ তাঁহার গুণবত্তা ও নির্লোভিতার পরিচয় পাইয়া, মুজাফির দিল্লী চলিয়া গেলে পর বাঙ্গালার নবাবীপদে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৫৮০ খৃঃ অব্দ)।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাঁহাকে বড় কোন যুদ্ধাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় নাই। এই সুযোগে তিনি বঙ্গদেশের আয়বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ উনিশটী সরকারে বিভক্ত হয়। উহাতে মহালের সংখ্যা ছিল ৬৮২টী। সমগ্র সরকারের আয় হয় ১০৬৮৫৯৫৯৪৪ দাম; এতদ্ভিন্ন বিহারের ৭টী সরকারের অন্তর্গত ২০০ পরগণার আয় ৫৫৪৭৯৮৪ দাম এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত ৫টী সরকারের অধীন ৯৯ পরগণার আয় দাঁড়ায় ৪২৬৮৩৩ দাম। বিভাগগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সরকার জেন্নেতাবাদ ৬৩ পরগণায় বিভক্ত; যথা—১ জেন্নেতাবাদ বা গৌড় ২ জোয়ারামা (২৪ পরগণা) ৩ আজোর ৪ বাজঘোগেরা ৫ বেলীর ৬ হারেন এগরা ৭ দেহনপুর ৮ দেবসড়ক ৯ সীরন্থর ১০ সাবালা ১১ সেলেলসেরা ১২ ঘাগটিয়ার ১৩ মদনহাটী ১৪ মুদীহাট ১৫ নাহাট ১৬ হস্তগজপুর ১৭ জোয়াদ্দারস্বর্গ ১৮ মহল ১৯ উজারী কান্দা ২০ ভেটিয়া ২১ ভেল বাড়ী ২২ বসানবাজার ২৩ দরসরক ২৪ রাদ্দবামাটী ২৫ আমদানীর রপ্তানীর শুল্ক ২৬ সেরপুর ও কাঙ্গালপুর ২৭ সাহরাজপুর ২৮ গিয়াসপুর ২৯ কেমেলা ৩০ ঘটক চাঁপা ৩১ মুদীমহল ৩২ মিনামহল ৩৩ নূতনবাজার সকলের কর ৩৪ জওয়ার ডিহিকোট ৭ মহল যথা (১ বেবারীপিঞ্জর ২ ঠাকুর ৩ ডিহিকোট ৪ দেহেলগাঁ ৫ সাহাজায়পুর ৬ মালীগাঁ ৭ মুদীপুর) ৩৫ রামাতীর নিকটস্থ ৭ মহল ৩৬ বাধতেলী ৩৭ রমতী ৩৮ সিবল গাড়ী ৩৯ সিঙ্গে কোড়া ৪০ সুলতানপুর ৪১ সিংহুয়ার ৪২ জাহিনগর ৪৩ সারদাবাদের নিকটস্থ ১০ মহল ৪৪ আকবরপুর ৪৫ পারডুয়ার ৪৬ খিজিরপুর ৪৭ সারসাবাদ ৪৮ কোতদালী ৪৯ গিরামন্দ ৫০ গরহী ৫১ মেকরীণ ৫২ হেতেন্দাও মালিকপুর ৫৩ মালদহের নিকটস্থ এগার মহল (বারবাকপুর, ইউসফবাজার, হাবেলীমালদহ, ধারপুর, সুজাপুর, সরমবিলপুর সেনগুদিয়া, সালীবাড়ী, সাহিনডুব, তেতাপুর, মৌকতুলপুর। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ও পরবর্ত্তী ১১ মহালের যোগে উহার সংখ্যা ৬৩টী। এই মহাল সমূহের সমগ্র আয় ১৫৭৩১৯৬ দাম। অশ্বারোহির সংখ্যা ৫০০ শত পদাতিকের সংখ্যা ১৭০০০ সহস্র। এই সরকারে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে।

২। সরকার তাণ্ডা—

মহালের সংখ্যা ৫২ যথা ১ আকমহল ২ অচেলা ৩ দশপাড়া

আসরিফগল ৪ ইব্রাহিমপুর ৫ উজলঘাটা ৬ আলগাঙ্গী ৭ বারকম্বল ৮ ভাটাল ৯ বাহাদুরপুর ১০ বাহাবয় ১১ ফুলরী ১২ বাহাদুরসাহী ১৩ তাণ্ডে ১৪ তাজপুর ১৫ তালুক ব্রহ্মগড় ১৬ তেনৌলীপুর ১৭ হোসেনাবাদ ১৮ থাপুর ১৯ দাদহ ২০ দেবীপুর ২১ দাবুদমাহী ২২ দরগাছী ২৩ রামপুর ২৪ রুপেশপুর ২৫ স্বরূপসিং ২৬ সুলতানপুর উজাইল ২৭ সুলেমান সাহী ২৮ সলিমোনাবাদ ২৯ সালিমানপুর ৩০ সুমবেলা ৩১ সিরসাহী ৩২ নমসুকানী ৩৩ সেরপুর ৩৪ ফিরোজপুর, ৩৫ কুমার প্রতাপ ৩৬ সাংজুক ৩৭ কাটাগড় ৩৮ কেনগারচ ৩৯ কাশীপুর ৪০ কুচলা ৪১ কাফুরদিয়া ৪২ মুগেশ্বর ৪৩ মঙ্গলপুর ৪৪ নওনগর ৪৫ নসীবপুর। এতভিন্ন সামান্য তালুকদারদের অধীনে ৭ মহাল মোট বায়ান্ন এই মহালের রাজস্ব ২৪০৭৯৩৯৯ দাম।

৩। সরকার ফতেহাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩১ যথা ১ জয়সিয়া চার্জ্জ ২ ফুলচোল ৩ বেলন ৪ ভাগলপুর ৫ বাধাদিয়া ৬ তেলীহাটি ৭ চরণ লক্ষ্মী ৮ চরহায়ী ৯ হাবেলী ফতেয়াবাদ ১০ লবণের শুল্ক ১১ হজরতপুর ১২ হাটের খাজনা ১৩ রসুলপুর ১৪ সন্দীপ ১৫ সিরহর গরল ১৬ সিবিসানী ১৭ সিরোহী ১৮ সুদ দেওয়া ১৯ সোয়ামীল (জালালপুর) ২০ সাহাবাজপুর ২১ খড় গহর ২২ কুশ দিয়া ২৩ কত্তসা ২৪ মাকরগঞ্জ ২৫ মসুন দাড় ২৬ মিরণপুর ২৭ ক্ষুদ্র তালুকদার ২৮ নাকতুল্যাসির ২৯ নিয়ামতপুর ৩০ হাজারহাটী ৩১ ইউসফপুর। এই মহালের রাজস্ব ১৯৬৯৫৫৭ দাম ৯০০ অশ্বারোহী ও ৫০৭০০ পদাতিক সরবরা হকরে।

৪। সরকার মামুদাবাদ মহালের সংখ্যা ৮৮ যথা ১ অদীনা ২ অনুত্তনপুর ৩ উজ্জলপুর ৪ ইন্দ্রবাণী ৫ খান্দে ৬ বাজুরাস্ত ৭ বাজুকুপ ৮ বিবারী ৯ বিশি ১০ বারীনজুমনা ১১ বেতবাড়িয়া ১২ রাতনান

১৩ বাক্স ১৪ বানেওয়ালী ১৫ তেরৌওয়াল ১৬ বাটিকামড়া ১৭ বাবেন করলা ১৮ পরাণপুর ১৯ বর্ণপুর ২০ পাঁটিকাবাড়ী ২১ পোপবাড়িয়া ২২ বাগুটীয়া ২৩ বুলগাছী ২৪ তারাকোনা ২৫ তিরীঘাটা ২৬ তেরজীল ২৭ চাদীয়া ২৮ জিয়ারফী ২৯ জগন্নাথপুর ৩০ জিদিবাড়ীয়া ৩১ জিদিয়া ৩২ চৈতন্যবাজু ৩৩ হোসেনউজল ৩৪ হাবেলী ৩৫ খালিসপুব ৩৬ খিজির খানা ৩৭ করিমপুর ৩৮ দেকারী ৩৯ দুর্লভপুর ৪০ ঢুলী ৪১ হেদৎ জেলালপুর ৪২ ডুমিন্যা ৪৩ ধুমারহাট ৪৪ সদকাচাল্যাকোটা ৪৫ সারুটীয়া ৪৬ সিরসিরিয়া ৪৭ শঙ্করদিয়া ৪৮ সোলিমপুর ৪৯ গোকসা ৫০ স্বরূপপুর ৫১ সালিবেড়িয়া ৫২ সাতোর ৫৩ সাহজীন ৫৪ শ্রীপুর বাড়ী ৫৫ শ্রীপুর রথশালী ৫৬ আজমৎপুর ৫৭ গজনীপুর ৫৮ ফরকেৎপুর ৫৯ ফতেপুর নসিকা ৬০ কুতবপুর, ৬১ কাজীপুর ৬২ কুন্দলিয়া ৬৩ খেলপাটী ৬৪ কুণ্ডীনেউরী ৬৫ ফুলবেড়িয়া ৬৬ কল্যাণপুর ৬৭ কুলীমহাল ৬৮ লখ্যান ৬৯ লুনগোহাল ৭০ সেমেনসাহী ৭১ গণ্ডদা ৭২ মুথিয়া ৭৩ মামুদসাহী ৭৪ মিরপুর ৭৫ মহেশ্বরপুর ৭৬ মধুতোমা ৭৭ মারুপদিয়া ৭৮ নলদী ৭৯ নসরৎসাহী ৮০ নিকারী হালকুরী ৮১ দিকারবাকা ৮২ নসীপুর ৮৩ হস্তনপুর ৮৪ হলদা ৮৫ হাওয়ালঘাটী ৮৬ হেতাগান ৮৭ হুসীপুর ৮৮ দেওরা।

এই মহলের রাজস্ব ১১৬১০২৫৬ দাম অশ্বারোহির সংখ্যা ২০০ ও পদাতিকের সংখ্যা ২০০০ সহস্র।

৫। সরকার খালী ফেঁতাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩৫ যথা ১ বহল ২ ভালগা ৩ পোগা ৪ জুনগা ৫ বাঘমরো ৬ ফালদী ৭ ভাদিজ ৮ ভাগ্যলা ৯ ফুলনগর ১০ তালুক-কাশীনাথ ১১ তালা ১২ তালুক সেরিসিং ১৩ তালুক মহেশ মণ্ডল ১৪ তালুক নৱৌদর ভট্টাচার্য্য ১৫ সরিপথ কবিরাজ ১৬ যশোহর

(রসুলপুর) ১৭ চেরোলা ১৮ চেবুরা ১৯ হাবেলীখলি ফেতাবাদ ২০ খালীশপুর ২১ দান্সা ২২ বানেকদিয়া ২৩ সাহেসপুর ২৪ সলিমোমাবাদ ২৫ স্নাহস ২৬ শোবনাথ ২৭ সালিসেরী ২৮ আমদপুর ২৯ ঘোগরাল ৩০ কুলকীর্ণ ৩১ তালুক পরমানন্দ ৩২ মুরিগাছ ৩২ মল্লিকপুর ৩৩ মুদেরিয়া ৩৪ মাঙ্গেবরেহাট ৩৫ মেহরিশা। এই সরকারের রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম অশ্বারোহী ১০০ পদাতিক ১৫১৫০ জন।

৬ সরকার বাকলা—

মহালের সংখ্যা ৪ যথা ১ ইসমাইলপুর (বাকলা) ২ শ্রীরামপুর ৩ ইদিলপুর ৪ সাহাজাদপুর। রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ দাম অশ্বারোহী ৩২০ ও পদাতিক ১৫০০০ সহস্র।

৭। সরকার পূর্ণিয়া—

মহালের সংখ্যা ৯ যথা ১ আসোনজা ২ জয়রামপুর ৩ হাবেলী পূর্ণিয়া ৪ দানমালপুর ৫ সুলতানপুর ৬ শ্রীপুর ৭ সায়ের হাসিলফিলান (হাবিরকর) ৮ কুষ্টিয়ারী ৯ গদোয়ান রাজস্ব ৬৪০৯৭৯৩ দাম অশ্বারোহী ১০০ পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

৮। সরকার তাজপুর—

মহালের সংখ্যা ২৯ যথা ১ পানঘাট ২ বুদৈথার ৩ ফুলী ৪ রান্দোল ৫ বৌবাবরা ৬ ভুবনসেরা ৭ বারগাঁ ৮ বালীগাঁ ৯ বনগাঁ ১০ বাহাদুরপুর ১১ বাহানগর ১২ বাহুল্যা ১৩ তালদেওয়ার ১৪ চাগরতাল ১৫ হাবেলী তাজপুর ১৬ দেনাওরপুর ১৭ দাইহাটা ১৮ সইসেরা ১৯ সাজাপুর ২০ সাহাপুর ২১ গৌরীপুর ২২ কুশারগাঁ ২৩ গোপালনগরি ২৪ গোগেরা ২৫ মাসুল ২৬ নীলনগর ২৭ ইউসফপুর ২৮ জেফাওত ২৯ নীলুন, রাজস্ব ৬৪৮৩৮৫৭ দাম ১০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক সরবরাহ থাকে।

৯। সরকার ঘোড়া ঘাট— ..

মহালের সংখ্যা ৮৪ যথা ১ আধেরে ২ আমড়হর ৩ অগুালগাঁ ৪ আলওয়ারবান ৫ অনগাঁ ৬ এমধেথুরা ৭ আমেদাবাদ ৮ অম্বিলাগাছী ৯ আনোয়ার মল্লিক ১০ আলহাট ১১ আলহাবাদপুর ১২ বাজুবন্দ জাফরসাহী ১৩ বাজুসোলাদসাহী ১৪ তাকড়েওয়ার ১৫ ফুলরী ১৬ বারবাকপুর ১৭ বামনপুর ১৮ নসরতাবাদসহর ১৯ বারশিলা ২০ বেরিজামকবাল্লা ২১ বেরিঘোড়াঘাট ২২ রায়জিদপুর ২৩ পটলভিহি ২৪ বালকা ২৫ ভুলী ২৬ বাদপুতারী ২৭ বানওযার কাটার ২৮ ভাগ ঘাটী ২৯ বাজারচেটঘাট ৩০ বালাসবাড়ী ৩১ রাজেমট্কা ৩২ তুলসীঘাট ৩৩ তালুক হাসেন ৩৪ তালুকবাললাট ৩৫ তালুক সিউয়ান ৩৬ তালুক কেশী ৩৭ তাকেল ৩৮ তালুক আমেদ খাঁ ৩৯ হামেনা ৪০ খথেরা ৪১ বাদী ৪২ খাসবাড়ী ৪৩ রোকনপুর ৪৪ সুলতানপুর ৪৫ শিথসহর ৪৬ শনহীপুর ৪৭ সারহাটা ৪৮ সুবদী ৪৯ শীতপুর ৫০ সূর্য্যকুণ্ডী ৫১ সাঘাটা ৫২ সেরপুর গোয়েবাড়ী ৫৩ ফতাপুর ৫৪ কুবীয়ারী ৫৫ বায়াপুর ৫৬ কাবুলপুর ৫৭ গাংশেখমালী ৫৮ কুস্তকেদী ৫৯ গোকুল ৬০ কুঠী ওতারি ৬১ থলসী ৬২ গবীবাড়ী ৬৩ কুলীবাজার ৬৪ গোবিন্দপুর খেন্দ ৬৫ গটনালা ৬৬ কালিক সুখের ৬৭ ঘাটনগর ৬৮ কোয়াগাছী ৬৯ কাটীবাড়ী ৭০ গাওরা ৭১ গাতগ্রাম ৭২ কাকুল ৭৩ বারহিয়া ৭৪ গোকুলপাড়া ৭৫ মুকুমপুর ৭৬ মহবৎপুর ৭৭ মসজিদ হোসেনসাহী ৭৮ মজিদ আধারখালী ৭৯ মুল্রীয়োর ৮০ নন্দেরা ৮১ নপাড়া ৮২ নাহিজন বাটার ৮৩ বেকারীহাজার ৮৪ উয়াটী ও ৮৫ ও রাবীব এই সরকারের রাজস্ব ৮৩৮৩০৭২ দাম অশ্বারোহী ৯০০ শত হস্তী ৫০ এবং ২৬০টী পদাতিক।

১০। সরকার পিঞ্জিরা।

মহালের সংখ্যা ২১ ; যথা—১ ওপোল ২ আমবাড়ী ৩ আন্নগেছি ৪ বেরেংপুর ৫ বিজানগর ৬ বায়জিদপুর ৭ বাহার নগর ৮ বাড়ীঘায়ব ৯ বাড়খাড় ১০ তাকাসী ১১ হালুন ১২ হাবেলী পিঞ্জিরা ১৩ দিঘা ১৪ দেওরা ১৫ শ্রীধরবাড়ী ১৬ শুক্রা ১৭ সুলতানপুর ১৮ শশীবীর ১৯ সলিমনাবাদ ২০ খেতা ২১ কিদাবাড়ী, রাজস্ব ৫৮০৩২৭৫ দাম অশ্বারোহী ৫০ জন এবং ৭০০০ সহস্র পদাতিক।

১১। সরকার ব্যরকাবাদ।

মহালের সংখ্যা ৩৬ ; যথা—১ ওমরুল ২ হাবকাবাদ সহর ৩ বাসদোল ৪ পোনাহার ৫ বাসতোলা ৬ বারবুড়িয়া ৭ বানগা ৮ বাগটাপুর ৯ জয়রিয়া বাজু ১০ চৌড়া ১১ জাসন চোগা ১২ চাঁদ লয় ১৩ হায়নাম্বু ১৪ হাবেলী শিকসেহার ১৫ ধারমেন ১৬ দাউদপুর ১৭ শঙ্কর দল (নিজামপুর) ১৮ শীকারপুর ১৯ সেরপুর ও বহরমপুর ২০ তাহিরপুর ২১ কাজিহাটী ২২ করদহ ২৩ গুজারহাট ২৪ খাস ২৫ চকদল ২৬ গোবিন্দপুর ২৭ কালাগাই গৌহাটী ২৮ খারল ২৯ গোদানগর ৩০ কালীজী ৩১ লস্করপুর ৩২ মালাচীপুর ৩৩ মাসদা ৩৪ ননসেমালী ৩৫ মামুদপুর ৩৬ উজীরপুর। রাজস্ব ১৭৪৫১৫৩২ দাম ৫০ অশ্বারোহী ৭০০০ সহস্র পদাতিক সরবরাহ হয়।

১২। সরকার বাজুহা।

মহালের সংখ্যা ৩৩ ; যথা—১ আলাপাসাহী (আলাপসিং) ২ বাড়-বাজু ৩ নসীতসাহী ৪ মেবানে ৫ খাবান ৬ হেরানা ৭ সেরালী ৮ বেসেরিয়া বাজু ৯ বেহোয়াল বাজু (ভাওয়াল) ১০ প্রতাপবাজু ১১ পুখরিয়াবাজু ১২ হোসেন সাহী ১৩ দশকাহোনীয়া ১৪ ভুখাবাজু ১৫ সেলিম প্রতাপ বাজু ১৬ সুলতান প্রতাপ বাজু ১৭ চাঁদ প্রতাপ বাজু ১৮ সোণাঘাটী বাজু ১৯ সোণাবাজু ২০ শিল বারস ২১ সায়র জলকর ২২ সাহাজিয়াল

বাজু ২৩ জাফরোজিয়ালবাজু ২৪ কাটার মলবাজু ২৫ কাটাবাজু ২৬ মামুনসাহী (ময়মনসিং) সেরপুর মুরকে ২৭ সেনঘুছিমেন ২৮ মির-হাসেন ২৯ নসরৎসাহী ৩০ সিংলবৎ উজীল ৩১ মোবারক উজাল ৩২ হরিয়ালবাজু ৩৩ উসীসাহী। রাজস্ব:৩৯৫১৬৮৭১ দাম ১০ হস্তী ১.৭০০ শত অশ্বারোহী ৪৫৩০০ পদাতিক সরবরাহ হয়।

১৩। সরকার সোণার গাঁ।

মহালের সংখ্যা ৫১; যথা—১ অবতার সাহপুর ২ আলচাপ ৩ অবতার ওসমানপুর ৪ বিক্রমপুর ৫ বেলাজেওয়ার (ভুলুয়া জোয়ার) ৬ বলদা-খাল ৭ বোয়ালিয়া ৮ পারচাঁদী ৯ বাটথাড়া ১০ পালাশঘাটী ১১ চরদিয়া ১২ ফুলরী ১৩ পানহাটী ১৪ তাওয়া ১৫ তাজপুর ১৬ তিরকী ১৭ যোগীদিয়া ১৮ জেওয়ার বন্দর ১৯ চোকেন্দরা ২০ চণ্ডীহার ২১ চাঁদপুর ২২ হাবেলী সোণার গাঁ (মরুসহর) ২৩ খিজিরপুর ২৪ দোহার ২৫ ডালডেরা ২৬ দেথান সাহপুর (দক্ষিণ সাহপুর) ২৭ দেলওয়ারপুর ২৮ দেকান ও সমানপুর ২৯ রায়পুর ৩০ সুখারগঞ্জ ৩১ সুকেরী ৩২ সোলিমপুর সেলিসেরী মায় সায়রজলকর ৩৩ সুকাওশা ৩৪ সুকদিয়া ৩৫ সেবারবল ৩৬ শমসপুর ৩৭ কড়াপুর ৩৮ গরদী ৩৯ কার্ত্তিকপুর ৪০ কাঁদী ৪১ কালহরি ৪২ ঘাটীহুলাই ৪৩ মারকোর ৪৪ মজমপুর ৪৫ মেহার ৪৬ মনোহরপুর ৪৭ মাহীজল ৪৮ নারায়ণপুর ও সায়রজকাত ৪৯ লেহয়া কোট ৫০ হিমতাবাজু ৫১ হাটশাটী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম। এই সরকার ১৫০০ শত অশ্বারোহী ২০০ শত হস্তী এবং ৪৬০০৭ হাজার পদাতিক সরবরাহ করিত।

১৪। সরকার সিলেট (শ্রীহট্ট)।

মহালের সংখ্যা ৮; যথা—১ প্রতাপগড় ২ বায়ানখুণ্ড ৩ বাহয়া সাহর চিনতার ৫ হাবেলী সিলেট ৬ সারকুণ্ডল ৭ নদ ৮ কর্ণগড়। এই

মহালের রাজস্ব ৬৬৮১৬২০ দাম। অশ্বারোহী ১০০ শত ও পদাতিক ১৫০০ পোনর শত ছিল।

১৫। সরকার চট্টগ্রাম।

মহালের সংখ্যা ৭; যথা—১ চাটিগাঁ ২ মালগাঁ ৩ দিউগাঁ ৪ সলিমানপুর (সেকপুর) ৫ মেরাজ নিমকসর (লবণের উপর শুল্ক) ৬ সনহোয়া ৭ নওপাড়া। রাজস্ব ১১৪২৩১০ দাম অশ্বারোহী ১০০ ও ১৫০০ শত পদাতিক ছিল।

১৬। সরকার সৈরিফাবাদ।

মহালের সংখ্যা ২৬; যথা—১ বর্দ্ধমান ২ বেরোর ৩ বারিকশীল ৪ ভরগোদা ৫ আকবরসাহী ৬ বাঘা ৭ ভাতশালা ৮ বাজার ইব্রাহীমপুর ৯ জঙ্গী ১০ কোটমাকুণ্ড ১১ ধল্যান ১২ সালিমানসাহী ১৩ সোনাই ১৪ হাবেলীসেরপুর আজমৎসাহী ১৫ ফতেসিং ১৬ হাসেন উজীল ১৭ কারগাঁ ১৮ কীর্ত্তিপুর ১৯ খন্দ ২০ খুঙ্গরা ২১ কোদেনা ২২ মালেন্দ ২৩ মানোয়ারসাহী ২৪ মজফরসাহী ২৫ নিসাং ২৬ লুবরান। রাজস্ব ২২৪৮৮৭৫০ দাম অশ্বারোহী ২০০ শত পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

১৭। সরকার সলিমনাবাদ।

মহালের সংখ্যা ৩১; যথা—১ ইন্দ্রায়ন ২ ইসলামপুর ৩ উনালিয়া ৪ ওউলা ৫ বসুন্দরী ৬ ভোস্ত ৭ পাণ্ডুয়া ৮ রাজমোর ৯ বালীচঙ্গর ১০ ছুটিপুর ২১জুমা ১১ জয়পুর ১৩ হোসেনপুর ১৪ ধারসা ১৫ রেসাক ১৬ হাবেলী সলিমানাবাদ ১৭ সাতাসহিবা ১৮ সাহসপুর ১৯ সান্দোলী ২০ সুলতানপুর ২১ ওমারপুর ২২ আলমপুর ২৩ কাবুজপুর ২৪ গোবিন্দ ২৫ ক্ষুদ্র তালুকদারগণ ২৬ মহম্মদপুর ২৭ মুলখড় ২৮ মাকীল ২৯ নায়েক ৩০ পেসাং ৩১ লীলা। রাজস্ব [illegible] অশ্বারোহী ১০০ ও পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

বাজু ২৩ জাফরোজিয়ালবাজু ২৪ কাটার মলবাজু ২৫ কাটাবাজু ২৬ মামুনসাহী (ময়মনসিং) সেরপুর মুরফে ২৭ সেনঘুছিমেন ২৮ মির-হাসেন ২৯ নসরৎসাহী ৩০ সিংলবৎ উজীল ৩১ মোবারক উজাল ৩২ হরিয়ালবাজু ৩৩ উসীসাহী। রাজস্ব:৩৯৫১৬৮৭১ দাম ১০ হস্তী ১.৭০০ শত অশ্বারোহী ৪৫৩০০ পদাতিক সরবরাহ হয়।

১৩। সরকার সোণার গাঁ।

মহালের সংখ্যা ৫১; যথা—১ অবতার সাহপুর ২ আলচাপ ৩ অবতার ওসমানপুর ৪ বিক্রমপুর ৫ বেলাজেওয়ার (ভুলুয়া জোয়ার) ৬ বলদা-খাল ৭ বোয়ালিয়া ৮ পারচাঁদী ৯ বাটখাড়া ১০ পালাশঘাটী ১১ চরদিয়া ১২ ফুলরী ১৩ পানহাটী ১৪ তাওয়া ১৫ তাজপুর ১৬ তিরকী ১৭ যোগীদিয়া ১৮ জেওয়ার বন্দর ১৯ চোকেন্দরা ২০ চণ্ডীহার ২১ চাঁদপুর ২২ হাবেলী সোণার গাঁ (মরুসহর) ২৩ খিজিরপুর ২৪ দোহার ২৫ ডালডেরা ২৬ দেখান সাহপুর (দক্ষিণ সাহপুর) ২৭ দেলওয়ারপুর ২৮ দেকান ও সমানপুর ২৯ রায়পুর ৩০ সুখারগঞ্জ ৩১ সুকেরী ৩২ সোলিমপুর সেলিসেরী মায় সায়রজলকর ৩৩ সুকাওশা ৩৪ সুকদিয়া ৩৫ সেবারবল ৩৬ শমসপুর ৩৭ কড়াপুর ৩৮ গরদী ৩৯ কার্ত্তিকপুর ৪০ কাঁদী ৪১ কালহরি ৪২ ঘাটীহুলাই ৪৩ মারকোর ৪৪ মজমপুর ৪৫ মেহার ৪৬ মনোহরপুর ৪৭ মাহীজল ৪৮ নারায়ণপুর ও সায়রজকাত ৪৯ লেহয়া কোট ৫০ হিমতাবাজু ৫১ হাটঘাটী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম। এই সরকার ১৫০০ শত অশ্বারোহী ২০০ শত হস্তী এবং ৪৬০০৭ হাজার পদাতিক সরবরাহ করিত।

১৪। সরকার সিলেট (শ্রীহট্ট)।

মহালের সংখ্যা ৮; যথা—১ প্রতাপগড় ২ বায়ানথুণ্ড ৩ বাহুয়া সাহর ৪ চিনতার ৫ হাবেলী সিলেট ৬ সারকুণ্ডল ৭ নদ ৮ কর্ণগড়। এই

মহালের রাজস্ব ৬৬৮১৬২০ দাম। অশ্বারোহী ১০০ শত ও পদাতিক ১৫০০ পোনর শত ছিল।

১৫। সরকার চট্টগ্রাম।

মহালের সংখ্যা ৭; যথা—১ চাটিগাঁ ২ মাসগাঁ ৩ দিউগাঁ ৪ সলিমানপুর (সেকপুর) ৫ মেরাজ নিমকসর (লবণের উপর শুল্ক) ৬ সনহোয়া ৭ নওপাড়া। রাজস্ব ১১৪২৩১০ দাম অশ্বারোহী ১০০ ও ১৫০০ শত পদাতিক ছিল।

১৬। সরকার সৈরিফাবাদ।

মহালের সংখ্যা ২৬; যথা—১ বৰ্দ্ধমান ২ বেরোর ৩ বারিকশীল ৪ ভরগোদা ৫ আকবরসাহী ৬ বাঘা ৭ ভাতশালা ৮ বাজার ইব্রাহীমপুর ৯ জঙ্গী ১০ কোটমাকুণ্ড ১১ ধল্যান ১২ সালিমানসাহী ১৩ সোনাই ১৪ হাবেলীসেরপুর আজমৎসাহী ১৫ ফতেসিং ১৬ হাসেন উজীল ১৭ কারগাঁ ১৮ কীর্ত্তিপুর ১৯ খন্দ ২০ খুঙ্গরা ২১ কোদেনা ২২ মালেন্দ ২৩ মানোয়ারসাহী ২৪ মজফরসাহী ২৫ নিসাং ২৬ লুবরান। রাজস্ব ২২৪৮৮৭৫০ দাম অশ্বারোহী ২০০ শত পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

১৭। সরকার সলিমনাবাদ।

মহালের সংখ্যা ৩১; যথা—১ ইন্দ্রায়ন ২ ইসলামপুর ৩ উনালিয়া ৪ ওউলা ৫ বসুন্দরী ৬ ভোস্ত ৭ পাণ্ডুয়া ৮ রাজমোর ৯ বালীচঙ্গর ১০ ছুটিপুর ২১জুমা ১১ জয়পুর ১৩ হোসেনপুর ১৪ ধারসা ১৫ রেসাক ১৬ হাবেলী সলিমানাবাদ ১৭ সাতাসহিবা ১৮ সাহসপুর ১৯ সান্দোলী ২০ সুলতানপুর ২১ ওমারপুর ২২ আলমপুর ২৩ কাবুজপুর ২৪ গোবিন্দ ২৫ ক্ষুদ্র তালুকদারগণ ২৬ মহম্মদপুর ২৭ মুলখড় ২৮ মাকীল ২৯ নায়েক ৩০ পেসাং ৩১ নীলা। রাজস্ব [illegible] অশ্বারোহী ১০০ ও পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

১৮। সরকার সাতগাঁ।

মহালের সংখ্যা ৩৭ ; যথা—১ বেনোয়া, কোতোয়ালী ও ফরাস গড় ২ ওকেয়া ৩ আলোয়ারপুর ৪ এরসাদ তোয়ালী ও পুরা ৫ বার মাহিরী ও মালিকহাটী ৬ বিরগাঁ ৭ বনিন্দা ৮ বাগোয়ান ও বঙ্গবাড়ী ৯ বললিয়া ১০ পোগলা ১১ বায় মুঠাটী ১২ তুরতেরিয়া ১৩ হাবেলী সহর ১৪ হোসেনপুর ১৫ হাজিপুর ও বারবাকপুর ১৬ ধনিয়াপুর ১৭ রাণীহাট ১৮ সাদঘাটী ১৯ সবকোটা ২০ স্বরূল রাজপুর ২১ বন্দর ও হাট বাজারের কর ২২ সাবাট ও কাটশাল ২৩ ফতেপুর ২৪ কলিকাতা মকুমা ও বারবাকপুর ২৫ খায়ের ২৬ খাঁদালিয়া ২৭ গিনারাওয়া ২৮ মৃকোরা ২৯ মিটারী ৩০ মেদিনী মল ৩১ মোজাফর পুর ৩২ মুড়াগাছা ৩৩ মাহাহাট ৩৪ নদীয়া ও সাতেলপুর ৩৫ শানকী ৩৬ হাতীকুণ্ড ৩৭ হাইগড়। রাজস্ব ১৬৭২৪৭২০ দাম অশ্বারোহী ৫০ জন পদাতিক সংখ্যা ৬০০ শত মাত্র।

১৯। সরকার মাদারন।

মহালের সংখ্যা ১৬ ; যথা—১ আনহাটী ২ বালগুরী ৩ বীরভূম ৪ ভেওয়ালভূম ৫ ছিতোয়া ৬ চুন্সানবারী ৭ হাবেলী মাদারণ ৮ সেনভূম ৯ সমর সন্ন্যাস ১০ সেরগর (সুখের ভূম) ১১ শাহপুর ১২ কেইত ১৩ মণ্ডেলঘাট ১৪ নগর ১৫ মীনাবাগ ১৬ হাসোলী। রাজস্ব ৯৪০৩৪০০ দাম ১৫০ অশ্বারোহী ৭০০০ পদাতিক।

এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার অন্তর্গত, সরকার জলেশ্বর; সরকার ভদ্রক ; সরকার কটক ও সরকার কুলেল দণ্ডপাৎ নামে আরও চারিটী সরকার ছিল।

বিহারের অন্তর্গত সরকার বিহার ; সরকার মুঙ্গের ; সরকার [illegible] সরকার হাজীপুর ; সরকার সারণ ; সরকার ত্রিহুত ; সরকার রোটাস এই সাত ভাগে বিভক্ত ছিল।

টোডরমল্লের অসামান্য পরিশ্রমে এইরূপে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া বাদসাহের প্রচুর আয়ের কারণ হয়, এজন্য আকবর সাহ টোডরমল্লকে —রাজাউপাধি ও দিল্লীর রাজস্ববিভাগের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া তৎপদে আজিজ খাঁ বা খানি আজিমকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন (১৫৮২ খৃঃ অব্দে)।

চতুর্থ অধ্যায়।

আজিজ্ খাঁ বা খানি আজিম মীর্জ্জা কোকা।

বাদসাহের শাসনের অষ্টাবিংশ বৎসরে (১৫৮২ খৃঃ অব্দে) খানি আজিম বঙ্গবিহারের নবাবী পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রতি বাদসাহের আদেশ ছিল বিহারের বিদ্রোহ সম্যক্ নিবারিত হইলে যেন বঙ্গদেশীয় বিদ্রোহীদিগকে বিশেষরূপে নিরস্ত ও শাসন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বিহারের শান্তি স্থাপন করিতে নবাবকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। এই সময় বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমনের জন্য কতককাল অপেক্ষা করিতে হইল।

বর্ষাপনয়নের পর, সাধীখান, শেখ ইব্রাহীম, শেখ ফরিদ বুখারি, রাজধানী দিল্লী হইতে প্রেরিত হইলেন। এ দিকে শেখ ইব্রাহীমেরও অযোধ্যার এবং বিহারের জায়গীরদারদিগের নিকট সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাদসাহের আজ্ঞা প্রচারিত হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই হাজীপুরে বহু বাদসাহী সৈন্যের সমাবেশ হইল। উৎসাহী সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য বড়ই ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। খানি আজিম স্বয়ং মনোনীত সৈন্যসহ গাড়ীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। অপর সেনানায়ক টারসিন

খাঁ ও অপর কয়েকজন সেনাপতি নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীর ধরিয়া চলিলেন; কিন্তু বৃক্ষ, পাহাড়, জঙ্গ, কর্দম অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য বিবেচনায়, তাঁহারা পুনরায় নদী পার হইয়া মুঙ্গেরের নিকটস্থ রাজকীয় সৈন্যদলসহ যোগ প্রদান করিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীদল কালীগঞ্জের নিকট একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দলস্থ মীর সারবুদ্দীন হোসেন, বাবাহাসকাক্কাল এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় মাসুম কাবুলী দলের নেতা নির্দ্দিষ্ট হন। এ দিগে কুতুল খাঁ উড়িষ্যার ভারপ্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গলার কতকাংশ অধিকার করিয়া লয়। দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর বাদসাহের সহিত সন্ধি-সূত্রে কুতুল উড়িষ্যার কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। বাদসাহী সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া মাসুম কাবুলী কুতুল খাঁর সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিল এই উপায়ে কুতুলকে সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য করিতে পারিলে, বাদসাহী সৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তাঁহার আশা সফল হইল; পরে কুতুলের পরামর্শক্রমে মাসুম ঘোড়াঘাটে যাইয়া জাব্বারিক, মুজাবেগ এবং অন্যান্য কাক্কাল জাতিদিগকে নিজদলভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এমন কি, তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বীয় পরিবার-বর্গকে কাক্কাল (কাঁকষাল)-দিগের আশ্রয়ে রাখিয়া দিয়া, উহাদের সহিত একত্রিত হইয়া কালীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাদসাহসৈন্যের পুরোভাগ বাঙ্গলার দ্বার স্বরূপ "গড়িয়া" ইতি-পূর্ব্বেই অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল। এই স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই আমীরদিগের সহিত বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ হয়।

কুতুল প্রথম আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কায়, নদীর তীরে গম্বুজ-নির্ম্মিত ও রণতরী সকল সুসজ্জিত হইয়া রহিল। চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাদসাহ পক্ষ হইতে উজীর খাঁকে বালকোণার দিকে প্রেরণ করা হইল। কথা থাকিল, এই সকল সৈন্যসহ সেনাপতি শত্রুর গতি-বিধির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। উজির রাজকীয় সৈন্যসহ দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ তীর ও বন্দুকের পরীক্ষা চলিল। বাদসাহের সৈন্যেরা বিপক্ষের বল অধিক বিবেচনায় কিছু বিচলিত হইয়া, সম্রাটের নিকট আরও অধিক সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। দূরদর্শী বাদসাহ আকবর তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু বলিলেন "তদীয় সৈন্যদলের আর সাহায্য চাহিবার আবশ্যক ছিল না। আমার স্থির বিশ্বাস, নব সৈন্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি বিজয় সংবাদ প্রাপ্ত হইব।"

বাদসাহী সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদের মাসকালব্যাপী সমর চলিল। এই সময়ে কাজীজেদা নামে একজন বিদ্রোহীনেতা ফতেয়াবাদ (বর্ত্ত-মান ফরিদপুর) হইতে বহু যুদ্ধ জাহাজ, কামান, বন্দুক লইয়া উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীদলের মধ্যে বড়ই আনন্দের প্রবাহ চলিল। তাহাদের এই সুখের ভাব কিন্তু অধিক দিন রহিল না। কারণ কাজীজেদা বিপ-ক্ষের গোলাঘাতে অচিরাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তৎস্থানে কালাপাহাড় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদলের মধ্যে বড়ই মতান্তর উপস্থিত হইল। বাঙ্গলার নবাব আজীজ খাঁ এই সময় অনেক বিদ্রোহ নায়ককে নানা উপায়ে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। বিদ্রোহীদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। বিপক্ষ পক্ষ হইতে খালীদ বা খালিদ্দী ও কাকৃষাল জাতিয়া বাদসাহ

পক্ষে যোগ প্রদান করিয়াছিল। অচিরে এই শুভ সংবাদ বাদসাহ সকাশে পৌহছিল, বাদসাহের অনুমতিক্রমে যে সকল নূতন সৈন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া আপনার ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতার জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কাকৃষাল জাতি পুনরায় বাদসাহের সহিত সম্মিলিত হওয়ায়, যদি তাহাদের দ্বারায় স্বীয় পরিজনের কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে এই আশঙ্কায় মাসুম কাবুলী, কাকৃষালদের দেশে উপস্থিত হইল। কাকৃষালদের নেতা মৃজা মহম্মদ তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ জাতির সাধারণ লোক সকল ইহাতে উত্যক্ত হইয়া মাসুমকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইল। তখন মাসুম ঘোড়াঘাট লুণ্ঠন করিয়া কাকৃষালদেশ আক্রমণ করিল। অচিরে এই সংবাদ নবাব আজীজখাঁর কর্ণগোচর হওয়ায়; সেনাপতি তারসুন খাঁকে চারি সহস্র সৈন্যসহ কাকষালদের সাহায্য জন্য প্রেরণ করিলেন। তারসুন বিদ্রোহীনায়ক মাসুমকে ঘোড়াঘাট হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন কাকৃষাল জাতির অধিনায়ক মৃজা বেগ খালিদ্দীন ও ওয়াজির জালিম প্রভৃতি পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া নবাব আজীজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। মাসুমকে পরাস্ত করিয়া কুতুলখাঁর দমন জন্য নবাব আজীজ উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় যশস্বী রণবীর নবাব আজীজ খাঁ খানিআজিম্ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপদে সাহাবাজ খাঁ দিল্লী হইতে বঙ্গবিহারের সুবেদারী পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ৯৯০ হিজরী (১৫৮৪ খৃঃ অব্দে)।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহাবাজ খাঁ কামু।

সাহাবাজ খাঁ বড়ই দুর্দ্দিনে বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। একদিকে বঙ্গদেশের পাঠান সর্দ্দারগণের বিদ্রোহ, অপর দিকে মঘ ও পর্টুগীসদিগের উপদ্রব। এই সময়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও সাহাবাজ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মঘ ও পর্টুগীজেরা কতকটা নির্য্যাতিত হইল বটে, কিন্তু পাঠানেরা কোনমতেও তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল না। আমরা প্রথমে মঘ ও পর্টুগীসদিগের বিবরণ বিবৃত করিলাম।

পর্টুগীসেরা ১৫২৯খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হয়। পরে বহু বিপ্লবের পর নানারূপ কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া তাহারা বাঙ্গলার নবাবের সহিত পরিচিত হয়।

১৫৩৬ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন বাদসাহের অধীনে যখন মামুদ সা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই সময় কতিপয় পর্টুগীস বন্দী অবস্থায় গৌড় নগরে অবস্থান করিতেছিল। সুরবংশীয় সের সা হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মামুদ তৎসমুদয় অবগত হইয়া বন্দী পর্টুগীসদিগকে এই সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিলেন যে, তাহারা তদীয় পক্ষাবলম্বন করিয়া সেরসার বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা করিবে। মামুদ সার সহিত মার্টীণ এলফোন্সের এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয়। সেরের সহিত মামুদের "গড়িয়াতে" * যুদ্ধ বাধিল। প্রতিজ্ঞামত পর্টুগীসেরা যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া সেরের প্রতিকূলে ভীষণ যুদ্ধ করিল। যদিও এই ব্যাপারে মামুদ পরাস্ত হইলেন, তথাপি

---

* গঙ্গা প্রথম বঙ্গদেশে যে স্থানে প্রবেশলাভ করিয়াছেন উহার নাম গড়িয়া।

পর্টুগীসদিগের প্রতিজ্ঞারক্ষা ও বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি প্রদান করিয়া গোয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কেবল ৫জন পর্টুগীস এইজন্য রহিল যে, সের ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে বিমুক্ত পর্টুগীসেরা তাহাদের বল বর্দ্ধিত করিয়া মামুদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবে। পর্টুগীস "ভাস্কডি পেরেজভি সামসারের" অধীনে নয় খানা যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া মামুদ সার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই মামুদ হত ও বঙ্গদেশ সেরসার হস্তগত হয়। (১)

বঙ্গদেশের অন্তর্ব্বিবাদে যখন মোগল পাঠান হিন্দু জায়গীরদার প্রভৃতি সকলেই ব্যস্ত, সেই সুযোগে পর্টুগীসেরা মঘরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঐ দেশে নানারূপ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনস্থান সকল লুন্ঠিত ও অধিবাসীরা বন্দীকৃত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে রক্ষা করে এমন আর কেহই রহিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু ছিল, তন্মধ্যে চণ্ড,ভণ্ড জাতি বা চণ্ডালগণ সংখ্যায় অধিক। এই সময় সুন্দরবনের পরিবর্ত্তে তথায় বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্ত্তমান ছিল। হয় ত কোনরূপ সংক্রামক রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপাতে প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতবেগে ভাসিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই ঝড়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (২) তৎপরে দুর্ভাগ্যের

(১) কলিকাতা রিভিউ ৫৩ ভলুম চাটীগার ফিরিঙ্গি শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

(২) বাক্‌লা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত; এখনকার দুর্গ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে

সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল কবলিত হইয়া জনহীনতার মাত্রা বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত কারণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ঐ সকল কারণে বিশেষতঃ পরিশেষে মঘ ও পর্টুগীসদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটী প্রথমটীর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল। (১)

সাহাবাজ খাঁ সর্ব্বপ্রথম এই আততায়ী দস্যুদলের দমন করিবার সংকল্প করিয়া মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। যেস্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, কালক্রমে এই স্থান সাহাবাজ পুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া একটী পরগণায় পরিণত হয় *।

নির্ম্মিত। এখানে সমুদ্র জল শুক্ল প্রতিপদের দিন হইতে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং চতুৰ্দ্দশী পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহার পর হইতে চান্দ্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কমিতে থাকে। বর্ত্তমান বাদসাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে, একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রের জল বাড়িতে আরম্ভ হয়; অল্পক্ষণ মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সে দিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন. সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। রাজপুত্র পরমানন্দ রায় কতকগুলি অনুচরসহ একটী উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সওদাগরগণ যেখানে একটুকু উচ্চভূমি পাইল, সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও অশনি-পাত হইয়াছিল। সমুদ্রও উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ঘর বাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্রোতের বেগে, প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবলমাত্র দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন ছিল না। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী জীবন বিসর্জ্জন করিল।

আইন-ই-আকবরী—বসুমতী এডিসন ৩৫ পৃষ্ঠা।

(১) বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস।

* বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর

এই ব্যাপারে বিদ্রোহীদল বিশেষতঃ বাকলা ও শ্রীপুরের রাজা সাহাবাজ খাঁর প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন, অচিরে মঘ ও পর্টুগীসেরা পরাস্ত হইয়া সন্দিপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্য তাহাদের গতিরোধ জন্য একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। তখন আকাশ হইতে উল্কাপাত ও শৃগাল সকল উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে থাকে। এই অশুভ সন্দর্শনেও রাজা ভীত না হইয়া নিশীথে মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হন, তাঁহার পক্ষের ৩৪০০৩ সহস্র মুসলমানদের পক্ষে ৫০০০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই সময় মুসলমানেরা ত্রিপুরার অনেকস্থান লুণ্ঠন করিয়া লয়।*

সাহাবাজ খাঁর শাসনের প্রথম বৎসর বিখ্যাত ভ্রমণকারী রালফ্‌ফিস বঙ্গদেশে আগমন করেন; তাহার বর্ণিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি অবগত হওয়া যায়।

"আমি বঙ্গদেশের চাটীগাঁ হইতে বাকলায় উপস্থিত হইলাম; তথাকার রাজা একজন জেনটাইন, তিনি অমায়িক ছিলেন এবং বন্দুক সাহায্যে স্বীকার করিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহার রাজ্যটী বৃহৎ এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে ফল, ধান্য, কার্পাস রেশম উৎপন্ন হয়। গৃহগুলি অতি সুন্দর ও উচ্চ, বড় রাস্তা, অধিবাসীগণ প্রায়ই উলঙ্গ, মাত্র তাহাদের কোমরের ধারে ছোট একখানা কাপড় জড়াইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ঘাড়ে এবং বাহুতে অলঙ্কার পরিধান করে। পদদ্বয়ে, তাম্র, রৌপ্য এবং হস্তীদন্ত

উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ভোলা সব ডিভিসন এই পরগণার মধ্যবর্ত্তী। অতি পূর্ব্বকালে মেহেদিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুর গ্রামের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মা সংমিলিত হইয়াছিল।

* ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।

নির্ম্মিত রিং ব্যবহার করে ; পরে বাকলা হইতে শ্রীপুরে গমন করিলাম। শ্রীপুর গঙ্গা (১) নদীর পারে অবস্থিত রাজার নাম চাঁদ রায়, চতুর্দ্দিকেই তাহারা জেলালদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। ইহার এক কারণ এই যে এই স্থানে এত নদী ও দ্বীপ আছে যে তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে পারে কাজেই আকবরের অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। এখানে বিস্তর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীপুর হইতে ৬ লিগদূরে অবস্থিত সোণারগাসহর। এই স্থানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য সমস্ত রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খৃষ্টানদিগকে যত্ন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উত্তরাংশের ন্যায় এস্থানের ঘর গুলিও ছোট ছোট খড় দ্বারা আবৃত। দেয়ালের দ্বারা বা হোগলা দ্বারা বেড়ার কার্য্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ব্যাঘ্র ভল্লুকের উৎপাত হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ লোকই ধনশালী, অধিবাসীরা মাংস খায় না বা কোনরূপ জীব হিংসা করে না। চাউল, দুগ্ধ, ফল মূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। সামান্য একটু বস্ত্র কটিতে আবদ্ধ থাকে আর সমুদয় অনাবৃত। অনেক কার্পাস বস্ত্র এই স্থান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় এতভিন্ন ধান্য, চাউল, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে সিংহল, পেগু, মালক্কা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াও সংকুলন হয়। (২) পরে বালফ্‌ফিস ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দের ২৮ নবেম্বর শ্রীপুর হইতে জাহাজারোহণ করিয়া পেগুতে প্রস্থান

(১) পদ্মার শাখা কালীগঙ্গাতটে এই নগর সংস্থাপিত ছিল। মিঃ রেনেলের মানচিত্র দেখ।

(২) পারচেজ পিলগ্রিম পার্ট ২য় ৩৬২ পৃষ্ঠা।

করেন। পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন বাকলা বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ এবং শ্রীপুর বর্ত্তমান বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল পশ্চাৎ এতৎ বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণন করা যাইবে।

মঘ ও পর্টুগীস ত্রিপুরাদিগের নির্যাতনের পর সাহাবাজ উড়িষ্যার কুতুল খার বিরুদ্ধে সেখ ফরিদকে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল আমীরেরা সহজে কুতুলকে পরাজয় করিতে পারিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এখন তাহাদের সেই মোহ বিদূরিত হইল। কুতুল সহজে পরাজিত হইল না। মোগল সৈন্য দামোদর নদী পার হইয়া রণ সজ্জায় দুই ক্রোশ স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। কুতুল খাঁ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ; মোগল সৈন্য একটা পাহাড়ের উপর হইতে বিপক্ষের দিগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাঠান বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। তখন জেতৃ মোগল বাহিনী তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দামোদর নদী তটে শিবির সন্নিবেশ করিল।

মুজাবেগ কাকষাল তাজপুর গমন করিয়া তারসুন খাঁর সহিত মিলিত হইল। এই সময় মাসুদ খান ভাটীদেশ হইতে একদল বিদ্রোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সেনাপতি ও মুজাবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। মাসুমখাঁ কাবুলী নিকটবর্ত্তী দেশ লুণ্ঠন করিতে থাকিলে তারসুন দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। টাণ্ডা হইতে সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্রোহিরা বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। এই বিষয় সাহাবাজ খাঁ অবগত হইয়া বিদ্রোহী দল দমন জন্য তাহাদের দিগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বিপক্ষেরা যমুনানদী পার হইয়া পর পারে অবস্থান করিতে লাগিল।

শত্রুদের পলায়নের পর সাহাবাজ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তাপদে প্রতি-

ষ্ঠিত আমীর ওয়াদের খাঁকে তাণ্ডা হইতে লিখিয়া পাঠান—"কতুল খাঁ আর বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে না। এই সময়ে আপনি কতক সৈন্য আমার নিকট প্রেরণ করুন।" অতঃপর ওয়াদের আসিয়া সাহাবাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সেনাপতি সাহাবাজ গঙ্গানদী পার হইয়া অপর তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর ভাটী হইতে প্রত্যাগত তিন সহস্র সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। এই সকল সৈন্য ইতঃপূর্ব্বে সাহাবুদ্দিনের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন উহাদিগকে বিভাগ করিয়া টারসুন ও মৃজাবেগ কাকসালের অধীনে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে সংবাদ পাওয়া গেল, সন্তোষ-বন্দরে টারসুন বিদ্রোহিদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্যসহ মহিব আলি খাঁকে টারসুনের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া পরে সাহাবাজ তথায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতে থাকেন। অচিরে বিদ্রোহিদল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাহাদের বহু যুদ্ধোপকরণ বাদসাহ পক্ষের হস্তগত হয়।

মাসুম খাঁ যমুনাতীরে থাকিয়া সাহাবাজের গতিরোধ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সাহাবাজ সহস্র সহস্র তীর ও গোলা গুলির মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে নদী অতিক্রমণ করণানন্তর বিপক্ষের সন্নিহিত হন। বিদ্রোহীরা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে বাদসাহের রণতরী যোগদান করিতে পারে নাই। কেবল নারায়ণ ভৌমিক ও মুরাদের যুদ্ধজাহাজের সহায়তায় এই জয়লাভ সংঘটিত হয়।

পলাতকগণের অনুসরণ করিয়া মোহি আলি খাঁ তাহাদের পশ্চাৎ চলিয়াছিলেন। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এইবারও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। তৎপক্ষীয় মাসুম ফারান্দুদি বন্দী হইলেন।

সংগ্রাম ও দলপত রায়, মৃজাবেগ এই যুদ্ধে সাহাবাজের যথেষ্ট সহায়তা করেন। পরে ঘোড়াঘাটে প্রায় দেড় শত পলায়িত সৈন্য বন্দী হয়।

বাদসাহের রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সাহাবাজ খাঁ রণতরীর সাহায্যে সোণারগাঁও অভিমুখে অগ্রসর হন। তথায় উপনীত হইয়া ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁকে সাক্ষাৎকার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ঈশা খাঁ স্বয়ং তথায় উপনীত না হইয়া জনৈক অমাত্য প্রেরণ করিয়া সাহাবাজ খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। (১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহাবাজ খাঁ, ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী

ঈশার পিতার নাম কালিদাস গজদানী। ইনি রাজপুতানার বৈশ্য-জাতীয়। অযোধ্যাপ্রদেশ হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে বঙ্গে আগমন করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে সোনারগাঁওর নিকট কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। গজদানী প্রায়ই

(1) "The king of Patanaw was lord of the greatest part of Bengala, until the Mogul slew their last king. After which twelve of them joined in a kind or Aristocracy and vanquished the Moguls, and still notwithstanding Mogul's greatness, are great lords, specially he of Siripur and of Chandecan." (Purcha's Pilgrims).

বিদ্রোহী হইয়া রাজকর বন্ধ করিয়া দিতেন, এজন্য ক্রমান্বয়ে সোলিম খাঁ, তাজ খাঁ এবং ছবিয়ার খাঁ তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। পরে এক ভয়ানক যুদ্ধের পর তাহাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর কালিদাস সন্ধি করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান বটে, কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ায় রাজকীয় সেনাপতি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। কালিদাসের দুই পুত্র—ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ বণিকদিগের নিকট বিক্রীত হয়।

সলিম খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাজ খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তখন ঈশার পিতৃব্য কুতব খাঁ বিবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন, পরে তদানুকূল্যে বহু চেষ্টায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে তুরাণ দেশ হইতে পুনরায় স্বদেশে আনয়ন করেন। অচিরকালমধ্যে ঈশা সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় ও সদ্বিবেচনা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়া পিতৃব্য-পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বাহ্যিক আচরণ দ্বারা বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু বরাবর স্বাধীনতা লাভ জন্য মানসিক কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ঈশার চরিত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা এই উপলব্ধি হয়, তাঁহার কমনীয় দেহ যেরূপ একদিকে বীরত্ব-ব্যঞ্জক ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী ছিল, অপর দিকে সেইরূপ কপটতা, মিত্রদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তাঁহার অস্থিমজ্জার সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়ের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া মিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক চাঁদ রায়ের কন্যা সোণামণিকে হস্তগত করেন, তাহা ভাবিতে গেলে ঈশার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না

হইয়া পারে না। অতঃপর কতবার মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক, আবার তাহা উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা ভাবিতে গেলেও তদীয় জম্বুকচাতুর্য্যের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঈশা খাঁ যে একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও স্বদেশপ্রাণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবার কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বাধিল। সাহাবাজ খাঁ কপট না হইলেও অন্যান্য গুণগ্রামে তদপেক্ষা কোনমতে ন্যূন ছিলেন না।

সাহান সাহ বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মোগল সরকারের হস্তগত হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব করিতে বাদসাহের কিছু অর্থক্ষয় ও সৈন্যক্ষয় করিতে হইয়াছিল। তৎকাল পর্য্যন্ত পাঠান সামন্তগণ একেবারে হীনবল হইয়াছিলেন না। তাঁহারা বাঙ্গালা ও বেহারে দলবদ্ধ হইয়া মোগল গ্রাস হইতে ঐ উভয় দেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দু ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদের সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই।

তদ্ধেতু মোগলরাজকে সময়ে সময়ে প্রতিনিধি ও সেনা প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। স্বদেশরক্ষীরা কথন কথন জয় লাভ করিয়া মোগল সৈন্যদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিত। কথন বা পরাজিত হইয়া পর্ব্বত বা অরণ্যময় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণানন্তর শত্রুপক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বিহারদেশে কতলু লোহিনী বা কতুল খাঁ ও ওসমান খাঁ, বাঙ্গালায় মাসুম কাবুলী এবং সোনারগাঁও অন্তর্গত খিজিরপুরের ঈশাখাঁ মস্‌নদ ই আলী পাঠান দলের প্রকৃত নেতা ছিলেন।

প্রথম প্রস্তাবেই ঈশাকে পদানত হইতে দেখিয়া সেনাপতির মনে নিতান্ত সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তিনি তাহার চাতুরী বাহির করিবার আশায় ঈশাকে বলিয়া পাঠান যে, বাদসাহের শত্রু মাসুম খাঁ আপনার শাসিত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আপনি তাহাকে অবিলম্বে ধৃত করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করুন। লেখা বাহুল্য, তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইল না। এই জন্য সাহাবাজ খিজিরপুর অবরোধ করেন।

খিজিরপুরের দুর্গ অচিরে তাঁহার হস্তগত হইল। পরে "কর্ত্তাভু" নামক স্থানে ঈশার যে অস্ত্রাগার ছিল, তাহা এবং মস্বাদি গ্রামে তাহার যে রসদ ও ভাণ্ডারখানা ছিল উহা সাহাবাজ অধিকার করিয়া লয়েন। এদিকে ঈশা পলাইয়া প্রস্থান করেন। মাসুম অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণানন্তর তথায় কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গিগণ উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। ইতিমধ্যে ঈশা খাঁ প্রচুর সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করিয়া মাসুমের সাহায্যার্থ তথায় আসিয়া উপনীত হন। এইবার প্রচুর বল ও খাদ্যসম্ভার প্রাপ্ত হইয়া মাসুম মোগল সৈন্যের গতিরোধ জন্য পুনঃপ্রয়াসী হইয়া উঠিলেন।

বাদসাহী সেনাপতি শত্রুর বলবৃদ্ধি সন্দর্শনে "কুমার সনন্দ" বন্দরের বিপরীতদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রনদতীরবর্ত্তী "তোটক" নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিপক্ষের অপেক্ষা করিতে থাকেন। কয়েকটী যুদ্ধ হইল, তাহাতে মোটের উপর বাদসাহ পক্ষেরই জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু বিপক্ষেরও বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

এই সময়ে বজ্রাপুর নামক স্থানে পাঠানদের এক প্রবল বাহিনী একত্রিত হইবার সংবাদ পাইয়া, সাহাবাজ স্বীয় অধীনস্থ সেনাপতি

তারস্থন খাঁর উপর ঐ বিদ্রোহিগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

তোটক হইতে বজ্‌রাপুর যাইবার দুইটি পথ ছিল; তারস্থন ভাওয়ালের পথে তথায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই পথ সম্ভবতঃ শত্রুশূন্য হইয়া রহিয়াছে। অপর পথটি নদীর তীরবর্ত্তী কিন্তু বিপৎসঙ্কুল। কার্য্যকালে কিন্তু তাহাতে বিপরীত হইয়া পড়িল। কতক দূর অগ্রসর হইয়া নব সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, বহু পাঠান সৈন্য ঐ রাস্তার অদূরে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহাবাজ খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়া, নিজ সাহায্যার্থ যাহাতে আরও সৈন্য প্রেরিত হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন জন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

যে পথ অবলম্বনে মোগল সৈন্য অগ্রসর হইবার কথা, সেই পথে কতকগুলি লোক আগমন করিতেছে দেখিয়া, তারস্থন বিবেচনা করিলেন, সাহাবাজ তাঁহারই সাহায্যার্থে ঐ সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সাহ্লাদে তাহাদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া আনয়ন জন্য যেমন সম্মুখীন হইলেন, অমনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহারা তাঁহার স্বপক্ষীয় দলবল নয়, বিপক্ষের লোকদল।

এই সময়ে তদধীনস্থ সৈন্যেরা তারস্থনকে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেই বীরবর শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সুযোগ দিতে কোনমতেই বাধ্য হইলেন না। প্রায় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, মাত্র পঞ্চদশজন বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না।

এদিকে পাঠানেরা মোগলপক্ষীয় লোক সন্দর্শনে ব্যাঘ্র-বিক্রমে তাহাদের উপর নিপতিত হইল। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোগলদের

স্কন্ধ দেহবিচ্যুত হইয়া ধরায় নিপতিত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যথাসাধ্য শত্রু নিপাত করিতে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে নাই। এই খণ্ড যুদ্ধে সমুদয় সহযাত্রিসহ তারসুনের দুই জন নিকট আত্মীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করে ; বীরবর তারসুন ধৃত হন।

মাসুম প্রথমতঃ তারসুন খাঁকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু পরে তাঁহাকে স্বদলভুক্ত হইবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করেন। যতবার তাঁহার নিকট মোগলদল পরিত্যাগের কথা উত্থাপন করা হয়, ততবারই তিনি উহা ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। তৎপরে পাঠানেরা উত্যক্ত হইয়া সেই যশোধন নবীন বীর তারসুনের প্রাণদণ্ড বিধান করে। পরে পাপিষ্ঠদিগকে এজন্য বিশেষ ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ ব্রহ্মপুত্রনদের শাখা পনার নদতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই বৎসর বর্ষার প্রকোপ তত অধিক হইয়াছিল না, কাজেই মোগল সৈন্যেরা নদীর ধারে অবস্থানের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঠানেরা তখন এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মপুত্রনদ হইতে পঞ্চদশটী খাল খনন করাইয়া মোগল ছাউনীর দিকে বর্ষার জলস্রোত চলাইয়া দিল। প্রবল জলপ্রপাতে তাঁহাদের তাঁবু জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। রসদ, বারুদ, ও অস্ত্রাদি দূরে থাকুক, মনুষ্যের জীবন বাঁচান দায় হইয়া পড়িল। এই সুযোগে বিপক্ষগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সাহাবাজ আর আত্মরক্ষার উপায় পাইতেছেন না। দৈব ঘটনায় মোগলপক্ষীয় একজন সৈনিকের গোলার আঘাতে বিপক্ষদলের সেনাপতি পঞ্চত্ব লাভ করেন। পাঠান সৈনিকগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া এইরূপে প্রস্থান না করিত, তবে

মোগল সেনাগণের একটী প্রাণীও জীবিত থাকিত কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধে মোগলপক্ষের কম ক্ষতি হয় নাই। যদিও ঢাকার থানাদার সায়দ মহম্মদের দল অমিতবিক্রমে বিপক্ষের সহিত রণ করিয়া কোনি-রূপেও পরাস্ত হইয়াছিল না; তথাপি সায়দ মহম্মদ বিপক্ষের হস্তে বন্দী হওয়ায় তাহাদের সে গৌরব রহিল না। * এদিকে জল কমিতে থাকিল, ঢাকা হইতে কতকগুলি রণতরি আসিয়াও পৌছিল, মোগলেরা এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন।

এদিকে ঈশা খাঁ একবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই। এবার বন্দী থানাদার সায়েদ মহম্মদ দ্বারা পুনরায় সন্ধির কথা চালাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন। এই সন্ধিতে এই সকল সর্ত্ত থাকে যে, মাসুম কাবুলী বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় গমন করিবেন। সোনারগাঁও বন্দরে বাদসাহপক্ষীয় একজন থানাদার অবস্থান করিবে। ঈশা নিয়মিতভাবে উপযুক্ত কর প্রদান করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই উপলক্ষে ঈশা মোগলপক্ষীয় আমীরগণকে বহু উপঢৌকন প্রদান করায় তাহাদের অধিকাংশ সোনারগাঁও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

---

* This compelled them to take flight and many of these men were drowned. They were defeated on all sides except in the battery of Saiyad Hussain Thanadar of Dacca, who was taken prisoner.

Elliot's History of India,
Vol. VI. Pages 75, 76.
Akbarnama, Text Vol. III. Page 437.

যাঁহারা মনে করেন, নবাব ইসলাম খাঁর পূর্ব্বে ঢাকার নামকরণ হয় নাই, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, সাহাবাজ খাঁর শাসন সময়ে ঢাকার অস্তিত্ব ও নাম বর্ত্তমান ছিল, এবং তথায় একজন থানাদার অবস্থান করিতেন।

এই সন্ধির প্রতি কিন্তু সাহাবাজ খাঁ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ঈশার আচরণ পর্য্যবেক্ষণ জন্য আরও কিছুকাল তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। যাহা ভাবা, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। এক বৎসর অতীত হইল, ঈশা সর্ত্তমত কোন কথাও প্রতিপালন করিলেন না, কাজেই পুনরায় যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল।

এদিকে মোগলপক্ষীয় সেনাপতিগণের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহাবাজের নিয়ত যুদ্ধের প্রতি তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। কোনমতে কাহারও কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে, তাহা মার্জ্জনা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পাঠানেরা একেবারে মোগলের পদানত হয়, কিন্তু অন্যান্য আমীরেরা বিবেচনা করিতেন যে, বিপক্ষগণ কোনরূপে বাদ-সাহের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য। বিদ্রোহী বার-ভূঞার দল তখন এমন হীনপ্রভ হয় নাই যে, সাহাবাজের ইঙ্গিতেই তাঁহারা পরিচালিত হইবে। এই সকল কারণে দল মধ্যে মতভেদ হওয়ায়, মহীব আলি খাঁ সর্ব্বপ্রথম সাহাবাজকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। প্রায় সকলেই সেই পথের অনুসরণ করেন, একমাত্র সাকুলী খাঁ সেনাপতির সহিত মিলিত হইয়া পাঠানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তদধীন সৈন্যগণ সাহায্য করে না। এই যুদ্ধে সাকুলী আহত হন ও যুদ্ধস্থল ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করেন।

এই সকল দলবল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর সাহাবাজ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। অধীনস্থ আমীরগণকে তৎসহ যোগ প্রদান জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। অনন্যোপায় হইয়া সাহাবাজ কতকগুলি যুদ্ধোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া

তাণ্ডা অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই যুদ্ধে বাদসাহপক্ষীয় মীর আদনের পুত্রগণ ও অন্যান্য বহু লোক বন্দী হয়। সাহ মহম্মদ গজনবী ও অপর কয়েকজন জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। আট দিন পরে সাহাবাজ কতিপয় সঙ্গিসহ সেরপুর পৌঁছিয়া তথায় বিশ্রাম লাভ করেন। এখনও তাঁহার শত্রুদমনের উপায় চিন্তা নিবারিত হইল না। পুনরায় দলবল যোগাড়ের উপায় দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা আর জুটিয়া উঠিল না। বিদ্রোহিদল দমন করিয়াও হাতে রাখিতে পারিলেন না, এই মনঃক্ষোভে বীর সাহাবাজ খাঁ, বাদসাহসদনে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া বাদসাহ সেই অকৃতকার্য্য সেনাপতিকে ভৎসনা করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন ও পুনরায় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক সাহাবাজ খাঁর ন্যায় যদি অপর আমীরেরা কষ্টসহিষ্ণু হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন, তবে নিশ্চয় সাহাবাজ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন।

সাহাবাজ খাঁর সাহায্যার্থ উজীর খাঁ দিল্লী হইতে প্রেরিত হইয়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। উভয় সেনাপতির পরাক্রমে বিপক্ষগণ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করে। এই সময়ে সাহাবাজ বাদসাহের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া দিল্লী প্রস্থান করেন। তৎপদে উজীর খাঁ নিযুক্ত হন। তিনি কিছুদিন মাত্র এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অম্বরের সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রথম বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদে বৃত হন। পরে তদুপরি বঙ্গদেশ শাসনের ভারও অর্পিত হইয়াছিল। (১)

---

(১) হোসেন কুলী খাঞ্জাহান ও মিরজা কোকা নামক দুইজন শাসনকর্ত্তা

সপ্তম অধ্যায়

ভাতুড়িয়া, তাহেরপুর, সাতোর ও দিনাজপুর

মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে, তদ্দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আকবর বাদসাহের রাজত্ব-কালে, মুনেম খাঁ প্রথম বাঙ্গালার প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন এবং তোডরমল্ল তাঁহার সহকারী ছিলেন। এই সময়ে ভাদুড়িয়া জমিদারগণ বিপুল জমিদারী ভোগ করিতেন; তাঁহাদের আয় প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ছিল। হুমায়ুন বাদসাহের সহিত সের সাহের সঙ্ঘর্ষণের

আকবর শাহের অধীনে বঙ্গদেশ শাসন জন্য আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া রিয়াজ-প্রণেতা তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় উদ্যানের শেষভাগে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মতে রাজা মানসিংহই বাঙ্গালার প্রথম মোগল শাসনকর্ত্তা।

• আফগানগণ বঙ্গদেশ হইতে তাড়িত হইলে, মোগল সেনানায়কগণ তাহাদের জায়গীর দখল করেন এবং রাজকোষে রাজস্ব প্রদান না করিয়াই ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল জায়গীর মোগল সেনানায়কগণ নিজ নিজ অধীনস্থ ব্যক্তি-দিগকে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। মজঃফর এই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, মোগল সেনানায়কগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

মীরজা আজিজ বিদ্রোহিদমনে অসমর্থ হওয়ায় বাদসাহের আদেশে শাহাবাজ খাঁ আজিজের সহিত যোগদান করেন। আজিজের পর সাহাবাজ শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে পাঠানদিগের সহিত সন্ধি করায় বাদসাহ তাহাকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করেন। তৎপরে উজীর খাঁ ও পরে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসন-কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

রিয়াজ-উস্ সালাতিন, ১৫৮।১৫৯ পৃষ্ঠা।

সময়ে এই জমিদারগণ সেরের পক্ষ সমর্থন করেন বলিয়া মুনেম খাঁ তাঁহাদের কতক অংশ কাড়িয়া সাতোরের রাজাকে দান করেন। বৃহৎ পরগণা হাম বাজু ভাঙ্গিয়া, কালীগা ও কুশুন্তী নাম দিয়া, প্রথমটী খাস করিয়া লন, কেবল কুশুন্তী ও প্রতাপ বাজু পরগণা তৎ-কালীন রাজা জগৎনারায়ণের হস্তগত থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাহুড়িয়ার জায়গীরের নজরানা এক টাকা স্থলে হাজার এক টাকা ধার্য্য করেন। তদবধি ভাহুড়িয়ার অবনতি আরম্ভ হয়, তত্রস্থ জমিদারগণের বিষয় সম্পত্তি হ্রাস হইয়া পড়ে ও সাতোরের রাজসংসারের শ্রীবৃদ্ধি সংবর্দ্ধিত হয়।

রাজা জগৎনারায়ণ এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার কামনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ খাঁকে বহুতর উপঢৌকনসহ দিল্লীতে প্রেরণ করেন। রাজা তোডরমল্লের কৈফিয়ত তলব হয়। এদিকে আকবরসাহ চন্দ্রনারায়ণের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তৎসহ আপনার এক তনয়ার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ও ভাহুড়িয়ার জমিদারীর মালগুজারি ছয় সহস্র টাকা কমাইয়া দেন।

জগৎনারায়ণ রায়ের জীবিত সময়ে, বঙ্গদেশ মোগলদিগের করতল-গত হয়। এই সময়েই গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া নগরকে জনহীন করিয়া ফেলে। তোডরমল্ল বাঙ্গালার জরিপ জমাবন্দীও তৎসময়ে সম্পাদন করেন। প্রবাদ ষোড়শ শতাব্দীর এই ভাগেই সর্ব্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন আরম্ভ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কৌলীন্য প্রথার সংস্কার হয়। বলিতে গেলে পাঠানদের হস্ত হইতে বাঙ্গালার শাসনভার উঠিয়া যাওয়ার পরই এই কয়েকটী নূতন কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা কংশনারায়ণ তাহের-

পুরের রাজা ছিলেন ও তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজপতিরূপে বিবেচিত হইতেন। রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎপরে ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাসন্তী দুর্গোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। তদবধি সাতোরের রাজা ও অন্যান্য হিন্দু বড় লোকেরা এই পূজার দুইটি বা কোন একটীর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশে এই উভয় পূজার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রবাদ বহুদিন পরে সাহজান বাদসাহ শারদীয় পূজার ধূমধাম দৃষ্টে মোহিত হইয়া নিজ ব্যয়ে এই মহাপূজা করাইয়া ছিলেন। কংশনারায়ণ, সিন্দুরার জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাতোরের রাজকুমার গদাধর সান্যাল এবং দিনাজপুরের রাজার ভ্রাতা গোপীকান্ত রায় তৎসময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে বড় লোক ছিলেন। বিশেষ কংশনারায়ণ মোগলপাঠান যুদ্ধের সময়ে মোগলপক্ষের ও ভাদুড়িয়ার জমিদার পাঠানপক্ষের সাহায্য করায় জেতা মোগলগণ ভাদুড়িয়ার (১) জমিদারীর কতকাংশ খাস করিয়া কংশনারায়ণকে প্রদান করেন এবং মুনেম খাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর দেশশাসনের ভার পর্য্যন্ত অল্পকালের জন্য তৎকরে ন্যস্ত হয়। তিনি সুবেদারী কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুবেদার স্বরূপ নিযুক্ত হন না। হিন্দুদিগের মধ্যে রাজা মানসিংহই প্রথম সুবেদারী পদ লাভ করিয়া বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন। উড়িষ্যার পাঠানবিদ্রোহ নিবারণ, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ ও কেদার রায় প্রভৃতির

(১) রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চলনবিলের মধ্যবর্ত্তী একটী বৃহৎ জনপদের নাম ভাদুড়ি চক্র বা ভাদুড়িয়া। উহার জমিদার ছিলেন ভাদুড়ি উপাধিধারী কাশ্যপ গোত্রীয় রাজা গণেশ, সেই বংশে জগৎনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

দমন, কোচবিহারের রাজার সহিত সন্ধি সংস্থাপন ও বেণী রায় প্রভৃতি দস্যুগণের দমন কার্য্য তদ্দ্বারাই সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

রাজা মানসিংহ ও কুতল খাঁ

রাজা মানসিংহ রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বরের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জয়পুর এই রাজ্যের রাজধানী। ঐ রাজবংশ আপনাদিগকে ভগবান্ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এ জন্য উহারা কাছোয়া বা কুশাবহ বংশ নামে পরিচিত। আকবর বাদসাহ হিন্দু রাজগণসহ আদান প্রদান করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন, স্বয়ং এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, পরে তৎপুত্র জাহাঙ্গির সাহ সহিত অম্বরের ভগবান্ দাসের কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। ভগবান্ দাস মানসিংহের পিতা ছিলেন। (১) এই সম্বন্ধবন্ধনের জন্য, জয়পুর রাজবংশের সহিত মোগলবাদসাহ বংশের বড়ই প্রণয় সম্মিলন ঘটে। প্রায় অধিকাংশ রাজপুত রাজা এইরূপে বাদশাহ ঘরে কন্যা দান করিয়া তাঁহার

(১) রাজপুতানার ভট্ট ঐতিহাসিকগণ সকলেই মানসিংহকে ভগবান দাসের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে মানসিংহ ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকৃতপক্ষে অপুত্রক ভগবান দাস ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আনুগত্য স্বীকার করেন। কেবল করিলেন না মিবার বা উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপসিংহ। এমন কি মানসিংহ উদয়পুরে উপস্থিত হইলে প্রতাপসিংহ তাঁহাকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যের আয়োজন করেন বটে কিন্তু যখন ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন, তখন প্রতাপ তাঁহার সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সূত্রে মানসিংহ আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করায় তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাদসাহকে সমুদয় বিবরণ অবগত করান। বাদসাহ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে ঘোর অভিযান প্রেরন করেন। মানসিংহ স্বয়ং এই অভিনয়ের নেতা হইয়া দাঁড়ান। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক প্রতাপ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিধর্ম্মীর সহিত কন্যা বিবাহ দেওয়া ত দূরের কথা, করদান বা আনুগত্য স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত সম্মত হন নাই। তবে স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের চেষ্টায় রাণার যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালার বিদ্রোহিগণ প্রবল হইয়া যখন সাহাবাজ খাঁর অবাধ্য হইয়া পড়ে, বহু চেষ্টা দ্বারাও মোগলরাজ প্রতিনিধি সে সময়ে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন দূরদর্শী বাদশাহ কূটযোদ্ধা ও যুদ্ধবিশারদ রাজা মানসিংহকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন জন্য, প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদ প্রদান করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। মানসিংহের প্রথম কার্য্য উড়িষ্যাবিজয় (১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে) (১) অতএব উড়িষ্যার পূর্ব্বতন

(১) এই দেশ প্রায় সকল সময়ে স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। এই রাজগণের মধ্যে একজনের নাম প্রতাপ রায়। তাঁহার পুত্র নরসিংহ কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে তিনি

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনায় উহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

খান খানান মনিম খাঁ এবং খাঞ্জুহানের শাসনকর্তৃত্ব সময়ে উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মোগল শাসনাধীনের অন্তর্গত হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী আমীরগণের অক্ষমতা প্রযুক্ত উহা পুনরায় কতুল লোহিনীর হস্তগত হইয়াছিল।

বেহারের বিদ্রোহিগণকে অধীনে আনয়ন করিয়া পরে উড়িষ্যা-বিজয় জন্য মানসিংহ মনোনিবেশ করেন। ঝাড়খণ্ডের (বৈদ্যনাথের) পথ অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যা আক্রমণের সংকল্প হয়। ভাগলপুর হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সায়দ খাঁর নিকট এজন্য সাহায্য চাহিয়া

প্রাণত্যাগ করিলে, ঐ পুত্র রাজা হন। তেলিঙ্গা গ্রামবাসী মুকুন্দ দেব নামে পূর্ব্ব-রাজার এক ভৃত্য এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া, ছলনাক্রমে নরসিংহের প্রাণ সংহার করিয়া উড়িষ্যার রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বরাজার বহু সঞ্চিত অর্থ দ্বারা নানাবিধ সৎকার্য্য করিলেও প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

সেকেন্দর উজবেগ বাদসাহের চাকরী পরিত্যাগ করিলে পর সুলেমানকরাণীর সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। সুলেমান তৎপুত্র বায়জিদকে সঙ্গে দিয়া সেকেন্দরকে উড়িষ্যাবিজয় জন্য প্রেরণ করেন। তৎসহ তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়ও প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিলে মুকুন্দ ও তাঁহার সেনাপতি ঈষৎ রায় পরাস্ত ও হত হন। কালাপাহাড় জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া ঐ দেব প্রতিমা লইয়া চিলকা হ্রদের তীরে অগ্নিদাহ করিতে অনুমতি দেন। পাণ্ডারা বহু অর্থ প্রদান করিতে চাহিলেও প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করা হয় না। পরে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথের বিগ্রহ লইয়া একজন পাণ্ডা চিলকা হ্রদে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক উহা রক্ষা করেন। কালাপাহাড় হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে মুসলমান হন। এজন্য হিন্দুদের প্রতি তাহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তদবধি উড়িষ্যা পাঠানদের হস্তগত হয়।

পাঠান, কিন্তু বর্ষার প্রবল প্রকোপ বশতঃ বঙ্গদেশ হইতে এই সময়ে তাঁহার নিকট সৈন্য প্রেরিত হইতে পারে না। পর বৎসর রাজা বৰ্দ্ধমানের পথে যাত্রা করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার সাহায্য জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহাদের সহিত তাঁহার সম্মিলন ঘটে। বঙ্গদেশ হইতে একমাত্র বেহার খাঁন কতক সৈন্য সহ আগমন করেন। অবশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষায় রাজা জাহানাবাদে অবস্থান করেন। এ দিকে কতুল খাঁ নিজ পতাকা উড্ডীন করিয়া বাদশাহী সৈন্যের ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ধরমপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সাহসের সহিত যুদ্ধোদ্যোগ করিতে থাকেন।

বাহাদুরের সহিত বহু সৈন্য কতুল খাঁ পূৰ্ব্বেই রায়পুর নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ, আপন পুত্র কুমার জগৎসিংহের অধীনে অনেক সৈন্য তথায় পাঠাইয়া দেন। বিদ্রোহিগণ তখন সন্ধির প্রার্থনা করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু উহা ছলনা মাত্র। তাহারা আরও সৈন্য বৃদ্ধির আশায় কেবল কালকর্ত্তন জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

ক্রমে যখন বাহাদুরের দল বৃদ্ধি পাইল, তখন তিনি জগৎসিংহের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। রাজকুমারের এই বিপদ্ সমাচার, পূর্ব্বেই জমিদার হামীর (হাম্বির) তাঁহাকে পরিজ্ঞাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। পরে যখন এই আকস্মিক আক্রমণে বিপক্ষগণ কুমারকে ধৃত করিবার উপক্রম করে, তখন হামীরই তাঁহাকে কোনরূপে উদ্ধার করিয়া নিজ জমিদারী বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।

কুমারের এই বিপদ্ সমাচার পাইয়া রাজা মানসিংহ এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। তখন অধিকাংশ সেনানায়কগণের মত হয় যে

অন্ততঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজা যুদ্ধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। এই সময়ে হঠাৎ সংবাদ আসিয়া পৌছে যে পাঠান দলাধিপতি কতুল খাঁ অষ্ট দিবস জ্বর ভোগের পর ভবলীলা সংবরণ করিয়া বীরভোগ্য অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।*

এরূপ অবস্থায় বিপন্ন হইয়া পাঠানেরা কতুল খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বয়াজিদকে দলপতি নির্দ্দেশ করিয়া লন। পরে সন্ধির জন্য মোগল সেনাপতির নিকট লোক প্রেরিত হয়। যদিও পূর্ব্বে অন্যান্য সেনানায়কগণের বিরুদ্ধে অভিমত করিয়া মানাসিংহ যুদ্ধ জন্য মনন করিয়াছিলেন, তথাপি এখন এই সুযোগে তিনিও সন্ধির পক্ষপাতী হইলেন। বয়াজিদ ১৫০ হস্তী ও অন্যান্য বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন সহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, সন্ধি সমাপ্ত হয়, কিন্তু পাঠানেরা উহাতে কৃত্রিম স্বাক্ষর করিয়াছিল।

এই সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, বাদসাহের নামে মুদ্রা-প্রচার, খোৎবা-পাঠ ও রাজ-কার্য্যাদি সম্পন্ন হইবে। প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র জগন্নাথ ও তদধীনস্থ স্থানসমূহ বাদসাহের খাস সম্পত্তি হইবে। রাজভক্ত জমিদারগণের উপর পাঠানেরা কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না।

* পাঠকগণ, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস গ্রন্থে আপনারা যে কতুল খাঁকে একটি নারীর দ্বারা হত হইতে দেখিয়াছেন, এই পাঠান সর্দ্দার কতুল সেই ব্যক্তি নয়। কতুল সুরাপান করিতেন কি না, এবং পরনারীর প্রতি অত্যাচার করিতেন কি না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎকল্পিতা বিমলাই অবগত ছিলেন। ইতিহাসে তদনুকূলে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঔপন্যাসিকের উপাখ্যানে ও কবির কাব্যে প্রায়ই কল্পনাবলে ইতিহাসের যে মর্য্যাদাহানি ঘটিয়া থাকে, এই স্থানে ও তাহাই হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, পাঠানেরা কিছু সময় লাভ করিবার জন্যই এই সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। (১)

বহুদিন অতীত হইলেও, পাঠানেরা সন্ধির সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল না দেখিয়া রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। এবার পাঠানের পক্ষে কতুলের পুত্র নসীর খাঁ ও জামাল খাঁর অধীনে ১৭০০০ হাজার অশ্বারোহী, ১৩০টী হস্তী ও বহু পদাতিক সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। ভয়ানক যুদ্ধের পর পাঠানেরা আর তিষ্ঠিতে পারে নাই। বহু মোগল সেনা নিপাত করিয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হয়। পাঠানদের সহিত পূর্ব্বে সন্ধি করায় মানসিংহ অনেক বিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছিলেন। এখন উড়িষ্যা হইতে পাঠানদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেন। অতঃপর বিদ্রোহিগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া ঈশা খাঁ-মসনদ ই আলী ও মাসুম কাবুলীর সহিত যোগ প্রদান করে।

---

(১) কতুল খাঁর উকীল ঈশা খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কিন্তু এই সন্ধি প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বসন্ত রায়ের বন্ধু বলিয়া যে ঈশা খাঁর নাম করিয়াছেন, তিনিই এই উকীল ঈশা খাঁ। তিনি সোনারগাঁএর ঈশা খাঁ মসনদ ই আলী নহেন।

নবম অধ্যায়

মানসিংহ ও ঈশা খাঁ

উড়িষ্যার বিদ্রোহী কতুল খাঁর পুত্র নসীর খাঁ এবং বাঙ্গালার মাসুম কাবুলী ও ঈশা খাঁকে পরাস্ত করিয়া রাজা মানসিংহ পুনরায় আজমীর প্রস্থান করেন। তাঁহার নামেই সুবার-কার্য্য চলিতে থাকে, কিন্তু বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রাজার মনে বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালায় আর বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই; কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঠিক হইল না। উড়িষ্যার পাঠান দলপতি কতুলের অনুচর ওসমান খাঁ * ও সুজন প্রভৃতি বিদ্রোহ-পতাকা

---

* ষ্টুয়ার্ট বলেন, উড়িষ্যায় ওসমানের মৃত্যু ঘটে (১৩১ পৃঃ)। কোনও মতে ওসমানের দলস্থ ব্যক্তিরা উড়িষ্যা হইতে তাড়িত হইয়া পরে ঢাকার পূর্ব্বদিকে কতক জমিদারী লাভ করে। বাদসাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়া ইসলাম খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাতে ওসমান হত হন (১০২১ হিজরী ৯ মহরম) (কলিকাতা রিভিউ ৫৩ ভলুমে চাটগাঁর ফিরিঙ্গী শীর্ষক প্রবন্ধ)। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ওসমান, কতুল খাঁর পুত্র, কিন্তু ইলিয়টের কৃত আইন ই আকবরীর অনুবাদে জানা যায় যে, কতুল খাঁর পুত্রের নাম বয়াজিদ ও নসীর খাঁ। কতুল ও ওসমানের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে ওসমানকে কতুলের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া জানা যায়। নিখিল বাবু আরও বলেন যে, ভদ্রকের যুদ্ধে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ পরাজিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া মানসিংহ পুনরায় বাঙ্গালায় আগমন করেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপসিংহ মানসিংহের সহিত এই সময় প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। মানসিংহ ও প্রতাপসিংহ একত্র সমবেত হইয়া ভদ্রকের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন।—Elliot, Vol. VI.

উড্ডীন করিলেন। মানসিংহের নিকট এই সমাচার পৌছিলে তিনি প্রতাপসিংহ নামক একজন রাজপুত সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালায় উপনীত হন। ভদ্রকের নিকট মোগল পাঠানে এক যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না।

ওসমান দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করায়, মোগল থানাদার বাজ বাহাদুর তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু কোনরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মানসিংহ ইহা শুনিতে পাইয়া, সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বাজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হন। পুনরায় মোগলের সহিত ওসমানের যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের অঙ্কশায়িনী হন. পাঠানের অনেক যুদ্ধোপকরণ মোগলপক্ষের হস্তগত হয়। মানসিংহ ঐ স্থানের ভার থানাদারের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন।

অতঃপর ঈশা খাঁকে দমন করাই মানসিংহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। কারণ যতগুলি বিদ্রোহী পরাস্ত হয়, তাহাদের অধিকাংশ এই সময়ে ঈশা খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিয়া তুলে। মানসিংহ এবার কাল বিলম্ব না করিয়া খিজিরপুরে উপনীত হইয়া ঈশা খাঁর রাজধানী অবরোধ করেন।

দেশীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে মানসিংহের এক জামাতা হত হইলে, তিনি ঈশা খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। বীরেন্দ্র ঈশা অকুতোভয়ে মানসিংহের সম্মুখীন হন। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের বীরপুরুষগণ এই দ্বৈরথযুদ্ধের ভাবী ফলাফল দর্শন জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তরবারি চালনায় উভয়েই সিদ্ধহস্ত। উভয়ের অসি সংযোগে মল্লভূমি আলোড়িত হইয়া উঠিল,—অসিসংঘর্ষজনিত

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষকারিগণের নয়নে তড়িৎ সদৃশ চমক প্রদান করিতে লাগিল। একে অন্যকে আক্রমণের প্রাক্কালে এই বুঝি আক্রান্ত হত হইল এই ভাবনায় তদ্দলস্থ জনগণ বিষাদিত ও প্রতিপক্ষীয়গণ আশা-সঞ্চারে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল যুদ্ধ হইবার পরে মানসিংহের তরবারি ভঙ্গ হইয়া যায়; তিনি যেই রিক্তহস্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ বীরবর ঈশা, স্বহস্তের অসি মানসিংহের করে সমর্পণ করিয়া, যুদ্ধ-সজ্জাবলি ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরিবর্ত্তে শত্রুর নিকট এইরূপ অযাচিত প্রাণদান পাইয়া, মানসিংহ ঈশা খাঁকে আলিঙ্গন প্রদান ও শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ঈশা মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া, চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মানসিংহ তাঁহাকে সোনার-গাঁর সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। অতঃপর যতদিন মসনদ ই আলী জীবিত ছিলেন, ততকাল আর কখনও বাদসাহের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১) তাঁহার উত্তরাধিকারী বিদ্রোহী হন। এদিকে শ্রীপুরের কেদার রায়ও বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। মানসিংহ এই দেশগুলি সর্ব্বতো-ভাবে অধিকার করিবার সঙ্কল্প করায়, দেশী প্রজারা সকলেই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।

(১) ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর, মগ, ত্রিপুর ও শ্রীপুরের রাজগণ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন। খাঁ ঈশাঁর হিন্দুপত্নী সোণামণি বিশেষ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিয়া বীর-বনিতা ও বীরতনয়া নামের যথার্থ পরিচয় প্রদান করেন। ঈশা খাঁর অন্য স্ত্রীর নাম ফতেমাখাতুন, ইব্রাহীম-মালীক উল-উলমার কন্যা ও হোসেনসাহের পৌত্রী।

বিদ্রোহিদল মোগল সেনার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নৌ-পোত হইতে বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মানসিংহ মনোনীত একদল সৈন্যকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, পরপারে যেন তাহারা সুবিধামত উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপক্ষের রণতরী হইতে প্রবলবেগে গোলা-বর্ষণ হইতে থাকায়, তাহারা হটিয়া যায়। এই সময় মানসিংহ রণস্থলে উপনীত হইয়া অসীম সাহসের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী অতিক্রম করায়, বিদ্রোহীরা ভীত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু এই যুদ্ধে মোগল-পক্ষের বহু সৈন্য নষ্ট হয়। রাজসেনা, টীরা ও সাতুরিয়া পর্য্যন্ত পাঠানদের অনুসরণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। ভাওয়ালের বিদ্রোহী জমিদার গাজী বা গজনবী অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা ক্রমাগত চলিয়া বিক্রমপুর (শ্রীপুর) অধিকার করিলেন ও সমস্ত দেশে বিশ্বস্ত সেনা সংস্থাপন করিলেন। আফগানেরা সোনারগাঁয় আশ্রয় স্থাপন করে। রাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ১৬০১।১৬০২ খৃঃ অব্দে ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন।

এই বৎসর কুমার সেলিম বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যলাভের জন্য উৎসুক হন। বাদসাহ যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তৎসময়ে সেলিম সৈন্য সামন্ত লইয়া আগ্রায় গমন করেন। কিন্তু তত্রস্থ দুর্গরক্ষক ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় না। তৎপরে এলাহাবাদ গমন করিয়া, উহা হস্তগত করিয়া, অযোধ্যা ও বেহার অধিকার করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানসিংহ এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব করিতেছেন, তিনি তাঁহার সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না।

এই সমাচার পাইয়া, বাদসাহ আগ্রায় উপস্থিত হন। তথা হইতে

সেলিমকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "অবাধ্যতা পরিত্যাগ করিয়া যদি তুমি পুনরায় আমার সহিত সম্মিলিত হও; তবে তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ আছে, তাহা চিরদিন সমান থাকিবে।" সেলিম পত্র প্রাপ্ত হইয়া মুখে বাধ্যভাব প্রদান করিলেন। ইটোয়া যাইয়া পিতার বল পরীক্ষা করিবেন, কার্য্যতঃ ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় জানাইলেন, হয় তুমি অল্প অনুচর লইয়া আগ্রায় আগমন কর, অন্যথা এলাহাবাদে ফিরিয়া যাও। কুমার এলাহাবাদেই প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা তাঁহার জন্য জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, তিনি পিতার আদেশ ও উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু ঐ দেশের বিদ্রোহীরা, বাদসাহ ও তৎপুত্রের অসম্মিলনের কথা অবগত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল।

চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল। আমরা অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য বিদ্রোহিগণের বিবরণ উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দশম অধ্যায়

চাঁদ রায় ও কেদার রায়

মিঃ ফারনেণ্ডো, আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর) ও চণ্ডীখান (যশোহর) এই তিনটি রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ যে মোগলদের পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিতেন। বিশেষত

চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত মোগলদিগের আধিপত্য সময়ে, যাঁহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? ইউরোপীয় ভ্রমণকারী "রালফ ফিচ্" ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীপুর, সোনারগাঁ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, * তাহাতেও জানা যায় যে ঐ দেশের রাজগণ জালালউদ্দীন

* "From Bacola I went to Sreepore which standeth upon the river of Ganges. The King is called Chondery. They are all hereabout rebels against the King Zelabdin Echler. For here are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them. Great store of cotton cloth is made here.

Sennergan is a town six leagues from Sreepore, where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India. The chief king of all these countries is called Isa Khan and he is chief of all the other kings; and is a great friend of all Christians. The houses here, as they are in the most part of India, are very little and covered with straw and have a few mats round about the walls and the doors to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh or kill no beast. They live upon rice, milk and fruits. They go with a little cloth before them and all the rest of their body is naked. Great store of cotton cloth goes from hence and much rice wherewith they serve all India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra and many other island places.

I went from Sreepore the eight and twentieth of November, 1586 for Pegu in a small ship or foist of one Albert Caranallo, and so passing down Ganges and passing by the island of Sundip, Porto Grande or the country of Tipperah, the kingdom of Recon and Mogen, bearing them on one left side with a fair wind at north-west; our course was south and by east which brought us to the Barre of Negrais to Pegu. If any contrary wind had come, we had thrown many of our

আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তৎসময়ে ঐ সকল প্রদেশ কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহারও আভাস উহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কর্ণাট প্রদেশ হইতে আগত হইয়া মহাত্মা নিমুরায় আকবর বাদসাহের রাজত্বের প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরান্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। খ্যাতনামা চাঁদরায় ও কেদার রায় ঐ রায়ের বংশে উদ্ভূত হন। এই "রায়" উপাধিধারী রাজগণ ঘৃতকৌশিক গোত্র ও "দে" বংশীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। †

বৈদ্যবংশীয় সেনরাজগণের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ এই নিমুরায় বিক্রমপুর আগমন করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন, পরে সেনরাজগণের পতনের পরে তাহাদের রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুর আত্মসাৎ করেন। †

things overboard: for we were so pestered with people and goods that there were scanty place to lie in. From Bengal to Pegu is ninety leagues. We entered the Barre of Negrais, which is a brave Barre and hath four fathoms water where it hath left Three days after we came to Cosmir which is a very pretty town and standeth very pleasantly and very well furnished with all things. Here are very great figs, oranges, cocoes and other fruits. The land is very high that we fall withal; but after we entered the Barre, it is very low and full of rivers, for they all go to and fro in boats which they call Paroes and keep their houses with wife and children in them."

Purchas his Pilgrimage, part II., Pages 1736—37.

† "The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Ara Phulbaria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family." (James Wise—on the Barah Bhuyas, Asiatic Society's Journal, 1874).

ফুলবাড়িয়া ও শ্রীপুর গ্রামে রায়বংশের বহুবিধ কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিত। পরে উত্তাল-তরঙ্গময়ী কীর্ত্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একমাত্র কীর্ত্তিনাশার নামের সহিত উহার যে অর্থ জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই রায়রাজগণের কীর্ত্তির কতকটা আভাস ক্ষণস্থায়ী তড়িৎবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। আমরা চাঁদ ও কেদার রায়ের সম্বন্ধে যতদূর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উল্লেখ করিয়া পরে তাঁহাদের কীর্ত্তির ও কার্য্যকলাপের সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছ যে, পাঠান ওসমান খাঁকে পরাস্ত করিয়া রাজা মানসিংহ ক্রমে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য খিজিরপুর ও শ্রীপুরে উপনীত হন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঢাকাতে চলিয়া যান। তৎপূর্ব্ব হইতেই ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ ও কেদার রায়ের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল।

বার-ভূঞাদল ক্রমে এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে কোনমতে আর বাধ্য রাখিতে পারিল না। ঢাকার থানাদার অতি শঙ্কিতভাবে তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। দূর দূরান্তর হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ বাদসাহের করতল হইতে আবার বার-ভূঞার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গ-সন্তানেরা কিছুকাল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে, পরে তাঁহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে

আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশ-দ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণা-জালে পতিত হইয়া তাঁহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। উহার পরিণামফল এই দাঁড়াইল যে, কেহই আর সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়া মস্তক উন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া মোগল রাজের চরণ-চুম্বনে কৃতার্থ হইল। যাঁহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন, তাহাদের মস্তক বিপক্ষের অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ যখন মানবান্তঃকরণে দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বহুদূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন রহিল না। প্রতাপাদিত্যের সহিত তদীয় জামাতা রামচন্দ্র রায়ের এবং চাঁদ রায়ের সহিত ঈশা খাঁর মনোমালিন্যই উহার প্রধান কারণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয়।

একটী সামাজিক বিষয় লইয়া কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত খাঁ উহার প্রতিকূলাচরণ করেন। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পরে তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোককে সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে তাঁহার রাজ-শ্রী বিনষ্ট করিবেন, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন

এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, যাহা দ্বারা পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইলেন।

কোন সময়ে ঈশা খাঁ মসনদ ই আলী, চাঁদরায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানাবিধ আমোদোৎসবে মাতিয়া উঠে। চাঁদ রায় যথাসাধ্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও যত্ন করিলেন, কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে, এই আমোদ আহ্লাদই পরিণামে তাঁহাদের বন্ধুতাবিচ্ছেদের ও চিরমতান্তরের কারণে পরিণত হয়।

চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোণামণি অসামান্যসুন্দরী ও ষোড়শী যুবতী ছিলেন। ভাগ্যদোষে বাল্যকালেই তাঁহার পতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোনক্রমে সেই ললনারত্ন সোণামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতার স্খালনের এক প্রধান অন্তরায় হইয়া মিত্র রাজদ্বয়ের মধ্যে ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে।

ঈশা খাঁ স্বদেশে প্রস্থানানন্তর সোণামণিকে লাভ করিবার আশায় চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হয় তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে, বিশেষতঃ তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে, রায় রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশেষতঃ একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট—স্ত্রী, কন্যা বা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তৎসাময়িক মুসলমান অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে নাই।

দূত প্রমুখাৎ ঈশা খাঁর মনোভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্ত্তাবহকে দূরীকৃত করেন। পরে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশা খাঁর অধিকৃত কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করেন। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাঁহাদের কন্যা ও ভগিনী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। এখন যাহাতে উভয় দিক্ রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদ রায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিতেছিল। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেই মনোগত ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিতে লাগিল। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশা খাঁর সহিত-সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তার পর ঠিক হয় যে, যে কোন উপায়ে হউক, শ্রীমন্ত সোণামণিকে আনিয়া ঈশা খাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে খাঁ সাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণানন্তর শ্রীমন্ত সোণামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য বিক্রমপুর প্রস্থান করেন।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্ত শ্রীপুর আসিয়া প্রকাশ করিল যে, রাজা ও কুমার শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশা খাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিরূপে রাজধানী ও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই

পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাণী রাজারক্ষার জন্য যত্দুর ব্যস্ত না হউন, কন্যা সোণামণির রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া পড়িলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই স্থির হইল যে, সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু রাণীকে কোনরূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে, ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাঁহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোনারগাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, সোণামণির সহিত শ্রীমন্ত খাঁ অচিরে সোনারগাঁ পৌছিয়া, চাঁদ রায়ের সেই অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এরূপে সুসম্পন্ন হইল যে, চাঁদ বা কেদার রায় পূর্ব্বে এ বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন কেদার রায়ের হস্তে যুদ্ধভার সমর্পণ করিয়া চাঁদ রায় মনঃক্ষোভে খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। (১)

(১) ডাক্তার ওয়াইজের মতানুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যার ৫৪০ পৃষ্ঠায় ভারতীতে লিখিয়াছেন—"ঈশা খাঁ একবার শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সেই বালবিধবা সোণামণিকে অপহরণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন।" সিংহ মহাশয় যদি বিক্রমপুরে অনুসন্ধান করিতেন, তবে আর তাঁহাকে সাহেবের কথায় ভুলিতে হইত না।

চাঁদ রায় রাজধানীতে পৌঁছিয়া, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে, এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর, তদীয় ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন,—"বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এই অকারণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। তুমি ভবিষ্যৎ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদ রায় মনে ভাবিলেন যে, সোণামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। ইহা বিবেচনা করিয়া কেদার রায়কে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কেদার রায় খিজিরপুর মথিত ও ঈশার দুর্গগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণীর দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন রাজাদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া, চাঁদরায় অন্তিম-শয্যায় শায়িত হন। মোগলের কর হইতে স্বদেশ উদ্ধারকল্পে যে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এতকাল স্বধর্ম্মিগণের সহিত একপ্রাণে কার্য্য করিয়াছিলেন, পরিণামে সেই একতার মধ্যে নানারূপ অন্তরায় সন্দর্শন এবং ভবিষ্যতের আশা ভরসা তমসাচ্ছন্ন বিবেচনা করিয়া, সেই বীর-পুরুষ, পরিণত বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোটীশ্বরের পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহ জগতের সুখ দুঃখের সহিত

তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট, ধূর্ত্ত, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে কিন্তু তাহার বংশধরেরা পুনরায় বিক্রমপুর ও সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন। *

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার রায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে ১৬০১ খ্রীঃ অব্দে মানসিংহ একবার তাঁহাকে পরাস্ত করেন, কিন্তু কোন অনিষ্ট না করিয়া করদানে মাত্র বাধ্য করেন। এই সময়ের একটি ঘটনা আমরা জয়পুর কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। †

"মানসিংহ জাহাজে করিয়া সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হইতে ষাইট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রে গেলেন। রাজা পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। আর রাজা পরতাপদীপের অধীনে তেরশত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; সেই সমস্ত জয় করিলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎ সিংহ আহত হয়েন। পশ্চাৎ ঐখানে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তাঁহাকে লোকে রাজা বলিত।

---

* শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্যচরিতে লিখিয়াছিলেন যে প্রতাপাদিত্য বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া কেদার রায়কে বশীভূত করেন। এই উভয় কথার যে কোন মূল্য নাই, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই দুইটি কথা কেহ কি কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হইয়াছেন ? না মনগড়া কথা।

† কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের প্রথম যুদ্ধ মেঘনা নদী ও তদুপকূলে সংঘটিত হয়।

তাহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রতাপে তাঁহাকে কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাহার বলে এ ব্যক্তি বলবান্? তাঁহারা উত্তর করিলেন, এ ব্যক্তির প্রতি শিলামাতার বল আছে। অতএব আপনি মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য হোম প্রভৃতি করান, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইবেন। কেদার রাজার সহিত মাতার এই কথা ছিল যে তুমি যখন রাজা হইয়া বলিবে "তুমি যাও" তখন যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী রাজার পূজার আসনে আসিয়া বসিলেন। রাজা আপন কন্যা জানিয়া বলিলেন "তুই যা, আমায় পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, তোমার ও আমার মধ্যে যে কথা ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, এই বলিয়া মাতাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তখন দেবী মানসিংহের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, এখান হইতে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি"। ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়া দিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন। দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কেদার তাহাকে কন্যা দিলেন। উভয়ে সন্ধি হইয়া গেল। তখন মানসিংহ কহিলেন, "তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম।" কেদার রাজা সেলাম করিলেন। মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন "মাতা আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন

মাতা কহিলেন, প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হওয়া চাই, তাহা হইলে তোমার রাজ্য বজায় থাকিবে, আর আমিও থাকিব। যে দিন বলিদান বন্ধ পড়িবে, সে দিন তোমার ও আমার বাক্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন।” তৎপরে মেঘনাদ বাবু বলেন “কেদার রায়=পরতাপদীপ্=প্রতাপাদিত্য, এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।” আমরা তাহার এই কথার অনুমোদন করি না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেন “কেদার রায়কে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বার-ভূঞার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।” আমরা কেদার রায়ের এই বিবরণটি প্রতাপাদিত্যের সহিত সংযোগ করিতে কেন ইচ্ছা করি না তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

শিলাদেবীর অর্চ্চনার জন্য যে ব্রাহ্মণ জয়পুর গমন করেন তাঁহার নাম রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (১)। কালক্রমে সার্ব্বভৌমের বংশধরগণ রাজপুতানার ব্রাহ্মণদের সহিত আদান প্রদান করিয়া, অধুনা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাহাদের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও বংশাবলী লিখিত আছে। মেঘনাদবাবু বহু আয়াসে তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তবে প্রতাপাদিত্য এবং কেদার কায়েত একই ব্যক্তি বলিয়া যে অনুমান করিয়াছেন, দেশের ইতিহাস সম্যক্ প্রকাশ না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ, তিনি যদি জানিতে পারিতেন যে, কেদার রায় নামে এক ব্যক্তি প্রবল

(১) সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমপুরবাসীই হইবেন।

পরাক্রমশালী রাজা প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, তবে কথনও তাহাকে ঐরূপ ভুল সমন্বয় সাধন করিয়া লইতে হইত না। যে সকল ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদসাহকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতাপাদিত্য এবং কেদার রায় এই দুইজনই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে প্রতাপাদিত্যের নাম বঙ্গদেশে যতটা জাগ্রত, কেদার রায়ের নাম ততটা নয়। আমরা তাহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি।

প্রথম কারণ—প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ হইলেও তাহার বংশ বিলুপ্ত হয় নাই। তদীয় খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণ ও অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতি সন্তান অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও সমাজে উচ্চপদস্থ। তাঁহাদের কথিত বিবরণাবলীতে অদ্যাপিও প্রতাপের বীরকাহিনী ব্রতের কথার ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এতভিন্ন প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তির বহু ধ্বংশাবশেষ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ—ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ও রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্য চরিত। অমর কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর পাঠ না করিয়াছেন এমন বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট বাঙ্গালী অতি কমই আছেন। উহার প্রারম্ভেই

> "যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
> মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ,
> নাহি মানে বাদশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
> ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

যাহারা বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়াছেন, তাহারা উক্ত কথা কয়টী

কথনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম উদ্ভবের সহিত ঐ পুস্তক এবং রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত প্রথম মুদ্রিত হয়। ঐ সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের ও মহত্ত্বের বহু বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সকল কারণে প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশে অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ চাঁদ রায় কি কেদার রায় সম্বন্ধে এইরূপ কোন সুযোগই বর্ত্তমান নাই। না আছে তাহাদের বংশের লোক, না আছে তাহাদের রাজধানী বা কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন। অথবা কোন বাঙ্গালী ও কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের গুণগ্রামের পরিচয়সূচক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাগজ কলমে সংযোগ করেন নাই। তবে তাঁহারা কিরূপে জাগ্রত থাকিবেন? যে দুই এক ঘর আজও চাঁদ রায়ের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে কোন ব্যক্তিই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। পরে চাঁদ রায়ের ও কেদার রায়ের রাজধানী ও কীর্ত্তিকলাপ দুরন্ত পদ্মা কর্ত্তৃক ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই শ্লোকপাদের ফল হইতে একেবারে বিচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দুই চারিটি যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা শশাঙ্কের স্থানে খদ্যোৎ মাত্র বলিয়া প্রতীতি হইবার যোগ্য। এই সকল কারণে অনেকেরই বিশ্বাস যে একমাত্র প্রতাপাদিত্যই মোগল-বিদ্রোহী দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইতিহাসের পত্র উদ্ঘাটন করিলে কেহই কেদার রায়কে প্রতাপ অপেক্ষা নিম্ন স্থানে আসন দিতে ইচ্ছা করিতেন না।

মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যা ভিন্ন আর একজন বাঙ্গালীর কন্যা বিবাহ করেন।* মানসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত কুড়িজন

* রাম রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে, প্রতাপ

স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন "মহারাজকী বেটী রাণী বাঙ্গালী পরভাবতী।" এই কারণে আমরা মানসিংহের দুইটি বাঙ্গালী রাণী ছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন মানসিংহ কোচবিহারের এক রাজকন্যারও পাণিগ্রহণ করেন।

আর একটি প্রবাদ বাক্যানুসারেও প্রমাণিত হয় যে, শিলাময়ী দেবী চাঁদ রায়েরই গৃহদেবী ছিলেন। কথাটি এই।

রাজা মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতিকে জয় করিয়া গৃহদেবী শিলাময়ী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। পরে তত্রত্য কর্ম্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্ত্তির অনুরূপ অন্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য নিয়োগ করিয়া, তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্য সর্ব্বদা রক্ষি-গণকে তত্ত্বতালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্ম্মকারেরা নিয়ত শিলা-ময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। যে দিবস কার্য্য শেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া বলে "মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, নির্ম্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্ম্মিত পিতলের মূর্ত্তিটীকে দেবীর আসনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্ত্তিকে মাজিয়া ঘসিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্ত্তি একত্র হইলে কোনটি বা পূর্ব্বনির্ম্মিত এবং কোনটি বা নবনির্ম্মিত কেহই তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিলেন না। পরে কারি-করেরা এই রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ তাহা-দিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া, চাঁদ রায়ের দেবীকে জয়পুর লইয়া যান এবং অপর মূর্ত্তিটী ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই

উপঢৌকনস্বরূপ একটি রূপবতী কন্যারত্নকে মানসিংহের করে সম্প্রদান করেন। সম্ভবতঃ এই বাঙ্গালী কন্যা সেইটিই হইবে।

ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্ত্তিই অষ্টধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল কিংবদন্তীর সহিত জয়পুরের প্রাপ্ত ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করিলে, শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের না হইয়া কেদার রায়ের হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

একাদশ অধ্যায়

সন্দীপে ভীষণ যুদ্ধ

(পর্টুগীজ, মগ, কেদার রায় ও মোগল-সৈন্য)

মগ ও পর্টুগীজদিগের সহিত কেদার রায়ের বহুবার যুদ্ধ-সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা পর্টুগীজদের কিঞ্চিৎ বিবরণ, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী—চিকিৎসক "ফ্রাঙ্কয়েজ্ বর্ণীয়া"র লিখিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত, চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"বহুদিন হইতে রুকন (আরাকান) দেশে পর্টুগীজেরা বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের সহিত বহু ক্রীতদাস এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গী গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা এবং পূর্ব্বোপদ্বীপের পর্টুগীজ উপনিবেশ হইতে আসিয়া বাস করিত। উহাদের অধিকাংশই নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত ও পাপানুষ্ঠানপরায়ণ হওয়ায় ঐ সকল দেশ হইতে

বিতাড়িত হয়। ইহারা পরস্পর হিংসাপরায়ণ ছিল। বলিতে গেলে যাহারা দস্যু ও বদমায়েস তাহারাই এই স্থানে আসিয়া দলবদ্ধ হইত। ইহারা খ্রীষ্টীয়ান নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ঘৃণিত জীবন বহন করিত। এমন কি এই দলস্থ কেহ যদি কাহারও প্রাণসংহার করিত, তথাপি শাস্তিপ্রাপ্ত হইত না।

আরাকানের রাজা মোগলদের ভয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় স্বীয় রাজ্যের সীমান্তে চাটিগাঁ বন্দরে এই দস্যুদলকে বাস করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি উহাদের প্রধান সম্বল ছিল। নৌ-চালনায় দক্ষতা থাকায়, ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া উহারা বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং কখনও কখনও মেঘনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে প্রবেশ করিয়া তত্তীরবর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিয়া দিত। স্ত্রীপুরুষদিগকে ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, অবশিষ্টদিগকে দাসভাবে রাখিয়া দিত। ইহাদের অত্যাচারে বহু জনপদ ভস্মসাৎ ও লোকহীন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই সমুদয় অত্যাচারী দস্যুদল এক বৎসরে এতদ্দেশীয় যতগুলি লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত, ভারতের সমুদয় মিশনারীরা নানারূপ চেষ্টা করিয়াও ততদূর কৃতকার্য্য হইতেন না। কালে এই সকল জলদস্যু-গণ এমন পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে, আরাকানরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য গোয়ার শাসনকর্ত্তাকে আহ্বান করে। কিন্তু পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা এই সকল হিংস্র ও পাপীগণের প্রার্থনা ঘৃণা-সহকারে প্রত্যাহার করেন।

এই সকল পর্টুগীজ দস্যুদলের কথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, তিনি আগ্রার ক্যাথলিক চার্চ্চ ও হুগলীর চার্চ্চ ধ্বংস করিয়া খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য বাঙ্গালার নবাবের উপর বিশেষ অনুজ্ঞা প্রচার করেন। এই জলদস্যুদের সহিত যোগদান

করিয়া আরাকানের মঘেরাও বঙ্গদেশটাকে ছারখার করিয়া তুলে। বড় বড় নদীর মোহানাই উহাঁদের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল। পরে কিন্তু আরাকানের রাজাকেও এই পর্টুগীজ দস্যুগণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল।" (১)

পর্টুগীজেরা এই সময়ে সনদ্বীপে আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া লয়। কিন্তু কেদার রায়ের পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরে কেদার রায়কেই সনদ্বীপের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। চাঁদ রায় বিবেচনা করিলেন যে, পর্টুগীজদিগকে বাধ্য রাখিতে না পারিলে, এই আধিপত্য স্থায়ী হইবে না, এজন্য পর্টুগীজ কার্ভালোর প্রতি উহার শাসনভার সমর্পণ করিলেন।

"সনদ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু মোগলেরা তাহা অধিকার করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করে। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি এই গুরুতর কার্য্যের জন্য কার্ভালোকে নিযুক্ত করিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের হস্ত হইতে সনদ্বীপ অধিকার করিয়া লন। তিনি সনদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোগলেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সনদ্বীপে কার্ভালোকে অবরোধ করিয়া ফেলে। কার্ভালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, চট্টগ্রামের পর্টুগীজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মাটুস চারি শত সেনা লইয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হন। মোগলগণও তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করে। ফিরিঙ্গী ও মোগলের জলযুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোগলেরা সাহস-

(১) কলিকাতা রিভিউ, ৫৩ ভলুম, ৩য় প্রবন্ধ, ৬৭ পৃষ্ঠা।

সহকারে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর গোলার নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মোগলেরা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জল হইতে মাটুসের ও স্থল হইতে কার্ভালোর আক্রমণে তাহারা সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সনদ্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের হস্তে পতিত হইল। কেদার রায় তাঁহাদের হস্তেই সনদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে সনদ্বীপ আবার কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইল। কার্ভালো তাঁহার অধীন শাসনকর্ত্তা রহিলেন।

এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের সম্রাট ছিলেন, তিনি সেলিম সা উপাধি গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহারও অধীনে অনেকগুলি পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া আরাকানরাজ তাহাদের দমনের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঙ্গালা আক্রমণেরও ইচ্ছা ছিল। তিনি কার্ভালোর হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে দমন ও সনদ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তিনি দেড়শতখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান-সজ্জিত বৃহৎ রণতরী পর্টুগীজদিগের বিরুদ্ধে সনদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন! কার্ভালো সেই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে, তিনি আপনার একশত খানি কামান ও বন্দুক-সজ্জিত 'কোষ' নৌকা তাঁহার সাহায্যের জন্য শ্রীপুর হইতে সনদ্বীপে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত সেই নৌকাসমূহ পদ্মা ও সাগর কম্পিত করিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্য পাইয়া কার্ভালো বিপুল বিক্রমে সেলিম সা'র রণতরী

সমূহ আক্রমণ করিলেন। বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গীর সহিত মঘদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের ধূমে গগনমণ্ডল আবৃত হইয়া উঠিল। তাহাদের গর্জ্জনে নীল সমুদ্র মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী অদ্ভূত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া গেল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে পতিত হইল। সনদ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত থাকিল।”

“যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সা'র সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল, ব্রিটো সেই সময়ে কৌশলপূর্ব্বক আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্টুগীজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী পাঠাইয়া দিলেন। রণতরীসমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইল। কার্ভালোও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আপনার অধীন পর্টুগীজ সৈন্য ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উদ্যমে সেই বিরাট নৌশ্রেণীর সহিত অগ্নিক্রীড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের রণকৌশল ও অমানুষিক সাহসে মগদিগের রণতরীসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি কামান ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল। অবশিষ্টগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর অদ্ভূত বীরত্বে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধেও কার্ভালো জয়লাভ করেন এবং তাঁহার নাম সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারিত

হইয়া পড়ে। সেলিম সা কাপুরুষতার জন্য আপন সেনাপতিদিগকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছিলেন।”

“কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার রণতরীসমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। তিনি আবার আপনার নৌশ্রেণী গঠনের জন্য সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপুর, বাকলা ও সাগরদ্বীপে তাঁহার রণতরীসমূহের সংস্কার ও নূতন রণতরীসমূহের নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। শ্রীপুরে কার্ভালোর নিকট ৩০ খানি রণতরী অবস্থিত ছিল। কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে আরাকানরাজ তাহা অধিকার করিয়া বসেন। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর এক ভীষণ শত্রু বিজয়ভেরী বাজাইয়া তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হয়। যে সময়ে সনদ্বীপ লইয়া ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া চলিতেছিল, সেই সময়ে, মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য অধিকারের জন্য একশতখানি কোষ নৌকা সহ মন্দারায়কে পাঠাইয়া দেন। মোগলের কামানসজ্জিত কোষ নৌকা পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করিয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হইল ও তোপধ্বনিতে আপনাদের আগমন ঘোষণা করিল। কেদার রায় পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না থাকিলেও মোগল সেনাপতির আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিলেন না।”

“কার্ভালোর প্রতি প্রধানতঃ আতিথ্যের ভার প্রদত্ত হইল। কার্ভালো আপনার সেই ৩০ খানি রণতরী ও আর কয়েকখানি কোষ নৌকা সহ আপনার ফিরিঙ্গী ও শিক্ষিত বাঙ্গালী গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মন্দারায়কে আক্রমণ করিলেন। মোগলের দুর্জ্জয় কামান মেঘ ধ্বনির ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল,

কিন্তু ফিরিঙ্গী বীর কার্ভালোকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহারও কামানসমূহ মোগল কামানের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া অগ্নি উদ্গিরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধে পদ্মার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। মোগলেরা যেমন অত্যদ্ভুত বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালী তদনুরূপই রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। মন্দারায় আপনার অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কার্ভালোর বিক্রমে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে তাঁহার জীবনকে আহুতি দিতে হইল এবং ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর কামানের গোলায় তাঁহার রণপোতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কতকগুলি বা সলিলগর্ভে আশ্রয় লইল, কতকগুলি বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মানসিংহের আর কেদার রায়ের রাজ্য অধিকার করা ঘটিয়া উঠিল না। মোগল সেনাগণ ফেরুপালের ন্যায় বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। এই যুদ্ধে কার্ভালোর বীরত্ব আরও স্ফুটতর হয়। তিনি শ্রীপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য রণতরী সংগ্রহ করেন। পরে মোগলদিগের অধীনে গলিন বা হুগলী বন্দরস্থ দুর্গ অধিকার করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার নামে লোকে এইরূপ ভীত হইয়া উঠিত যে, একজন মগসেনানী স্বপ্নযোগে কার্ভলোকে সন্দর্শন করিয়া তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া নদীর জলে ঝম্প প্রদান করেন। পরে এই কথা আরাকানপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ সেনাপতির প্রাণদণ্ড বিধান করেন। পরে কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রতাপ আরাকান রাজার সন্তুষ্টি সাধন জন্য এই বীরপুরুষকে হত করেন।" (১)

(১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র।

আমরা এই ব্যাপারে দেখিতে পাই, মন্দারায় নামে একজন বীরপুরুষ অসীম সাহস সহকারে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি মানসিংহের অধীনস্থ একজন সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিক্রমপুরের ইতিহাসের লিখনভঙ্গীতে বুঝা যায় যে, মন্দারায় কেদার রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া এই ভীষণ যুদ্ধে যোগ দান করেন (১)। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের লিখনানুসারে এই যুদ্ধে মন্দারায় কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু বিক্রমপুরে তাহার আর একটি রাজধানী ছিল ইহা শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। চাঁদ ও কেদার রায় বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে যে অন্য কোন রাজা ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তৎপর বিক্রমপুরের আধিপত্য নয়পাড়ার চৌধুরীগণের হস্তগত হয়, এই কথা গুপ্ত মহাশয়ও স্বীকার করেন। এইরূপ স্থলে এই সময় মধ্যে মন্দারায় আবার কোন সময়ে তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন বা রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গুপ্ত মহাশয় মন্দারায়ের সহিত সোপাধি মধুমুকুট রায় নামের সমন্বয় করিতে যাইয়া যেন বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাই অনুমিত হয়। আজ কাল এক নামের সহিত অন্য নামের সমন্বয় সাধন করা একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের প্রশস্ত পথ হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে কিন্তু সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য থাকে না। বর্দ্ধমানের মুকুট রায় ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের ফতেজঙ্গপুর পরগণায় কোটালিপাড়াতেও মুকুট রায় নামীয় একজন প্রবল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। বিক্রমপুরের মুকুট রায়ের সহিত

(১) বিক্রমপুরের ইতিহাস। (২) চট্টগ্রামেও এক মুকুটরায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনজন মুকুটের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্দারায়ের সহিত মধুমুকুট রায়ের সামঞ্জস্য জন্য আরও প্রমাণ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ওয়াইজ এ সম্বন্ধে যে নোট উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেও জানা যায় যে মন্দারায় মোগল পক্ষের একজন সেনানায়ক ছিলেন। আমরা ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় পারচেস্ পিল্‌গ্রিম হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, ওয়াইজের উদ্ধৃত অংশে উহাই আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া পাঠ করিলেই উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। (১)

গুপ্ত মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশ

(1) * * * Cadry lord of the place where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Mansinga, Governor under the Mogal who having subjected that tract to his master sent forth this Navic against Cadry Mondary a man famous in these parts being Admiral, where after a bloudie fight Mondary was slain.

(Purchas's Pilgrims. Part. IV, Book V, page 513).

পারচেজ পিলগ্রিম হইতে ওয়াইজের সংগ্রহ।

Finally, Purchas describing Sondip in 1602 gives us some insight into the civil war then waging between different nations at the mouths of the Meghna. When Bengal was conquered by the Mughuls, they took possession of the island, but Cadaray [Kedar Rai of Sripur] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it; but this roused the anger of

এই সময়ে রাজমহল হইতে রাজধানীর কতক কার্য্য ঢাকাতে উঠিয়া যায়।* এজন্য নিকটবর্ত্তী করদ রাজাদের আধিপত্য অনেকটা খর্ব্ব হইবার উপক্রম হওয়ায়, তাঁহারা আবার একত্রিত হইবার চেষ্টা পান। এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া, আরাকানাধিপতি সেলিম সাহ, বিক্রমপুরের শক্তিশালী রাজা কেদার রায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পুনরায় বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। চাঁদ রায় মগরাজের অর্থ সাহায্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর হইতে বিপুলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

এদিকে মোগল শাসনকর্ত্তা সুলতান কুলীখাঁ সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় সময় শত্রু পক্ষের মধ্যে নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্তও করিতেছিলেন। এমন সময়ে পাঠান বংশীয় আহাম্মদ, মগরাজ ও কেদার রায়ের সহিত যোগ প্রদান করিয়া

---

the king of Arrakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, and Cadaray (Kedar Rai), which, they say, was true Lord of it, sent one hundred Cossi (Koshas) from Sripur to help him. The combined fleet were defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Kedar Rai. Cornalias, the leader of the Portuguese took his disabled vessels to Sripur to right them. Then he was attacked by one hundred Koshas under command of "Mondary, a man famous in these parts." The Mughul fleet was defeated and its Admiral Mondary killed.

* বাস্তবিক এই কালে রাজধানী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঢাকাতে আইসে নাই। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর সময়েই রাজধানী ঢাকাতে সংস্থাপিত হয়।

কুলীখাঁকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। কুলীখাঁ এই বিপদের সমাচার মানসিংহের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি ইব্রাহিম আংকার, দলপৎ রায় ও রঘুদাসের অধীনে বহু সৈন্য কুলীখাঁর সাহায্য জন্য প্রেরণ করেন। বহুদর্শী মানসিংহ উভয় রাজার সহিত এক সময়ে যুদ্ধ করা সঙ্গত নয় বিবেচনায়, সর্ব্বপ্রথম আরাকান-রাজ সেলিমসার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। আরাকানরাজ জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ এই উভয় যুদ্ধেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া, মানসিংহ জল-যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিয়া লন।

এই সময়ে, সেলিমসাহার সহিত কেদার রায়ের বিচ্ছেদ সংঘটন হয়। এই মহাসুযোগে মানসিংহ অনায়াসে সেলিমকে পরাস্ত করিলেন। পরে পুনরায় বিক্রমপুরাধিপতিকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজা মানসিংহ সেনাপতি কিলমককে প্রেরণ করিলেন। কিলমক শ্রীপুর অবরুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু কেদার রায়ের কামান গর্জ্জনের নিকট আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। প্রচণ্ড গোলার আঘাতে পীড়িত হইয়া কিলমক হটিয়া খয়িয়ার বিলের মধ্যবর্ত্তী ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করেন। কেদার রায় এই সমাচার পাইয়া চতুর্দ্দিকে রণতরী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য পদাতিক সৈন্যও এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। বাঙ্গালী বীরগণের হুঙ্কার ধ্বনিতে দশদিক পরিপূরিত হইয়া পড়িল। রাজপুত ও মোগলবাহিনী এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মানসিংহ স্বয়ং অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। এই ব্যাপারে খয়িয়ার বিল ও কালী-গঙ্গার শ্যামল অম্বুরাশি রক্তগঙ্গায় পরিণত হইল। বহুদিন যুদ্ধের পর

বিজয়লক্ষ্মী, মোগলরাজের অঙ্কশায়িনী হন। প্রচণ্ড গোলার আঘাতে মহাবীর কেদার রায় নিপতিত হইলেন। সেই শূর সূর্য্য আর উত্থিত হইলেন না। মানসিংহের নিকটে নীত হইবার কিছু পরেই তাঁহার আয়ু নিঃশেষিত হইয়া যায়। *

বহু বৎসরের বিবিধ চেষ্টায়, যে কেদার রায় মোগল বাদসাহের বশবর্ত্তী হন নাই, সনদ্বীপের ভয়ানক যুদ্ধে যাঁহার নিকট মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া সভয়ে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কিলমকের পাঁচশত রণতরীর সৈন্যগণ যাঁহার প্রবলবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বীপপ্রায় ফতেজঙ্গপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, আজ দৈব-ক্রমে সেই মহাসাহসী অমিতপরাক্রম কেদার রায়, বিক্রমপুর কেন সমগ্র বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া, অমরভবনে প্রস্থান করিলেন। যতদিন বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন, চাঁদ ও কেদার রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালীর হৃদয়ের অন্তস্তলে নিবদ্ধ থাকিয়া সেই অতীত কথা অবশ্যই স্মরণ করাইয়া দিবে। ফতেজঙ্গপুরের পূর্ব্বনাম শ্রীনগর। পরে এই যুদ্ধের জয় নিদর্শন স্বরূপ মানসিংহ উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে ফতেজঙ্গপুর এই আখ্যা প্রদান করেন। উহার উপকণ্ঠে যে বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অদ্যাপি নগর নামে

* Raja Mansingh * * * turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the Imperial Commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally over-came the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja.

(Elliot's History of India, Vol. VI. P. 111.)

অভিহিত হইয়া আসিতেছে। নগরের কেবল শ্রীটুকু নাই। উহা ফতেজঙ্গপুরের একাংশ মাত্র। (১)

আমাদিগের বিবেচনায়, বার-ভূঞাদলের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়েরই প্রাপ্য। কারণ ঈশা খাঁ মসনদ ই আলী সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগলপতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। তৎপরে অধিকাংশই তৎপথাবলম্বী হন। হন নাই মাত্র তিনটি মহাপ্রাণ,—কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দ রায়। আকবরনামাতে কেদার ও মুকুন্দের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জানি না, ঐ গ্রন্থে প্রতাপের বিবরণ কেন বিবৃত হয় নাই। জলযুদ্ধে কেদার রায়ের তুল্য বলশালী আর কেহই ছিলেন না। তিনি নিয়ত মগ ও পর্টুগীসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া, বহু রণতরীর সাহায্যে তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই সূত্রে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি স্বাধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, পর-নিপীড়ন বা অন্যায় দৌরাত্ম্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। বার-ভূঞাদল মধ্যে, বীরত্বে ও চরিত্রবলে কেদার সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, ইহা বলা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইবে না।

---

(১) ইলিয়ট্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় কেদাররায় প্রবন্ধে ১৩১৪ সনের ঐতিহাসিক চিত্রে শ্রীনগর বলিয়া যে স্থানের নাম করিয়াছেন তাহা এই নগর ফতেজঙ্গপুর। শ্রীনগর "শ্রী" হীন হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অরণ্যে পরিণত হইয়া ছিল। পরে তথায় কতিপয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান বাস সংস্থাপন করে। ফতেজঙ্গপুরের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পূর্ব্ববঙ্গপ্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের ইতিহাসে ইহাদিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য ও কেদার রায়ের পরিণাম সম্বন্ধে জনপ্রবাদ।

এ পর্য্যন্ত যতদূর লিখিত হইল, উহা আকবরনামা অবলম্বনে বলিতে হইবে। অতঃপর দেশীয় প্রবাদ বাক্যানুসারে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সারাংশমাত্র উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়কুলোদ্ভব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে এক মহাত্মা বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামভদ্রপুর গ্রামে বাস করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। তৎকালে বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মান্য ছিল। সর্ব্ববিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্য ও অর্দ্ধকালী-সন্তানেরা তৎকালে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ভদ্রসন্তান শক্তির উপাসনায় নিরত ও স্থানীয় রাজারাও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। প্রতাপাদিত্য শাক্ত ছিলেন। "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" এই উক্তি যে তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের, ভুলুয়ার ও বিক্রমপুরের অধিপতিরাও সকলেই শাক্ত ছিলেন ও শক্তির উপাসনা করিতেন। শক্তির কৃপাপাত্র হইয়া তাঁহারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, তৎসময়ে শাক্তগণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া, জনগণকে যথার্থ বিমোহিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি ঘটনা এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে ; উহা কেঁদার রায়ের ইতিহাসের সহিত জড়িত।

একদা কেদাররায় গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন,—"গুরুদেব ! অশোকাষ্টমী সমাগত প্রায়, তৎকালে আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রনীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি।" তখন ভট্টাচার্য্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"বৎস ! তোমার বা আমার লাঙ্গল-বন্ধ * যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, লৌহিত্যদেব তোমার রাজধানীর পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করা হইবে। তখন রাজা বলিলেন,—"আমার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া ত মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিত্য বলিতেছেন? তদ্বাক্যশ্রবণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ সম্মুখস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন ও রাজার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি এই লেবুটি ব্রহ্মপুত্রের জলে নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে লৌহিত্যদেব স্বয়ং হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও ততদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রনদ প্রবাহিত হইতেছেন। যাও বৎস ! আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিয়া উহার যথার্থতা প্রত্যক্ষ কর।" রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় লোকসহ তরণী আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। লেবুটি স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল। তৎপশ্চাৎ রাজার নৌকাও চলিতে লাগিল, কিন্তু লাঙ্গল বন্ধ অতিক্রম করিয়া যখন লেবুটি লক্ষানদীতে পতিত হইল, তখন

* ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের অংশবিশেষ। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম লাঙ্গল-বন্ধ হয়। প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিবস এখানে বিস্তর লোক গমন করিয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকেন।

রাজার মনে একটুকু অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল। ক্রমে যেমন লেবুটি ভাসিয়া চলিল রাজাও তৎপশ্চাৎ স্বীয় নৌকা চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ লেবুটি কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত মেঘনার একটা ঘোর্ণার মধ্যে পড়িয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রাজা ও তথায় নঙ্গর করিয়া নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্ব্বে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার তরণী নদীমধ্যে অবস্থান করায়, চতুর্দ্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথায় সমবেত হইতে লাগিল। পরে যখন মধু শুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মপুত্রস্নানের প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহস্র সহস্র মানব দেখিতে পাইল, নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কার-ভূষিত এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হওয়ায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ লেবুটি নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ দেবপুরুষ জলমধ্যে বিলীন হইয়া গেলেন। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না। তাহারা মুক্তকণ্ঠে গোসাঞিজীর গুণগান করিতে করিতে ঐ পূততীর্থজলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মপুত্রস্নানের ফললাভ করিল। পরে রাজা গুরুপদানত হইয়া তৎকথা পরীক্ষা করার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদবধি উহা কমলাপুর তীর্থ নামে অভিহিত হয়।

যে সময় মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার রায় তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাঁহার মঙ্গলসাধন হয়, সেই কার্য্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্য্য-সাধন-মানসে মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া তদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রহ-

বৈগুণ্যবশতঃ কেদার রায়ের এই কার্য্য হিতের পরিবর্ত্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়ায়।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য * বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বৈদিক বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত তাঁহারা কোন পূজাবন্দনাদিই প্রায় অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্নব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজাবন্দনাদি করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অনুষ্ঠানের দিনে, দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে উপস্থিত হওয়ায়, কেদার রায় উহাতে রুষ্ট হন। অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরুদেব পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণে কেদারের উপর গোসাঞি-জীর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার

* এই মহাত্মাকে কেহ কেহ চাঁদ ও কেদার রায়ের পুরোহিত এবং ব্রহ্মানন্দকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উহা অনুমোদন করিতে পারি না। বৈদিক-কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ৺কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার রায়রাজগণের পুরোহিত ছিলেন। বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্বে অশূদ্রযাজী ছিলেন। পরে চাঁদ রায়ের বাধ্য হইয়া তাঁহার পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী হন। এই কারণে তাঁহার জ্ঞাতিগণ কৃষ্ণদেবকে সমাজে স্থান দিতে স্বীকৃত হন না। তিনি তখন জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরান্তর্গত ধূল্লা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। প্রবাদ এই যে একটী লৌহনির্ম্মিত মৎস্যে জীবন সঞ্চার করায়, ইনি কেদার রায়ের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ধূল্লা গ্রাম নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ার পর বিদ্যালঙ্কারবংশীয়গণ ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন।

রায়রাজগণ গুরুদেবকে রামভদ্রপুর ও সাজনপুর এবং পুরোহিত মহাশয়কে ধূল্লা, বেড়াগাঁ ও মানগাঁ প্রভৃতি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

অর্চ্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে তিনি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন নাই। তখন আত্মক্ষমতার পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের রাজার এই পূজার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাঁহার কল্যাণ-কামনায় নানা উপদেশ প্রদান করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলি, তিনি উহা যখন শুনেন নাই, তখনই জানিয়াছি তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈব কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উপেক্ষা করিলেন। অতএব তাঁহার অশুভ অনিবার্য্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া শাণিত খড়্গ তুলিয়া প্রতিমার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিবামাত্র ঐ ক্ষত স্থান হইতে দরবিগলিত ধারায় শোণিত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি অন্তর্হিত হইলেন। এই সমাচার অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না।

এদিকে স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহ, মোগলসৈন্যে পুষ্ট ও রাজপুত বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বঙ্গের বীরপুত্রগণকে আক্রমণ করেন। মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহিগণ মধ্যে ভেদ নীতির সঞ্চার প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। ইতি পূর্ব্বেই তাহার অনেকটা লক্ষণ সঞ্চারিত হইয়াছিল। এখন ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি দেশদ্রোহীগণকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের নিকট দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমুদয় বিশেষভাবে

জ্ঞাত হইলেন। তৎপর সাম্য নীতির ভাণ করিয়া সেই বীরপুরুষগণের নিকট বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন।

যাহারা মানের, প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায়, মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ বহু পূর্ব্বেই ভূঞাদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, মুকুন্দ রায় ব্যতীত আর সকলেই ক্রমে ক্রমে মোগলের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়েন। এই সময়ে মানসিংহ কর্ত্তৃক ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কেদার রায় আক্রান্ত হন।

মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, তৎকর্ত্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না, তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ বন্ধুভাবে গ্রহণ করা যাইবে; অন্যথায় তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুবৎভাব প্রকাশ করেন, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে একটি মাত্র শ্লোক লিখিত ছিল। দূতেরা তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূতেরা প্রভুনির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে, যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা এবং মানসিংহের প্রদত্ত পত্র তাঁহাকে প্রদান করে। কেদার রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখাছিল।

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকুলী
সকলপুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী।

হয়গজনরনৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমিঃ
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি ॥"

ইহা পাঠান্তে, কেদার রায় উহার উত্তর সূচক আর একটি শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত তোমার প্রভুকে যাইয়া বল, আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে তৎপ্রয়োগে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয় তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাবিলুণ্ঠিত হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাঁহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইলে এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদার রায় উত্তর সূচক যে শ্লোকটি মানসিংহ সদনে প্রেরণ করেন তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥" (১)

মানসিংহ কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ ও উল্লিখিত কবিতা পাঠ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। এবার কিন্তু আর মানসিংহকে কেদার রায়ের বিনাশ সাধন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। দূতপ্রেরণের অব্যবহিত

(১) বৈদ্যবংশীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ সেন এই সময়ে কেদার রায়ের পত্রনবীস বা মুন্সীর কার্য্য করিতেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। এই শ্লোকটী পণ্ডিত বিশ্বনাথ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চাঁদরায় কেদাররায় বিক্রমপুর শাসক।
রুয়ী বংশী বিশ্বনাথ তৎপত্রলেখক ॥

৺গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা দেখ।

পরেই কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা জন্য দশমহাবিদ্যার মন্দিরে * উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমন সময় মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রেরিত এক গুপ্তঘাতক সহসা দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্যাননিমগ্ন মহাবীর কেদার রায়কে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। অনেকে অনুমান করেন গৃহশত্রু বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ এই বিষয়ের প্রধান প্রযোজক ছিল। আরও প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার রায়ের ছিন্নমুণ্ড ভূপতিত হইয়াও "ছিন্নমস্তে নমস্তে" এই ইষ্টনাম উচ্চারণ করিয়াছিল।

বিক্রমপুরাধিপের এই আকস্মিক মৃত্যু নিবন্ধন, তৎপক্ষীয় সৈনিকেরা ভীত হইয়া পড়ে, কিন্তু মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরি ও সেনাপতি রঘুনন্দন রায় কোনও ভয় না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত

* এই দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাখড়িয়া নিবাসী বৈদ্যচৌধুরিমহাশয়গণের বাড়ীতে বিদ্যমান আছেন। দেবীর পাদোপরি কেদার রায়ের নাম অঙ্কিত আছে, রায়রাজগণ প্রতিষ্ঠিত দশমহাবিদ্যা মধ্যে উহা অন্যতম। ১২৯১ সনের চৈত্র সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন "চাঁদ রায় তারামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন জন্য চাঁদ রায় এক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মান করেন" (৫৪০ পৃঃ)। আমরা কিন্তু তাঁহার এই কথাটি অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ চাঁদরায় দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহাই দেশপ্রসিদ্ধ। বিশেষ পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকিয়া আজি পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা ইহাই হইল দশমহাবিদ্যা। ভুবনেশ্বরী বিদ্যমান থাকায় তারা মন্দির না হইয়া দশমহাবিদ্যার মন্দিরই সূচিত হইতেছে। দেশীয় প্রবাদ অনুসারে আরও জানা যায় যে, রায়রাজগণ ছিন্নমস্তার উপাসক ছিলেন। কেদার রায়ও মৃত্যুসময়ে ঐ ইষ্টদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করেন।

সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। অন্যান্য সেনানায়কের মধ্যে কালিদাস ঢালী, রামরাজা সরদার, পর্টুগিজ ফ্রান্সিস, সেখ কালু প্রভৃতি উহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু পরিণামে সেখ কালু ও ফ্রান্সিস বিপক্ষের বাধ্য হইয়া পড়ে। মানসিংহ এই সময়ে মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরিকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তাঁহারা এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করা যাইবে এবং বিক্রমপুরের প্রতি কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনের ভার, কেদার রায়ের বিধবা পত্নীর হাতেই ন্যস্ত রাখা যাইতে পারে।

একেই ত রাজা বিহনে সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হইয়াছিল, তাহাতে আবার দুইজন সেনানায়ক তাহাদের দল পরিত্যাগ করায় উহারা অধিকতর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মন্ত্রী রঘুনন্দন ও সেনাপতি রঘুনন্দন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই বিধেয়। রাণীকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করান হইল, তিনিও আর যুদ্ধের পোষকতা করিলেন না। পরে দুই রঘুনন্দন, কালিদাস ও রামরাজা এবং বিশ্বনাথ পত্রনবিশ প্রভৃতি অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ মানসিংহ সমীপে উপস্থিত হইয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত কেদার রায়ের মহিষী জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্য্য তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রাণী লোকান্তরিত হইলে, মোগলরাজপ্রতিনিধির আদেশ মত চাঁদরায়ের রাজ্য বিভক্ত হইয়া, মন্ত্রী বৈদ্য রঘুনন্দন বিক্রমপুরের ও সেনাপতি কায়স্থ রঘুনন্দন ইদিলপুরের (১) এবং

(১) মন্ত্রী রঘুনন্দন, নয়পাড়ার জমিদার বংশের ও সেনাপতি রঘুনন্দন ইদিলপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। বিক্রমপুরের ইতিহাসে সেনাপতি রঘুনন্দনের পুত্র কমলশরণকে কার্ত্তিকপুরের জমিদার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।

সেক কালু কার্ত্তিকপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। কালিদাস ঢালী ও রামরাজা সরদার দেওভোগ ও মূলপাড়া নামক পৃথক্ দুইটি তালুক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। পূণ্যময় স্বদেশ-প্রেমিক মহারাজ এইরূপে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, আপন কীর্ত্তির ও বীরত্বের শত শত নিদর্শন রাখিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পথ প্রদর্শক হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। পরে কিন্তু তাঁহাদের অনুকৃতি বঙ্গে আর প্রদর্শিত হয় নাই। অতঃপর আমরা রায় রাজগণের কতিপয় কীর্ত্তির ও শাসনের বিবরণ উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ চাঁদরায়ই উহার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি যাঁহারা অদ্যাপি বিক্রমপুরে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন; এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চাঁদ রায়ের উর্দ্ধতন পুরুষেরা শ্রীপুরে বাস করিতেন, এবং চাঁদ রায়ও কেদার রায় ক্ষমতাশালী হইয়া শ্রীপুরের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। আমাদের আরও বিশ্বাস তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ১৫০ বৎসর কেন তাহার বহু পূর্ব্বে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য রাজোচিত যাবতীয় বন্দোবস্ত বিদ্যমান ছিল। তৎসন্নিহিত আলাফুলবাড়িয়া স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর পল্লীতে দেবালয় ছিল। এই স্থানগুলি কালীগঙ্গানদীর তটে সংস্থাপিত ছিল বলিয়া জানা যায়। জনশ্রুতিতে

ইতিপূর্ব্বে বারভূঞা প্রবন্ধে কমলশরণকে সেনাপতি বলা হইয়াছিল। বাস্তবিক কমলের পিতা রঘুনন্দনই সেনাপতি ছিলেন। বিক্রমপুরাঞ্চলে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম জমিদার।

প্রকাশ যে ক্রোর টাকা বেদি মূলে প্রথিত করিয়া তদুপরি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এজন্য ঐ শিবলিঙ্গের নাম হয় কোটীশ্বর। পরে স্থানের নামও কোটীশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। এই কোটীশ্বর পল্লীতে রায়-রাজগণ কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণনির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণে উহাকে স্বর্ণময়ী বলিত। এই দেবালয় অথবা দেবমূর্ত্তি মধ্যে ভুবনেশ্বরী ব্যতীত এখন আর কিছুই বিদ্যমান নাই, তবে রায়বংশের যে দুই চারিটি কীর্ত্তির ক্ষীণ জ্যোতি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তদ্বিবরণ যতদূর পারিলাম পাঠকমহোদয়গণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

১ম—কাচকির দরজা। উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীর হাট ও দেওভোগ প্রভৃতি স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটী মেঘনা নদীর তটবর্ত্তী ঘড়িসার, কমলাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই রাস্থা দুইটি বক্রগতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেনরাজগণের সময় যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সর্ব্বাংশ রায়রাজগণের নিজকৃত নয়।

এই রাস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্টগণনা করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছিলেন, মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকিগুঁড়া নামে একপ্রকার

ক্ষুদ্র মৎস্য সর্ব্বদা নদীতে পাওয়া যায়। সেই মৎস্য, পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী হইতে ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাজধানীতে পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদরায় কর্তৃক ঐ রাস্তার পত্তন হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক কাচকি মৎস্য ধৃত হইয়া আনয়ন জন্যই যে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছে। এজন্য রাস্তার নামকরণ হইয়াছিল "কাচকির দরজা।" প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশ বাসীরা যে বর্ত্তমান অধিবাসীগণের অপেক্ষায় অধিক সুখস্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২য়—কেদার বাড়ী। এই স্থানটী দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত। কেদার রায় এই স্থানে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর পত্তন করেন। উহার চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়া কয়েকটী অট্টালিকার ভিত্তি পর্য্যন্তও গ্রথিত হইয়াছিল; কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আজ পর্য্যন্ত ঐ স্থান কেদার বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম পালং ষ্টেশনের অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে কেদার বাড়ীতে কতিপয় ধনী সাহাসন্তান বাস করিতেছেন।

৩—রাজা বাড়ীর মঠ। বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাচুরতলার 'ঠারিণ' বাড়ী; অপরটি মাত্রৈসারের দিগম্বরীর বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে চাচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং মাত্রৈসারে গোসাঞী ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন। কেদার রায় মাতৃ-নিদেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাচুরতলার নিকট অপর একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া

অনায়াসে সর্ব্বদা দেবীর অর্চ্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া রাজাবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মিঃ রালফ ফিচ্ স্বীয় ভ্রমণ-পুস্তকে এই রাজাবাড়ীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে অদ্যাপি এক প্রকাণ্ড মঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা কেদার রায়ের কীর্ত্তির একমাত্র ধ্বংসাবশেষ। (১)

কীর্ত্তিনাশা নদীর তটে এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি আর এখন দেখা যায় না। উত্তালতরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী খরবেগে যেমন একদিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমন ভ্রুকুটী সঞ্চালন করিয়া এক একবার ঐ উচ্চ মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। পরবর্ত্তী কত অত্যুচ্চ সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজী কীর্ত্তিনাশার উদরস্থ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! জানিনা, কেদার রায়ের কি পুণ্যবলে এই মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার যশের একটি ক্ষীণজ্যোতিঃ লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে। এই মঠ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ-বাক্য চলিয়া আসিয়াছে: কেহ কেহ বলেন কেদার রায় মাতৃ-সমাধির

(১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই মঠটীকে চতুশ্চূড় মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-(১৩১৪ সন বৈশাখ ঐতিহাসিক চিত্র ২০ পৃষ্ঠা)। বাস্তবিক উহা ঠিক নয়। মাত্র মঠটি একটি চূড়া দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, আজিও আছে। বর্ত্তমান সময়েতে কেহ কেহ বলেন ও ইতিহাসে লিখিয়াছেন উহা হয়ত বৌদ্ধদের সময়ে নির্ম্মিত মঠ হইতে পারে। অন্যথা মঠ পূর্ব্বদ্বারী কেন হইবে? হিন্দুদের দেব দেবীর কোন গৃহ উত্তর দ্বারী বা পূর্ব্ব দ্বারী থাকে না। আমরা পুরাণ হইতে প্রমান সংগ্রহ করিয়া দেখাইব যে এই উক্তির কোন মূল্য নাই। দেবগৃহ অবস্থা ভেদে সর্ব্বদ্বারীই হইতে পারে। কেবল গুপ্ত মহাশয় নন, আজ কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখক মাত্রেই এই যুক্তির বলে অনেক দেবগৃহকে বৌদ্ধ মঠ ও অনেক দেব মূর্ত্তিকে বৌদ্ধ বিগ্রহ বলিয়া অনুমান করিয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে সঙ্কুচিত হন না।

উপর এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়া "মাতৃদায় হইতে এতদিনে নিষ্কৃতি পাইলাম" এই বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র মঠের অত্যুচ্চচূড়া ভগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। হায়! যাঁহার স্নেহপারাবার সহস্র সহস্র দেবাসুরের মন্থনেও একবিন্দু বিশুষ্ক হইবার নয়, যাঁহার এক দিবসের দায় চিরজীবন লাভ করিয়াও পরিশোধ করিবার উপায় নাই, তাঁহার সমাধিক্ষেত্রোপরি সামান্য একটি মৃন্ময় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মাতৃদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে যাওয়া মহা মূর্খতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কেদার রায়ের ন্যায় একজন বুদ্ধিমান্ রাজার দ্বারা যে এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছিল তাহা কোনও মতে বিশ্বাস করা যায় না। এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ যে একটি কিংবদন্তী পরিশ্রুত হওয়া যায় তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

আরব্ধকাল হইতে বহুবৎসরাতীতে মঠ প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাহার চূড়া আর হইয়া উঠিতেছে না। বহু আয়াসে স্থপতি উহা সংযোজিত করিয়া দিয়াছে, কেদার রায় সানন্দে উহা সন্দর্শন জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যে ভাবে নির্ম্মিত হইলে উহার সুদৃশ্যতা রক্ষা পাইত কাজটা তদনুরূপ হয় নাই, এজন্য রাজা স্থপতিকে বড়ই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সে ভাবিল রাজহস্তে আর অব্যাহতি নাই, অথচ যাহা সাধ্যায়ত্ব তাহাই করিয়াছি; আমার প্রাণ ত যাইবেই তবে উহারও একটা অনিষ্ট করিয়া প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তখন মিস্ত্রী বলিল যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তবে উহার পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি এই আদেশ প্রচার হইল, যদি কার্য্য সুন্দর মত সম্পাদন না হয়, তবে নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। স্থপতিও সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশে মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভাঙ্গিয়া তৎসহ নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ ভগ্ন

স্থান বহুশতবৎসর যাবৎ এক ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। অধুনা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রাজবাড়ীতে একটি পুলিশ আউটপোষ্ট বর্ত্তমান আছে। এই স্থানটি ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

৪র্থ—ঢোল সমুদ্র বা কেশার মার দীঘী। ইহা একটি প্রকাণ্ড জলাশয়। প্রবাদ আছে যে কেশার মাতা পতিপুত্রহীনা হইয়া পতিকুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। বিক্রমপুরাঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া যে এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে, তাহাদের রমণীরা বিপন্নাবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রভু পরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। এই নফর শ্রেণী আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কেহ যদি প্রভু পুত্রের 'ধাইভাই' হইতে পারে তবে তাহারা বড়ই সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাইভাই বিক্রমপুর অঞ্চলে আতাভাই নামে প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, তাঁহার পিতা কেশার মাকে তাহার ধাত্রী-পদে নিযুক্ত করিয়া পুত্রের প্রতিপালন ভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ধাত্রীমাতার ইচ্ছানুসারে ঐ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দারা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ জলাশয়ের নাম হয় কেশার মার দীঘী। আরও প্রবাদ এই যে কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় এক মাইল স্থান চলিয়া যাওয়ার পর অন্য লোক কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এই জন্য ঐ দীর্ঘিকাও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হয়। অধুনা উহার অধিকাংশ মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই দীঘীর পারের হাটটী আজও

বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন ঢোলসমুদ্র ও কেশার মার দীঘী দুইটি স্বতন্ত্র জলাশয়। রেনেলের মানচিত্রে ঢোলসমুদ্রের চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজনগরের রাজসাগর অপেক্ষাও উহার আয়তন বড় ছিল।

রায় রাজগণের রাজধানী ও বহু কীর্ত্তি কীর্ত্তিনাশা নদীর তরঙ্গাঘাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কালীগঙ্গা নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরে শ্রীপুর, ফুলবাড়িয়া ও কোটীশ্বর বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে পদ্মার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া কালীগঙ্গার সহিত মিলিত হয়। পরে উহা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রায় রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংশ করিতে থাকে, এবং নয়পাড়ার বৈদ্য জমিদারগণের বহু কীর্ত্তি কুক্ষিগত করে। এই সকল কীর্ত্তি বিলোপ করিয়াই উহার নাম হয় কীর্ত্তিনাশা। উহাই পরে মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থান হইয়া পড়ে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রেনেল যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার নাম ও চিত্র স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়া রহিয়াছে। উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীপুর ও কোটীশ্বর ধ্বংশ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের নাম উহাতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ফুলবাড়িয়া ও ঢোলসমুদ্র তৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকায় রেনেল স্বীয় মানচিত্রে উহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে উহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। সমুদয়ই কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়

বঙ্গদেশের যে কয়েকটি হিন্দু ভূঞার পরিচয় পাওয়া যায়, বাকলার কন্দর্প রায় তাহার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আকবরনামা গ্রন্থে কন্দর্প স্থলে দর্পনারায়ণ উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে কন্দর্পের পিতামহ পরমানন্দ রায়ের নাম প্রেমানন্দ বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই পরমানন্দ রায় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের বসু রাজবংশের রাজত্ব প্রথম আরম্ভ হয়। ডাক্তার ওয়াইজ বারভূঞা প্রবন্ধে এই মহাত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের স্থাপয়িতা দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুরবাসী ও "দেবংশীয়" বলিয়া পরিচিত। প্রবাদানুসারে তাঁহার প্রথম পরিচয় যদিও ৬০৬ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ সময়ের অব্যবহিত পরে বক্তিয়ার খিলিজী সেনরাজগণকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন। সেনরাজগণ তৎসময়ে বিক্রমপুর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন এইরূপ অবগত হওয়া যায়। তৎপরে সেন রাজবংশধরেরা আরও প্রায় শতবৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ দনুজকে যাঁহারা সেনবংশীয় বলেন সন হিসাবে তাঁহারা কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

সেনবংশীয় দনুজমাধব ও এই দনুজমর্দ্দন যে পৃথক্ ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দনুজমাধবের রাজত্ব সময়ে বাদসাহ বুলবন,

মুঘুসুদ্দিন তুগলকের দমনার্থ আগমন করিলে পর (১) দনুজ বাদসাহের সাহায্য করিয়াছিলেন। দনুজ তৎসময়ে বিক্রমপুর ও সোনারগাঁ রাজত্ব করিতেন, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

আজকাল কয়েকজন খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই দনুজমর্দ্দন দেকে ও সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজমাধবকে একই ব্যক্তি স্থির করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির করিতেছেন। কিন্তু যখন বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মাধবপাশার রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া, ঐ রাজবংশের ইতিহাস প্রথম সংগ্রহ করেন, তখন তিনি তৎকালীন রাজাদের নিকট হইতে অবগত হইতে পারেন না যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দনুজমর্দ্দন সেনরাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন বিক্রমপুরবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর শিষ্য অথবা ভৃত্য বলিয়াই দনুজ পরিচিত ছিলেন, এইমাত্র দেখা যায়। কাজেই মিত্র মহাশয় দনুজ দেকে সেনবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় তদীয় বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার মতেও কয়েকটি মাত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিরচিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া দনুজমাধব ও দনুজমর্দ্দনকে কখনও এক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

"লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর মাধবসেন কিছুকাল নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করেন। তিনিই রাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে দনৌজামাধব নামে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার দনৌজা নাম কেন হয় তাহা বুঝা যায় না। তিনি রাঢ়ীয় কুলীনদিগের চারিবার সমীকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র

(১) মুঘুসুদ্দিন পলাইয়া যাজনগর (ত্রিপুরা) রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নাথ বসু লিখিয়াছেন যে হরিমিশ্রের কারিকামতে তিনি কেশবসেনের পুত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হরিমিশ্রের কারিকানুসারে তিনি বল্লাল সেনের পৌত্র এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্র।

"এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধঃ কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥"

(হরিমিশ্র)

"এখানে 'পিতামহ' শব্দে বল্লালসেনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্য করা হয় নাই।" (পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ৩২১ পৃষ্ঠা)

পরেশবাবু পুনশ্চ বলেন যে মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে—

"নবদ্বীপেঽবসদ্রাজা তব পশ্চাৎ পিতামহঃ।
যদা পিতৃবিরোধেষু বৈদ্যশ্রেণী দ্বিধাঽভবৎ॥"

"যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বল্লালের নিকট কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকের পুত্র মাধবসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং মাধবসেন এবং দনৌজামাধব যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারও পৌত্র দনৌজামাধবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।"

"বঙ্গজকায়স্থকারিকার কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, সুবর্ণগ্রামের দনুজ রায় কিংবা দনৌজামাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইয়া পরিশেষে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত কারিকাগ্রন্থগুলির উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। দনুজরায় ১২৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যে সকল

ব্রাহ্মণগণ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্রগণ দনুজরায়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর বোধ হয় না।" (৩২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কবি কীর্ত্তিবাস বিরচিত একটী রচনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ কবি দনুজরায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি এইরূপ কথা লিখেন নাই যে দনুজমর্দ্দন ও দনুজ-মাধব একই ব্যক্তি। অতএব সেন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে একটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার ভাবও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তদ্বিরচিত বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে দনুজ রায় সম্বন্ধে যে একটী নূতন কথা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তদবলম্বনে দনুজ রায়কে সেনবংশের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতঃপর আমরা উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বল্লাল সেনের * * * "এক উপপত্নীজাতপুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপের করদ রাজা করিয়াছিলেন। পাঠান কর্ত্তৃক বৈদ্য-রাজপাট নির্ম্মূল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন।"

"কালুরায় ও তদ্বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থজাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, এজন্য কায়স্থ-সমাজে বিশেষ মাননীয় ছিলেন।" (১১৮—১১৯ পৃঃ)

"চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজরায় নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইলে, তাঁহার ভাগিনেয় (মতান্তরে তাঁহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বসু উত্তরাধি-কারী হইয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্য রাজকুলীন কায়স্থসন্তান এবং তাঁহার মাতামহ-কুল বাঙ্গালাদেশের

সম্রাট্‌বংশজাত। এইজন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিলেন।" (১১৯ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার জেম্‌স ওয়াইজের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * তিনি এই দুই দনুজকে সম্ভবতঃ এক বলিয়াছেন (১)। পরে দনুজ মর্দ্দনদেকে ভৃত্য বলায়, কথার সামঞ্জস্য হয় না। ১২৩ পৃষ্ঠার নোট দেখ।

এতৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপ্রণীত জাতিতত্ত্ব-বারিধির "বল্লালমোহমুদ্গর" প্রবন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে দনুজমাধব ও দনুজমর্দ্দন দে যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বাহুল্যভয়ে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করিলাম না। অপর যাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিলাম তৎপাঠেই পাঠক মহোদয়গণ এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

* The first of the Chandradwip family was Danuj Mordon De. He is styled by the Ghatak as "Raja" and he was the first Samajpati or president of the Bangaja Kayasthas.

* * * * *

It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Rai of Sunargaon, named Dhanuj Rai, who met the Emperor Balban on his march against Sultan Maghisuddin in the year 1280. It is not likely that the Mahommedan usurper would have allowed a Hindu to remain in independence at his capital Sunargaon. If the principality of Chandradwip extended to the river Megna, the agreement made with the Emperor that he would guard against the escape of Sughril to the west becomes intelligible. (Quoted from Sir H. Elliot's History of India, Vol. III P. 116, in J. A. S. B. III, 1874 P. 206.)

(১) "নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমর্দ্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।" গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিক্রমপুরের রায় রাজগণ ও ভূষণার দেবংশীয় রাজগণ ও চন্দ্রদ্বীপের দেরাজগণ একই বংশতরুর পৃথক্ পৃথক্ শাখা মাত্র। এখন দনুজমর্দ্দন কিরূপে বাঙ্গলা দেশের আধিপত্য লাভ করেন, তদ্বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী কাত্যায়নী দেবীর উপাসক ছিলেন। চন্দ্রশেখর বিবাহ সময়ে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নব-পরিণীতা বনিতা ও তাঁহার উপাস্যা দেবী একই নামে অভিহিতা। তখন তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইষ্টদেবীর নাম গ্রহণ সময়ে কিরূপে তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করা যাইবে। এই চিন্তায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে যে সময়ে চন্দ্রশেখর একখানি তরি আরোহণ করিয়া অকূল সাগরজলে ভাসিতেছিলেন, তখন দেখিতে পান যে একটী ধীবরবালিকা ঐ অসীম জলরাশির মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে মৎস্য ধৃত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে যারপরনাই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি কে এবং কোন সাহসে একাকিনী এই অকূল পারাবারে অবস্থান করিতেছ? তদুত্তরে বালিকা বলিল যে মদীয় প্রিয়শিষ্য অকূল পাথারে ভাসিতেছে, আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমি তাহার অপেক্ষায় এই সলিলরাশি মধ্যে অবস্থান করিতেছি। তাহার ভ্রম নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহার সহধর্ম্মিণীর নামের সহিত আমার নামের ঐক্যতা প্রযুক্ত সে কিরূপে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিবে তাহা ভাবিয়াই আকুল হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যদি বুঝিত যে জগতের যাবতীয় নরনারী ও সমুদয় বস্তুনিচয়ই আমাতে প্রতিবিম্বিত এবং আমারই অংশসম্ভূত,

তাহা হইলে সে কখনও স্ত্রী বা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবেগী হইত না। বালিকার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই ইষ্টদেবী আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সন্দেহ দূরীভূত করিতেছেন। তখন ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ আমার ভ্রম এতদিনে নিরসন প্রাপ্ত হইল, এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়? দেবী বলিলেন, যাও বৎস, এখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণীতা বনিতাসহ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর।

দেবী আরও বলিলেন, এই যে অকূল সাগর বিদ্যমান দেখিতেছ, ইহা অতি ত্বরায় বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে এবং এই স্থান দ্বীপে পরিণত হইবে। কিছুকাল পরে এই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জলে অবতরণ করিয়া অন্বেষণ করিও, তবেই আমার প্রকৃত কাত্যায়নী ও মদনগোপাল বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইবে*। যে কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিয়া এই স্থানে সংস্থাপন করাইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি সংসারাসক্ত নও, অতএব রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? প্রবাদ যে দেবীর আদেশ মত চন্দ্রশেখর ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, উহা আপনার প্রিয় ভৃত্য বিক্রমপুর নিবাসী দনুজমর্দ্দন দেকে সমর্পণ করেন। দনুজ দেবীনির্দ্দিষ্ট চড়াতে ঐ কাত্যায়নী ও মদনগোপাল সংস্থাপন করিয়া, ঐ স্থানের নাম স্বীয় প্রভুর নামানুসারে "চন্দ্রদ্বীপ" রাখিয়াছিলেন। এই হইতে দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। এই মহাত্মাই চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সংস্থাপয়িতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত (১)।

* ওয়াইজের পুস্তকে জানা যায় যে দনুজমর্দ্দন স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন।

(1) 'Another legend conneted with Chandradwip is that in former days a holy ascetic, by name Chandrashekhar Chakrabarti, was in the

সমতট বঙ্গের পূর্ব্ব ও দক্ষিণবর্ত্তী ভূভাগ যাহা অধুনা দৃষ্ট হয়, উহা অধিকাংশই সমুদ্রজলে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে চড়া পড়িয়া উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপবৎ ভূখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গা নদী কর্ত্তৃক উচ্চ ভূভাগ হইতে পঙ্কিল প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি বিধৌত হইয়া স্রোতবেগে যে স্থানে কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে তথায়ই এইরূপ দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থানই সোন্ধা বা সুগন্ধা নদীর জল নিঃসরণের সহিত উদ্ভূত হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে দেবাদিদেব যখন সতীর মৃত্যুজনিত শোকে আতুর হইয়া সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন সেই সময় বিষ্ণু তদীয় চক্রদ্বারা ঐ শবদেহ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই কারণে সতীর দেহ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে নিপতিত হয়। ঐ স্থানগুলি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, সোন্ধার জলে এইরূপে দেবীর নাসিকা পতিত হওয়ায় উহার নাম হয় সুগন্ধা। পরে ঐ নদী ক্রমে মজিয়া যাওয়ায় বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হইয়া সোন্ধার কুল নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্বে সোন্ধার কুল বলিয়া একটি

habit of travelling about with a servant Danujmordon De. One night the goddess Bhagabati appeared to him in a vision and told him that in the river near his boat were several images which he must secure. The following morning he made his servant dive for them, and each time he brought up a stone image fortunately. He did not try a third time or he would have found Lakhmi, the goddess of prosperity. The two images he found in the river Sonda, and they are still shown by the Chandradwip family.

Chandrashekar then predicted to his servant that the sea would soon become dry land, and that he would be the Raja of it. He also told him to call it Chandradwip after the name of his master.

J. A. S. B. Vol XLII., pages 206.

পরগণার পরিচয় ছিল। পরিণামে উহা সিলেমাবাদ ও হাবেলী সিলেমাবাদ নামক পরগণাদ্বয়ের বিভক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপ সম্ভবতঃ এই সুগন্ধার জলে নিমগ্ন ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া কোন পরগণার পরিচয় পাওয়া যায় না। আইন ই আকবরীতে ও আকবরনামাতে উহার নাম বাকলা বা ইসলামপুর। আইন ই আকবরীতে বাকলা সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই উল্লেখ করা গেল।

"সরকার বাকলা মহালের সংখ্যা চারি। রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ দাম, ইসলামপুর (বাকলা) ৪৩৪৭৯৬০, শ্রীরামপুর ২৫০০০০, সাহাজাদপুর ১৫৫৩৪৪০, ইদিলপুর ২৫৫৩৪৪০ দাম। এই সরকারে ৩২০ অশ্বারোহী ও ১৫০০০ হাজার পদাতিক সরবরাহ করিত। অধুনা বাখরগঞ্জের রাজস্ব হিসাবে যতগুলি পরগণার নাম দৃষ্ট হয়, উহার অধিকাংশই পূর্ব্বে বাকলার অন্তর্গত ছিল। পরে পৃথক্ পৃথক পরগণাতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণতঃ আরিয়লখা নদীর দক্ষিণ, বলেশ্বর নদীর পূর্ব্ব, সমুদ্রের উত্তর ও মেঘনা নদের পশ্চিম ভূভাগ বাকলা নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাপি বাখরগঞ্জের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আপনাদিগকে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

দে-বংশীয় রাজাদের বংশাবলী

দনুজমর্দ্দন
|
রামনাথ
|
জানকীবল্লভ
|
রামবল্লভ

রামবল্লভ
|
শ্রীবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ বসু

মিঃ বিভারেজ রাজবংশের তালিকা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। * কোন কোন মতে শ্রীবল্লভের পুত্র জয়দেব দেব, তৎকন্যা কমলা। বঙ্গীয়সমাজ নামক গ্রন্থের মতে বংশাবলী—

দনুজমর্দ্দন
|
রমাবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
জয়দেব দেব
|
কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ

পরমানন্দ বসুবংশীয় ছিলেন। মাতামহের সিংহাসন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। আইন ই আকবরীতে পরমানন্দকে রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করায় বোধ হয়, পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুই শ্বশুরের

* মিঃ বিভারেজ কৃত বাথরগঞ্জের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ দেখ।

সিংহাসন প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। পরে এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

দে-বংশের রাজ্য লোপ হইলে পরমানন্দ বসু বাকলার রাজাসনে আসীন হন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ বঙ্গে জলপ্লাবিত হইয়া যেরূপ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার স্থূল বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। *

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, পরমানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ঐ জলপ্লাবনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন দেখা উচিত যে, এই রাজা কে ? পরমানন্দকে রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহার পিতাই রাজা ছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে জামাতা কখনও কন্যা বা দৌহিত্র বর্ত্তমানে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরমানন্দ যদি ঐ দুর্ঘটনার সময়ে শিশু থাকিতেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নামেই রাজ্য চলিয়াছিল। কারণ পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুর কোন

* In the Ain-i-Akbari, (Gladwin's Translations) there is the following notice of Bakla : Sarkar Bakla is upon the banks of the sea ; the fort is situated among trees. On the first day of the moon, the water begins to rise and continues increasing till the 14th, from which time to the end of the month it decreases gradually everyday. In the twenty-nineth year of the present reign one afternoon at 3 o'clock there was a terrible inundation which deluged the whole Sarkar. The Rajah was at an entertainment, from which he embarked in a boat : his son Paramananda Roy, with many people climbed to the top of a Hindu temple and the merchants betook themselves to the high land. It blew a hurricane with thunder and lightning for five hours, during which time the sea was greatly agitated. The houses and boats were swallowed up, nothing remaining but the Hindu temple on the height. Near 200,000 living ereatures perished in this calamity.

Beveridge Antiquities and History, page 27.

সুনাম বা কীর্ত্তির বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না ; কিন্তু তাঁহার মাতা কমলার কীর্ত্তির কিছু কিছু নিদর্শন আজিও বাখরগঞ্জ জিলাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমলা রাজধানী কচুয়ার নিকট কালাইয়া নদীর অনতিদূরে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। এরূপ বৃহৎ জলাশয় সচরাচর দেখা যায় না। উহার কতক ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া অদ্যাপি কমলার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের কথা জনগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রবাদ এই যে, জলাশয় খননে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, উহার পরিসর তিন দ্রোণ তের কানি স্থান ব্যাপী ছিল। এই সকল কারণে আরও বোধ হয় যে, দে-বংশের রাজ্যাবসানের পর, কতককাল রাজ্য-ভার পরমানন্দের মাতার হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং দে-বংশীয় শেষ রাজাই জলপ্লাবনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

রাজা পরমানন্দ রায় কায়স্থগণের ১১।১২।১৩ পর্য্যায় লইয়া বঙ্গজ কায়স্থের সমাজ সমীকরণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত দে-রাজবংশ সমাজপতিপদে বৃত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত সমুদয় কুলীনগণ তাঁহা-দের অধীনতায় অবস্থান করিতে ও সমাজপতির মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরে যখন কুলীনবংশ হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া সমাজ-পতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে ছিলেন, তখন অনেক কুলীনের পক্ষেই উহা অপ্রিয়কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমকক্ষ লোকের অধীনতা বিশেষ তাহার সম্মান বৰ্দ্ধিত করিয়া দেওয়া বড়ই মর্ম্মবেদনার কারণ বলিয়া কেহ কেহ তখনই সেই সমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এতদ্বিষয় আমরা যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সহ পরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক থাকিলাম। যাহা হউক বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে ঘটকেরা চন্দ্রদ্বীপের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তাহাদের মতে চন্দ্রদ্বীপ শিরঃস্থান, যশোহর সমাজ বাহুস্বরূপ, বিক্রমপুর সমাজ উরুদ্বয়সদৃশ, ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ পদদ্বয়তুল্য, বাজু গুহ এবং তদেতর সমাজ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

পরমানন্দ রায়ের পুত্র জগদানন্দ রায়। বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। এজন্য তৎপুত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় নদীপ্রধানপ্রদেশে বসতি করা বিপজ্জনক মনে করিয়া কচুয়া হইতে রাজধানী তুলিয়া মাধবপাশা নামক স্থানে সংস্থাপন করেন। (১) কেহ কেহ বলেন রাজা জগদানন্দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এজন্য মৃত্যুকালে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিবশে গঙ্গা বা পদ্মা জলবৃদ্ধি করিয়া রাজপুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। (২) যেরূপেই হউক, জগদানন্দের মৃত্যু যে জলে পতিত হইয়া হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসু-রাজবংশমধ্যে কন্দর্পনারায়ণ খ্যাতনামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সনদ্বীপের যুদ্ধে তাঁহার কম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবৎসর মাসুম কাবুলীর সহিত সাহাবাজ খাঁর যুদ্ধকালে কন্দর্পনারায়ণ সাহাবাজকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া আইন-ই-আকবরী প্রণেতা তাঁহাকে নারায়ণ ভৌমী (ভূঞা) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) হোসেনপুরের যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণ পাঠান সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া

(১) প্রথমতঃ বাঙ্গরকাটি, পরে হোসেনপুর, তৎপরে ক্ষুদ্রকাটি, সর্ব্বশেষে মাধবপাশায় রাজধানী সংস্থাপিত হয়।

(২) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী; বি-এল প্রণীত বঙ্গীয় সমাজ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

(৩) ব্লকম্যান ৩য় ভলুম, ৪১২ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মীর জানজাদ খাঁ মোগল বাদসাহের পক্ষ সমর্থন করিলে, পাঠান কতুল খাঁ তাহাকে আক্রমণ করেন। তখন মীর জানজাদ দক্ষিণ বঙ্গের সলিমাবাদে পলাইয়া যান, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া কন্দর্প রায় ও পর্টুগীস প্রতাপ রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবরনামা গ্রন্থে এক স্থানে কন্দর্পনারায়ণকে দর্প নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বার-ভূঞার বিদ্রোহদলের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য কায়স্থ-সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। সমাজ-সমন্বয় সময়ে ভুলুয়া-রাজ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র অপেক্ষা যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সমধিক সম্মান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে ভুলুয়া ও চন্দ্রদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী মেঘনা নদের কতকগুলি দ্বীপ লইয়া বড়ই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। প্রবাদ এই যে এই বিবাদ নিবন্ধন রামচন্দ্র ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণ মাণিক্যকে বন্দী করিয়া স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য, তাহা লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রকরণে প্রদর্শন করা যাইবে।

রামচন্দ্র যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু এই বিবাহের আমোদোৎসবাদি পরে ভয়ানক বিষাদে পরিণত হয়। প্রবাদ, রামচন্দ্রের একজন অনুচর রামাই ভড় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া বিবাহরাত্রিতে রাজ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে। পরে রাণীর সহিত হাস্যকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলে, পুরুষ বলিয়া ধৃত হয়। প্রতাপাদিত্য উহা অবগত হইয়া পরিচারকের পরিবর্ত্তে তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হন। এমন কি তিনি ক্রোধান্ধ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জামাতৃবধের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। এই সমাচার প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপের পুত্র

উদয়াদিত্যের কর্ণগোচর হইলে পর তাঁহারা বিষম প্রমাদ গণিয়া রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীবেশে তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দেন। পরিণামে ব্যাপার এইরূপ ঘটিল যে, সেনাপতি রামমোহনের * প্রচুর সাহায্যে রামচন্দ্র নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে নব পরিণীতা বনিতাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এদিকে প্রতাপের কন্যা ইন্দুমতী প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া ক্রমে কৃশা ও মলিনা হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজমহিষী রাজাকে অনেক বুঝাইয়া কন্যাকে জামাতৃসদনে প্রেরণ করেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে কোন মতে গ্রহণ করিলেন না। ইন্দুমতীর সখীরা তাঁহাকে এই অবস্থায় পুনরায় পিত্রালয়ে যাইতে বলেন। রাজতনয়া তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়া বলিলেন,—"তোমরা আমাকে পতির রাজ্যমধ্যে যে কোনও স্থানে রাখিয়া যাও, আমি আর পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।" এই সকল কথা ক্রমে রামচন্দ্রের জননীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়া ও তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া পুত্রবধূকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন। †

রাজবধূ ইন্দুমতী চন্দ্রদ্বীপের যে স্থানে প্রথম নৌকা হইতে অবতরণ করেন, তাঁহার সম্মানার্থে সেই স্থানে একটি বাজার সংস্থাপিত হয়। এখনও ঐ বাজার "বৌঠাকুরাণীর হাট্" নামে প্রসিদ্ধ।

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের ঘোরতর

* বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উজীরপুরের প্রাচীন জমিদারবংশের আদিপুরুষ।

† কেহ কেহ বলেন, রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে গ্রহণ না করায় ইন্দুমতী কাশীধামে যাইয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

যুদ্ধ হয়। রামচন্দ্র মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং প্রতাপের পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ করিয়া শ্বশুরের কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন নাই। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ। তৎপুত্র প্রতাপনারায়ণ (১) ও তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ। এই প্রেমনারায়ণের সহিত বসু রাজবংশের রাজ্যের অবসান হয়। তৎপরে দৌহিত্রসূত্রে মিত্রবংশ চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী প্রাপ্ত হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থাদি ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা অতি সংক্ষেপে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-বিবরণ পরিসমাপ্ত করিলাম।

বাকলা সম্বন্ধে মিঃ রালফ্ ফিচ্ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নিম্নে তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (২) রাজা কন্দর্প রায় যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। রালফ্ ফিচ্ তাঁহার বিবরণীতে ঐ রাজার বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) কোন কোন মতে প্রতাপনারায়ণের পুর্ব্বে বাসুদেবনারায়ণ নামে এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়।

(2) "From Chittagong in Bengal, I came to Bacoler; the king whereof is a gentleman very well disposed and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful and store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses are very fair and high-builded the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste.

. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephant's teeth."

ঘটক মহোদয়গণ তাঁহাদের কারিকায় কন্দর্প রায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (৩)

রামচন্দ্র রায়ও একজন বুদ্ধিমান্ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। পর্টুগীজ পাদরীগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম প্রচার জন্য, ফন্‌সেকা, ফর্নাণ্ডেজ, বার্ডয়েস ও সোসা নামীয় চারিজন পাদরী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন (১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে)। ইহাদের মধ্যে ফন্‌সেকা বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় অষ্টমবর্ষীয় বালক। তথাপি তিনি যেরূপভাবে এই বিদেশীয়দিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফন্‌সেকা প্রভৃতি তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

রাজার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ফন্‌সেকা বলিয়াছিলেন, "আমরা

(৩) "কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচীসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ॥
স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটিসংজ্ঞকম্।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাত্তথা।
রথীনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

"মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।
"চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ। শমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপস্তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি। মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্ম্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ॥

আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকান অধিপতির রাজ্যে গমন করিতেছি। আমাদের ইচ্ছা আপনার রাজ্যমধ্যে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার ও গীর্জ্জা স্থাপন কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তৎপ্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষিত হয়।" রাজা তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ফন্‌সেকা এই বিবরণ গোয়ার প্রধান পাদরী 'পাইমেণ্টের' নিকট প্রেরণ করেন। পাইমেণ্ট স্বীয় মন্তব্য সহ উহা ১৬০১—২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। "প্যার ডি জেরিব" তৎকৃত 'ডিস্‌স্থিইস্‌ ওরিয়্যাণ্টাল' নামক গ্রন্থে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। বিভারেজ এতৎসম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহা উদ্ধৃত করা গেল (১)।

---

(1) "And it appeared to be by the disposition of our Lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez who was ill with fever, I too should fall ill, and should be transfered to Ciandeca, so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacala. I had scarcely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose descretion surpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up and I, a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the company trusting His Highness would give permission to the erection of churches and the making of Christians. The king said 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualities' and so he gave me a letter of authority and also assigned a maintenance sufficient for two of us.

(Beveridge's Bakargunj, pp. 30-31.)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মুকুন্দ রায়

বার-ভূঞা দলের মধ্যে ভূষণার মুকুন্দ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর জমিদারগণের মধ্যে যাঁহারা কিছুমাত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, বাদসাহ বা তৎপ্রতিনিধিগণকে গ্রাহ্য করেন নাই, বরং সময় সময় প্রতিযোগী ভাবে সমরাঙ্গণে অবতরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় বলবীর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নামই তৎসময়ের পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এস্থানে যে মহাত্মার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম, তাঁহার নামও সেইরূপ ভাবে গৃহীত হইয়া মহামনা আবুল ফাজেল কৃত "আকবর নামা" গ্রন্থে চির অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে মুকুন্দ রায় "মুকুন্দ জমিদার" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন। সাধারণতঃ লোকে ঐ স্থানকে ভূষণা মামুদপুর বলিয়া থাকে। অধুনা মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মামুদপুর এবং উহার পূর্ব্ব তীরে ভূষণার অস্তিত্ব বর্ত্তমান দেখা যায়। বোধ হয়, যেমন পদ্মা-নদীর বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণপূর্ব্বক বিক্রমপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্রূপ গোড়াই নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূষণা এখন কেবল মাত্র একটি পুলিশ

ষ্টেশন বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি জনগণের গোচরীভূত করিতেছে।

সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে সাগর স্রোত প্রবাহিত হইত। ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সম্যক্‌রূপে উহার জল নিঃসরণ না হওয়ায় কোথাও বা হ্রদরূপে বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। এই সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়লখা নদীর পশ্চিম তীর হইতে মধুমতীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত যে কোন্ স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেইস্থানেই মৃত্তিকার কিছু নিম্নে একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দল-দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহাও ঠিক তদনুরূপ। এজন্য অনুমান হয় যে বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল দল ছিল, কালক্রমে উহা পচিয়াই এইরূপ মৃত্তিকা রাশির এবং উহা ক্রমে নিম্নে পতন হওয়ায় স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। বোধ হয় ফরিদপুর পূর্ব্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত থাকিয়া পরে চাকলে ভূষণার অন্তর্ভূত হয়। (১)

প্রবাদ আছে যে এই স্থানে বহু জল ও জঙ্গল থাকায়, কেহই আর আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলী নামীয় এক জন মুসলমান বহু আয়াসে এই স্থান মনুষ্যবাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে উহার নাম হয় "ফতেয়াবাদ" (২)। আইন ই আকবরিতে ফতেয়াবাদের

(১) যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াখালি জেলার কোন কোন পরগণা এই স্থানের অন্তর্গত ছিল।

(২) যে ফতে আলীর নামানুসারে ফতেয়াবাদের নামকরণ হয়, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে সন্দ্বীপের মোগলপক্ষীয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জন, ষ্টিভেনস্ কর্তৃক

নাম উল্লেখ আছে। উহার মহলের সংখ্যা ছিল ৩১ এবং রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৫৭ দাম। হাবেলী ফতেয়াবাদ সাধারণতঃ ভূষণা নামে কথিত হয়। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে সরকার ফতেয়াবাদ এবং সুজা খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে চাকলে ভূষণা নামের সৃষ্টি হয়।

মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন তাহার কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিক্রমপুরের, চন্দ্রদ্বীপেরও ফতেয়াবাদের রাজগণ একই বংশোদ্ভব। অন্য কোন কোন লেখকও এই মতের পোষকতা করেন।

মুকুন্দ রায় প্রথমতঃ ভূষণার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে ভূঞা শ্রেণীতে উন্নত হইয়া মুসলমান দেশাধিপতিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেও শঙ্কিত হন নাই।

হিজরী ৯৮৮ সালে (১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাদসাহ আকবর সাহের বঙ্গাধিকারের সময় মোরাদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলে হিজলীর থামার খাঁ ফতেয়াবাদের

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে যে পুস্তক ভাষান্তরিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ফতে খাঁ পর্টুগীস্ মাটুস কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও সন্দীপের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতে খাঁ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিধন সাধন করেন। ফতে খাঁর পতাকা মধ্যে লিখিত ছিল "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতে খাঁ সন্দীপের অধীশ্বর, খ্রীষ্টীয়ানের রক্তপাতকারী ও পর্টুগীস্ জাতির বিনাশকর্ত্তা।" পরে কিন্তু পর্টুগীস্‌দের হস্তেই তাঁহার নিধন সাধন হয়। সন্দীপ সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ছিল।

মোরাদ খাঁ (১) এবং সাতগাঁর মীর জানজাদ খাঁ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। মোগল সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর, পাঠান কতুল খাঁ এই অবসরে পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন, কারণ তদধীন এই তিন কাপুরুষ পাঠান হইয়াও মোগলের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। এই তিন কুলাঙ্গারকে শিক্ষা দেওয়াই কতুলের উদ্দেশ্য ছিল।

কতুল খাঁ প্রথমতঃ সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মীর জানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। (২) মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া প্রস্থান করেন। এ বিষয় কন্দর্প রায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এদিকে কতুল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে মুকুন্দ রায় তথাকার একজন সামান্য জমিদার মাত্র। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্যতা থাকায়, মুকুন্দ তাঁহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হন।

কতুল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দ মোরাদের সৈন্যের সহিত নিজ দলবল মিশাইয়া কতুল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এদিকে

(১) ব্লকম্যানের আইন ই আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা অধিকার করেন। আমাদের বিবেচনায় তৎসময়ে ফতেয়াবাদ মোগলের নাম মাত্র অধিকারে আইসে, বাস্তবিক এইকালে পাঠানদের হস্ত হইতে ফতেয়াবাদ একেবারে বিচ্যুত হয় নাই।

(২) কাজী জেদা নামক একজন বিদ্রোহী পাঠানের প্রবর্ত্তনায় কতুল খাঁ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কাজী জেদা ফতেয়াবাদের কোন স্থানে অবস্থান করিয়া মুকুন্দ রায়ের সহিত নিয়ত বিবাদ করিতেন। পরে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসুম কাবুলির সহায়তা করিতে যাইয়া "গড়িয়াতে" মোগলসেনাপতি আজিজ খাঁর পক্ষ কর্তৃক হত হন।

মোগল সেনাপতি মুজাফরও ঠিক এই সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া, কতুল খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হওয়ায়, অনন্যোপায় হইয়া পাঠানগণ পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করে। ডাক্তার ওয়াইজ্ অথবা অন্য কোন ইতিহাসলেখক মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পারস্যভাষায় লিখিত মূল আকবরনামা অনুবাদ করাইয়া এ সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

টোড়রমল্ল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদে অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূ-বৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারেন, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপ নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া তিনি অচিরে সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

মানসিংহ মধ্যসময়ে যখন একবার বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করেন তৎসময়ে শাসনকর্ত্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনওমতে নব শাসনকর্ত্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে এইজন্য একটী যুদ্ধ ঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবলসহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ

রায়কে পরাস্ত ও হত করেন (১)। প্রবাদ যে, যাহাকে ফতেয়াবাদের নব শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করা হয়, ঐ দুরাচার মুকুন্দ রায়ের কন্যার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার সতীত্ব নাশ করিতে উদ্যত হওয়ায় ঐ রমণীর হস্তস্থিত অসির আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া বাঙ্গালার অপরাপর ভূঞারা প্রমাদ গণিয়া মোগল দিগের উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসেন। তাহার ফলে মোগল বাদসাহের বহু অর্থ ও সৈন্যপাতের পর মানসিংহের কুটনীতিতে বঙ্গদেশ মোগল শাসনাধীনে আইসে।

ফতেয়াবাদের কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ রায় প্রদত্ত বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তরে বহু লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার একখানা ব্রহ্মোত্তরের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু এখন ঐ দলিলের প্রকৃত অনুসন্ধান সীতারাম রায়ের জীবনচরিত পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (২)

মুকুন্দ রায়ের ছয়টি পুত্রের মধ্যে শত্রুজিৎ রায় ও শিবরাম রায়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শত্রুজিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে, ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহান বাদসাহের রাজত্বকালে ঢাকার নবাব সুলতান সুজা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পরে তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শত্রুজিৎ প্রদত্ত একখানা দেবোত্তরের সনন্দও পাওয়া গিয়াছে (৩)। শত্রুজিতের

(১) এই যুদ্ধ যে স্থানে সংঘটন হয় তাহার নাম হয় ফতেজঙ্গপুর। উহা অধুনা মাদারীপুর সবডিভিসনের অধীন একটি পরগণা, অন্য নাম ফতেপুর।

(২) দীঘলবালা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্যের যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের তায়দাদে যাহা মুকুন্দরায় কৃত নিষ্কর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া হয়।

(৩) গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের ১৯৩৩ নং তায়দাদে যশোহরের কালেক্টরীতে যাহা শত্রুজিৎ রায় প্রদত্ত নিষ্কর বলিয়া দেখা যায়।

বংশধরেরা কিছুকাল ভুষণার ঢালী সৈন্যের নায়ক ছিলেন। শত্রুজিৎ রায় স্বীয় নামে এক স্থান নির্দ্দেশ করেন (১)। সীতারাম রায়ের মৃত্যুর পর শত্রুজিতের বংশধরেরা তথায় যাইয়া বাসস্থান সংস্থাপন করেন। ভূষণা পরে সংগ্রাম সাহের হস্তগত হয়। মুকুন্দ রায়ের সময় হইতেই, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিলী, মালী, কর্ম্মকার প্রভৃতি মধ্যে ভূষণা পঠী বলিয়া একটা সমাজের উদ্ভব হয়। এই সময়ে ফতেয়াবাদের স্থপতিরাও শিল্পকার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফজল গাজী ও চাঁদ গাজী

বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু যখন ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করে, ভাওয়ালের পরিচয়ও তৎসময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবাদ আছে পালবংশীয় অনেক রাজা ভাওয়ালে বাস করিতেন। পূর্ব্বে ভাওয়াল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরে পাল রাজাদের সময় হইতে উহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত হয়। ভাওয়ালের একাংশ রণ-ভাওয়াল নামে পরিচিত। অবশ্যই এই স্থানে এক সময়ে কোন প্রসিদ্ধ রণাভিনয় হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ, কামরূপাধিপতির সহিত পাল রাজাদের রণ হইতেই এই নামের উৎপত্তি

(১) যশোহর জেলার অন্তর্গত শত্রুজিৎপুর।

হইয়া থাকিবে। রণ-ভাওয়ালের তিনটি স্থানে তিনটি রাজবাড়ীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কাপাশিয়া থানার চারি মাইল পশ্চিমে শিশুপাল রাজার আবাস ছিল। ধলেশ্বরী নদীতীরে সাভার (১) গ্রামে এখনও হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয়। তেলিপাবাদ পরগণার তরাগ নদীতটে যশঃ পাল রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল রাজারা বঙ্গীয় পাল রাজবংশের শাখা বলিয়াই অনুমিত হয়।

সম্ভবতঃ শেষ পাল-রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গাজীবংশ ভাওয়ালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটি পরগণার শাসনভার গাজী বংশের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা পালোয়ান সাহ নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৫৭০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান গাজী বংশের উনবিংশ পুরুষ পূর্ব্বে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)।

প্রচলিত কিংবদন্তি হইতে ইহাই অনুমোদিত হয় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড়ের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ বিজয় সাধারণতঃ ধর্ম্মোন্মত্ত অস্ত্রধারী মুসলমানগণ দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া দিল্লির দরবার কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াও এই যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

(১) ভাওয়ালের পশ্চিম সীমায় সাভারের নিকট ধামরাই গ্রামে যশঃ মাধবের মন্দির আছে। লোক প্রবাদানুসারে জানা যায়, এই মূর্ত্তি বহুকাল পূর্ব্বে যশঃ পাল রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি নিমকাষ্ঠে নির্ম্মিত, নীল বর্ণে চিত্রিত, সাধারণতঃ উহা মাধব নামে পরিচিত। অদ্যাপি রথযাত্রার সময় ধামরায়ের মাধববাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

(২) বর্ত্তমান সময়ে তদপেক্ষা অধিক পুরুষ হইয়া থাকিবে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পালওয়ান সাহ এই দুর্দ্দান্ত ধর্ম্মোন্মত্ত দলের অধিনায়ক বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ছিলেন। তৎ-পুত্র কায়াম খাঁ সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা শুনা যায় যে, দিল্লীতে অবস্থান কালে বুদ্ধিকৌশলেই হউক অথবা দৈববলেই হউক একটা ভগ্ন প্রাসাদের ছাদ, যাহা স্থপতিরা বহু চেষ্টাতেও সম্যক মিলাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তৎকর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এজন্য বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কায়াম খাঁ সাহেব ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বাদ-সাহকে জানান যে, অর্থ লইয়া বঙ্গদেশে গমন করা সহজ কার্য্য বা নিরাপদের বিষয় নহে, তবে যদি তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য বাদসাহ যথার্থই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ভাওয়াল পরগণা দান করিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হইবে। বাদসাহ সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ভাওয়াল গরগণা প্রদানের অনুজ্ঞা পত্র লিখিয়া দেন।

দানপত্র প্রস্তুত হইবার সময় আর একটি বিষয়ের অবতারণা হইল যে, ঐ দলিল কাহার নামে সম্পাদিত হইবে। তৎসময় পর্যান্ত কায়াম খাঁ বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তিনি বাদসাহকে জানাইলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে অষ্টাদশটী পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইবে "বড়গাজী" অতএব দানপত্র এই বড়গাজীর নামেই প্রস্তুত হউক। পালোয়ান সাহেবের পুত্র কায়ম খাঁ সাহেব তৎপর ঐ দানপত্র লইয়া ভাওয়াল আগমন করেন, পরে লক্ষা নদীর তীরে চৌয়ার নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন।

কায়াম খাঁ সাহেবের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে বাহাদুর গাজী নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার-ভ্রাতা মাতাব গাজী ভাওয়ালের আধিপত্য গ্রহণ করেন।

মানসিংহ যখন, ইশা খাঁর বংশধর ও কেদার রায়কে দমন জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন তৎসময় মাতাবগাজী ও তাঁহার পুত্র ফজল গাজী বর্ত্তমান ছিলেন। আকবর নামা পাঠে এই মাত্র জানা যায় যে বিদ্রোহী পক্ষের সৈন্যগণ পলায়ন করিলে ভাওয়ালের বিদ্রোহী গজনবি (গাজী) মানসিংহের আধীপত্য স্বীকার করেন * (১৬০২ খ্রীঃ)।

ইতিহাসে ফজল গাজী সম্বন্ধে অধিক কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদসাহের বাধ্য হইয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার আর কোনও গোলযোগ উপস্থিত করেন নাই। ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট এখন কয়েক খানা প্রাচীন দলিল আছে, কিন্তু সেগুলি কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। প্রথম দলিল দৌলত গাজীর সম্বন্ধে। সাহ সুজা উক্ত গাজীকে ভাওয়ালের জমিদার স্বীকার করিয়া তৎপ্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁনের প্রতি আদেশ পত্র প্রচার করেন। দ্বিতীয় দলিল ভাওয়ালের রাজস্ব সম্বন্ধে। ঐ পরগণার তৎসময়ের রাজস্ব ৪৮৩০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। ঔরঙ্গজীব বাদসাহের রাজত্বাবসানে যে প্রবল অরাজকতায় দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিল, তৎসময় গাজী বংশধরেরও নানারূপ ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া আপনাদের অধঃপতনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দৌলত গাজী রাজস্ব প্রদানে বিরত হওয়ায় ঢাকার নবাব তাঁহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেন। তৎপর দৌলত মুর্শিদাবাদ নিজামত আদালতে আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ কুশধ্বজ রায় তাঁহার উকীল বা মোক্তার হইয়া যথেষ্ট আয়াস স্বীকারে মোকর্দ্দমা চালাইয়া গাজীর পক্ষে জয় লাভ

* আকবর নামা, ইলিয়ট, ৬ ভলুম, ১০৬ পৃঃ।

করিয়াছিলেন। গাজী এজন্য যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কুশধ্বজ রায়কে আপন জমিদারীর প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিয়া ভাওয়াল লইয়া আইসেন। গাছার ও পলাশনার ভূম্যধিকারীগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সময় গাজীর সরকারে নিযুক্ত হন।

কিছুদিন পরে কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বলরাম রায় (অপর নাম জানকীনাথ রায়) গাজীদের দেওয়ান হইলেন। বলরাম রায় ও গাছার ঘোষ মহাশয়েরা ও খরচ-সেরেস্তার মোহরের পলাশনার রায় মহাশয় একত্রিত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও ব্যসনাশক্ত গাজীগণের পরিবর্ত্তে ক্রমে জমিদারি আপন আপন নামে চালাইতে আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বিরহিত কর্ম্মচারীগণই পরে ভাওয়ালের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে সুলতান গাজী লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিকট বিষয় পুনরুদ্ধার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে গাজীর বংশধরেরা নিকটবর্ত্তী মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট কৃপা প্রার্থী হইয়া অতি দীনভাবে বাস করিতেছেন। চৌরায়ে এখনও পালোয়ান সাহ ও কায়াম সাহেবের কবর দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত সমাধির নিকট এখনও একটি ধ্বংস মুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বর্ত্তমান আছে। মসজিদের এক মাইল পশ্চিমে আর একটি সমাধি-মন্দির আছে। উহা প্রাচীর বেষ্ঠিত। কোশাখালী নামে আর একটি শুষ্ক সরিৎ আছে, উহাতে যুদ্ধতরী সকল থাকিত। লক্ষার সন্নিহিত আধুনিক বালীগাঁর নিকট মাতাব গাজীর পিতা বাহাদুর গাজী নির্ম্মিত একটি সুন্দর মসজিদ ছিল। উহা পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তরলিপি অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে। গাজীদিগের অধীনে বহু তালুকদার ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি

আছে। গাজী বংশের বিবরণ আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান জমিদারগণের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের আর কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক।

চাঁদ গাজীকে ভাওয়ালের গাজীবংশেরই এক শাখা বলিয়া জানা যায়। * তাঁহার নামানুসারেই পরগণাটির নাম চাঁদপ্রতাপ হইয়াছে। আরও প্রবাদ যে তাঁহার ভ্রাতা সেলিমের নামানুসারে সেলিমপ্রতাপ পরগণা এবং সুলতানের নামানুসারে সুলতানপ্রতাপ পরগণার নামকরণ হয়।

আইন-ই-আকবরীতে জানা যায় যে, চাঁদপ্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ সরকার বাজুহারের অন্তর্গত ছিল। সেলিমপ্রতাপ বাজু, সুলতানপ্রতাপ বাজু এবং চাঁদপ্রতাপ বাজুর কর একত্রে মোট ধার্য্য হয় ৪৬২৫৪৭৫ দাম। এই তিন পরগণার কর একত্র ধার্য্য নিবন্ধন বোধ হয় উহা একই ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি ছিল। পরে তিন ভ্রাতার নামে তিনটি পরগণার সৃষ্টি হয়।

প্রবাদ এই যে চাঁদগাজীর পিতা দেলওয়ার খাঁ, প্রথম ঐ প্রদেশে আগমন করেন। তথায় আসিবার সময় বর্ত্তমান জায়গীর বন্দরের কিছু উত্তরাংশে ধলেশ্বরীর পশ্চিমপারে মেঘশিমূল নামক স্থানে আসিয়া প্রথম উপস্থিত হন। নদীমধ্যে যখন নৌকা চলিতেছিল, তৎসময় ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ দেখিয়া একটি শিমূলগাছে তাঁহারা নৌকা বন্ধন করেন, তাহাতেই ঐ স্থানের নাম হয় মেঘশিমূলিয়া। দেলওয়ার উহার নিকট বাসস্থান স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। উহাকে সাধারণ লোকে রাজবাড়ী বলিত। ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাতে মেঘশিমূলিয়া ও রাজবাড়ী উভয় স্থানই ভগ্ন হইয়া পুনরায় নূতন চড়াতে পরিণত হইয়াছে।

* এসিয়াটীক জারনেল, ৪৩ সংখ্যা।

ভাওয়ালের গাজীবংশ যে সময় মোগল বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তৎসময় ইহারাও এই পন্থা অবলম্বন করেন।

চাঁদগাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার জাতি সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানা যায় না। এ দেশে ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা সন্দর্শন করিয়া তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। পরে ব্যসনাসক্ত গাজীবংশের বিষয়কর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। পরিণামে সঞ্জয়ের বংশধরেরাই গাজী-বংশের জমিদারী হস্তগত করিয়া পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

যোড়শ অধ্যায়

লক্ষ্মণ মাণিক্য

ভুলুয়া অবস্থিতি কালে, রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহার কতিপয় সারাংশ পাঠকগণের অবগতি জন্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গীয় যে দ্বাদশ জন ভৌমিক আকবর বাদসাহের সমকালে অভ্যুদিত হইয়া বঙ্গে স্বাধীনতার ধ্বজা প্রোথিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মহাত্মা লক্ষ্মণ মাণিক্য তাহার অন্যতম। মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া প্রদেশে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। অধুনা তাহা নোয়াখালি জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন ই আকবরী গ্রন্থে উহার 'বালাজোয়ার' নাম দৃষ্ট হয়। ঐ জোয়ার সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত একটি মহাল ছিল। উহার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১৩৩০৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৬২ টাকা। 'বালা' শব্দটি 'ভুলুয়ার' অপভ্রংশ হইবে। নোয়াখালির ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী স্থানগুলি পূর্ব্বে ভাটি নামে অভিহিত হইত। প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর অতীত হইল, নোয়াখালির অন্তর্গত বাবুপুরের চৌধুরীদের একটা দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া, 'চৌধুরীর লড়াই' নামে যে একখানা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত চৌধুরীরা আপনাদের সম্পত্তির গৌরব উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের মতন জমিদার আর ভাটির বাঙ্গালায় নাই।" এই বাবুপুর ভুলুয়ার এক অংশ। অতএব আইন ই আকবরীর বালাজোয়ার ও ভাটি এবং আধুনিক ভুলুয়া প্রভৃতি দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি যে একই, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ত্রিপুরা ও সমতট বঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলি সাগরশাখামধ্যে নিমজ্জিত ছিল। পরে জল সরিয়া পড়ায় উহা চরাতে এবং তৎপশ্চাৎ জননিবাসে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপের উদ্ভব সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর শর্ম্মার ও দনুজমর্দ্দন রায়ের যেরূপ একটা কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে, ভুলুয়ার উদ্ভব সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। আমরা উহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রবাদ যে, মিথিলানিবাসী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব আদিশূরবংশীয় বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথ তীর্থ সন্দর্শন মানসে স্বজনগণ সহ নৌকারোহণে তথায় যাইতেছিলেন। মেঘনা নদী অতিক্রম করিবার সময় নদীমধ্যেই তাঁহাদের একরাত্রি যাপন করিতে হয়। কূল কিনারা না পাইয়া তাঁহারা

ভয়ে অভিভূত হয়েন ও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে থাকেন। যখন ত্রিযামা অতীতপ্রায়া, সেই সময়ে শূর মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হয়। তদবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান যে, এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তোমার আর ভয়ের কারণ নাই। এই যে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বিভাবরী অবসানের সহিত উহাও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তোমার এই বৃহৎ যান মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে পর, সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে খনন করিও, তবেই আমার বারাহী মূর্ত্তির অনুরূপ এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। উহা উত্তোলন করিয়া যদি এই স্থানে সংস্থাপিত কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই এই স্থানের অধিপতি হইবে, এবং বহুপুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশধরেরা এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। অন্যথা আমার কথা অবহেলা করিয়া যদি প্রস্থান করিতে চাহ, তাহা হইলে কখনই সফলকাম হইতে পারিবে না।" দেবীর অন্তর্দ্ধানের সহিত শূর মহাশয়েরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ইষ্টনাম স্মরণানন্তর তিনি স্বপ্নের যাবতীয় বিবরণ সঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ নিকটে বলিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে সকলে 'শুভ শুভ' বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশা অবসান হইয়া গেল। এই সময়ে দৃষ্ট হইল যে, বহু দূর পর্য্যন্ত স্থল ব্যতীত জল বিদ্যমান নাই। বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, নৌকা চড়ায় সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূচনাতেই স্বপ্নের সত্যতা লক্ষ্য করিয়া মৃত্তিকা খনন করা আরম্ভ হইল। কিছু দূর খুঁড়িতেই তন্মধ্য হইতে এক পাষাণময়ী প্রতিমা উত্থিতা হইলেন। সকলেই আনন্দে মাতিয়া গেল। ঠিক হইল যে, ঐ দিবসেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যে দিবস প্রতিমা সংস্থাপন করা হইল, ঐ দিবস দিনমণি একবারও

উদিত হইলেন না। নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পরদিন যখন সুপ্রভাতে সূর্য্যদেব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া গগনে সমুদিত হইলেন, তখন দেখা গেল যে, দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া, শূর মহাশয় ঐ স্থানের নাম রাখিলেন, "ভুলুয়া" (ভুল-হুয়া হইতেই ভুলুয়া নামের উৎপত্তি, এইরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে)। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রদেশের পূর্ব্বাধিপতিকে অল্প পরিমিত স্থান বলিয়া ভুলাইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আধিপত্য লাভ করায়, উহার নাম করা হয় 'ভুলুয়া'। বাস্তবিক গল্পাংশে প্রথমটিই মনোরম এবং সমীচীন বোধ হয়।

রাজা আদিশূরবংশীয় এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের জন্ম হয়। এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিখিত হইল, ইনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি বৈদ্যজাতীয় আদিশূর নহেন। ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। পরে তদ্বংশীয়েরা কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের তিন কি চারি পুরুষ অন্তর রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত আদান প্রদান সম্পাদন সুকঠিন বিবেচনায়, লক্ষ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলন লাভের প্রয়াস পান। এই সময়ে গাভার ঘোষবংশের পূর্ব্ব পুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়াকে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে পর, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাঁহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতা সহ স্বদেশ

পার ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণ মাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হইলেন।° তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চারিজন দলপতি ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষনার মুকুন্দ রায়, ইঁহারা স্ব স্ব সমাজের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারিজন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, সকলেই তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের বাড়ীতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দলবল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করিলেন না। এই নিমিত্ত রাজগণের আদেশে ঘটকগণ এই উদ্ধৃত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করিলেন, যথা—

"বেজগ্রামস্থিতাঃ সর্ব্বে
যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনীচাকুলীমেব
নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ॥

এইরূপে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী, চাকুলী গ্রামবাসীরা, কুলভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। অপরদিকে ভূষণা সমাজের অন্তর্গত উজানীর রাজবংশও এইরূপ জাত্যন্তর হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। তেলিহাটী ও ভুলুয়ার এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ঘটক মহাশয়গণ দ্বারা অপর এক একটি শ্লোক বিরচিত হয়। যথা—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাসু তদুত্তরে॥

কায়স্থাঃ অত্র বৈনস্তাঃ (?) ভিন্নদেশনিবাসিনাম্।
ভুলুয়াত্তেলিহাটীয়ৌ শূরাদিত্যৌ প্রশস্তকৌ॥

অপি চ

সিংহগ্রামে স্থিতঃ সিংহঃ শিথায়ে গুহকক্ষীশঃ (?)।
ভুলুয়ায়াং তেলিহট্টে শূরাদিত্যৌ নৃপাবুভৌ॥

ভুলুয়ার রাজারা শূর বংশীয় এবং ফরিদপুরান্তর্গত তেলিহাটী পরগণার মধ্যবর্ত্তী উজানীর রাজগণ আদিত্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা পরে বিভিন্ন সমাজ হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই রাজগণ যে কোন্ জাতি বা কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের রাজত্বের সময়ে আরাকানের মগেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরস্থিত স্থানগুলিকে মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎস্থানীয় হিন্দুরা এই সময়ে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাবিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করিত। অধিকাংশ স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। মহাত্মা মিঃ গ্রাণ্ট বলেন যে, ১৫৪৮ খ্রীঃ অব্দের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিশেষতঃ মগদের দৌরাত্ম্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম হইতে শেষোক্ত কারণটী সমধিক ভয়ানক বলিতে হইবে। তৎকালে যাহারা ঐ সকল বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে কোনরূপে বাস করিত, তাহারা ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণের নিকট জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি আরাকানের মগেরা এই সময়ে যাহাদের বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাইত, সর্ব্বসাধারণে তাহাদিগকেও জাতিচ্যুত মনে করিয়া 'মগীয়' অপবাদ দিতে লাগিল। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে বহু 'মগীয়' তিলি, বারুই, কামার প্রভৃতি

উপাধিযুক্ত দলের সৃষ্টি হয়। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া মগদিগের অত্যাচারের পরাকাষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

সন্দীপ আক্রমণ করিয়া আরাকানীরা অধিকার করিয়া লয়। পরে ভুলুয়ায় আপতিত হইয়া উহাও লুণ্ঠন করিতে থাকে। লক্ষ্মণ মাণিক্য দুই তিনবার আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন, কিন্তু পরে রাজার গৃহশত্রু কর্ত্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আরাকানরাজ ভুলুয়ার রাজাকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই শত্রু আর কেহই নহেন, লক্ষ্মণ মাণিক্যেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাপিষ্ঠ রাজানুজ রাজ্য-লোভে অভিভূত হইয়া, আরাকানরাজের সহায়তা প্রার্থনা করে। সুযোগ পাইয়া আরাকানরাজ গৃহবিচ্ছেদে ব্যতিব্যস্ত লক্ষ্মণ মাণিক্যকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য অনন্যোপায় হইয়া খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ ই আলির সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঈশা খাঁ বারভূঞাদলের অন্যতম। খিজিরপুর তাঁহার বাসস্থান ছিল। একবার রাজা মানসিংহ, বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া খিজিরপুর অবরোধ করেন। পরে তাঁহার বীরত্ব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পরাজিত ঈশা খাঁকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার বীরত্বের কথা ও কতিপয় মহত্ত্বের বিষয় বাদসাহকে অবগত করান। গুণগ্রাহী আকবর সাহ সন্তুষ্ট হইয়া ঈশা খাঁকে মুক্তি প্রদান করিয়া সোণারগাঁয়ের শাসনভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ, বাদসাহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এই কারণে অন্যান্য বারভূঞা দলপতির সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিয়াছিল। লক্ষ্মণ মাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদসাহের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

ঈশা খাঁ আরাকানবাসিগণের এই সকল দৌরাত্ম্যের বিবরণ

বাদসাহকে লিখিয়া পাঠান। আকবর সাহ উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালার তৎকালীন সেনাপতিকে আদেশ প্রেরণ করেন। যদিও বরিভূঞা দলের নেতারা বাদসাহের প্রতিকূলাচারী ছিলেন, তথাপি এই সময়ে তাঁহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কারণ, মগের দৌরাত্ম্য সকলের রাজ্যমধ্যেই সমভাবে প্রসারিত হয়। এই জন্য উহাদের উচ্ছেদ সাধন করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাদসাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় সমুদয় ভূম্যধিকারীগণকে তাঁহার সহায়তা জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। সাধারণের শত্রু মগদিগকে উচ্ছেদ করিতে কাহারও কোন আপত্তি রহিল না। জমিদারগণ সকলেই বাদসাহ সেনাপতির সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

মোগলবাহিনী সমবেত হইয়া মগদিগের অন্যতর কেল্লা 'সহর কসবা' আক্রমণ করিল। এই স্থান ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত। অধুনা 'হুদা ভুলুয়া' নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মণ মাণিক্য তাড়িত হইলে পরে, ঐ স্থানেই আরাকানীরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মোগল সেনাপতির সহিত ঐ স্থানে মগদিগের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বারভূঞাদল পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া মোগলপক্ষের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সমবেত সৈন্যদলের নিকট আরাকানীরা পরাজিত হইয়া, সন্দ্বীপের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভুলুয়াতে তাহাদের আর কোন আধিপত্য রহিল না।

ভুলুয়ায় অবস্থিতি সময়ে, আমি এই 'সহর কসবায়' বহুদিন বাস করিয়াছি। ঐ যুদ্ধের নিদর্শনযোগ্য কতিপয় উপকরণও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কামান, ঐ যুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ আজিও তথায় প্রোথিত দেখা যায়। শুনিলাম, আরও তিন চারিটি কামান ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা খনন করিলে তন্মধ্য হইতে গোলাগুলি

প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটি গুলি আমি দেখিয়াছি। উহা মৃত্তিকানির্ম্মিত, কিন্তু অগ্নিতাপে বিশেষ দৃঢ়ীভূত করা। তত্রত্য মুসলমানেরা বলিল, এই গুলি 'গুলাল বাঁশে' ব্যবহৃত হইত। তৎকালে বন্দুক, কামান অপেক্ষা, তীর ও গুলাল বাঁশের সমধিক প্রচলন ছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মুসলমান জায়গিরদার ও পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টীয়ান আজিও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছেন। যে সকল সৈনিকেরা এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিল এবং যুদ্ধান্তে প্রত্যাগমন না করিয়া মগদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তথায় অবস্থান করিয়াছিল, তাহাদিগকে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়। ঐ সম্পত্তি 'খোসবাস' নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জায়গিরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তদবধি ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর কোন রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই। উহা নিষ্কর চলিয়া আসিতেছে।

মোগলসেনার সহিত নবী সাহেব নামে একজন ফকির বা গাজী এই যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধান্তে ঐ ফকির আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তিনি তথায় এক দরগা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। উহা আজ অবধিও নবী সাহেবের দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর নবী সাহেবের পদচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ মাণিক্য তথায় একটি দীর্ঘিকা খনন ও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সহর কসবায় ঐ সকল দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন ইষ্টদেবী বারাহী দেবীর প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই দেবীমূর্ত্তিই বিশ্বম্ভর শূর ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হন এবং ইঁহার স্বপ্নাদেশেই তিনি ভুলুয়াতে রাজ্য

সংস্থাপন করেন। বারাহী দেবী অধুনা আমিশাপাড়া গ্রামে রাজ-পুরোহিতগণের বাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার চারি হাত, তিন মুণ্ড এবং বাহন বরাহ। ঐ রাজপুরোহিতেরা যে ধ্যান পাঠ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বারাহীং চাষ্টভুজাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাম্।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণং মধ্যে শ্রীবদনাম্বুজাম্॥
দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকম্।
বরাহবাহিনীমাদ্যাং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

পূজক মহাশয়েরা যেরূপ বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু ধ্যানটি বড়ই অশুদ্ধ। দেবীর আট হাতের মধ্যে মাত্র চারি হাত বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন শ্লোকে ছন্দের দোষ আছে, তাহাতে 'দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা' প্রভৃতির অর্থও অবোধ্য। যদি কেহ বারাহীদেবীর বিশুদ্ধ ধ্যান অবগত থাকেন, তবে ঐ পুরোহিতদিগকে জানাইলে, তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের গুরু ও পুরোহিতের বংশধরেরা সকলেই আপনা-দিগকে মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। চৌপল্লী, বাবুপুর প্রভৃতি স্থানের গুরুবংশ ও আমিশাপাড়ার পুরোহিতেরা অদ্যাপি প্রচুর ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান জমিদারেরা উহার অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাতে কর ধার্য্য করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া ভুলুয়াতে সংস্থাপন করেন। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্ব তট পাণ্ডববর্জ্জিত স্থান বলিয়া পরিচিত। সেই স্থানে সমাজ সংস্থাপিত করিয়া সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর সমাবেশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে, ভুলুয়াধিপতি যে বিবাহ-সভায় অন্যান্য কায়স্থ সমাজ-পতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সভায় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয়। বাকলাধিপতি রামচন্দ্র তৎকালে বালক থাকিলেও তাঁহার ধারণা ছিল যে, সমাজ মধ্যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতিই সকলের শীর্ষস্থানীয়। এইস্থলে প্রতাপাদিত্যকে অধিক সম্মান করায়, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরেও কোন কোন ঘটনায় ভুলুয়ারাজ রামচন্দ্রকে বালক বলিয়া ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। এই সকল কারণে আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদানার্থ চন্দ্রদ্বীপরাজ, লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, সহসা কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভুলুয়া আক্রমণ করেন।

অচিরে এই কথা ভুলুয়ারাজ জানিতে পারিয়া, ক্রোধে অধীর হইলেন ও 'বালক' রামচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার রণতরীর উদ্দেশে কতিপয় সৈনিক সহিত, যাত্রা করিলেন। এইরূপ উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ অন্যের সাহায্য লওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া স্বয়ং বাকলার রণতরীর নিকটবর্ত্তী হন এবং রামচন্দ্রকে ধৃত করিবার জন্য যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া বিপক্ষের রণযানে পতিত হইলেন, অমনি প্রচণ্ড বলশালী রামচন্দ্র তাঁহাকে ধৃত করিয়া নৌকার নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। ভুলুয়ারাজ এইরূপে ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইলেন। রামচন্দ্র শত্রুকে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ রাজ্য আর আক্রমণ না করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার মাতা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে এই বীরবিনাশনরূপ পাপানুষ্ঠান হইতে

বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

কোন এক সময়ে লক্ষ্মণ মাণিক্যের বীরত্বের পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে উপস্থিত করা হইলে তাঁহাকে শৃঙ্খলচ্যুত করা হয়। এই সুযোগে লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপাধিপতির দেহরক্ষকেরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া ফেলে। এই সংবাদ রাজা রামচন্দ্রের মাতা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, তিনি আরাকানের মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়া লোকান্তরিত হন। আমাদের বিশ্বাস, এটি প্রবাদ নয়, সত্য ঘটনা। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া বারভূঞাদল মগদিগের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপে যে লোকবিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর বীর-জীবনের শেষ পরিচয় প্রদান করেন, যুদ্ধবীর লক্ষ্মণ মাণিক্য সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে অব্যবস্থিতচিত্ত চপল বালকের ন্যায় ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইয়াছিলেন না, তাহা নিশ্চয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

দেব বংশের রাজত্ব অবসান হইলে, রাজা জয়দেব দেবের দৌহিত্র প্রেমানন্দ বসু বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন মতে জয়দেব দেবের নাম একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণবল্লভ দের কন্যা কমলার গর্ভজাত বলিয়া তাহারা প্রেমানন্দ বসুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রেমানন্দ যে দেববংশের পরবর্ত্তী রাজা, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মতই বলিতে হইবে।

বাকলাতে দেববংশের রাজত্ব স্থাপনাবধি ঐ স্থান বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হইয়া দাঁড়ায়। ঘোষ, বসু ও গুহ, এই কুলীনগণ রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। দেববংশের রাজত্বকালে তাঁহারা সসম্মানে বাস করিতেছিলেন। রাজা বংশ মর্য্যাদায় ন্যূন হওয়া প্রযুক্ত কুলীনদিগকে বিশেষ মান্য করিয়া চলিতেন, কুলীনেরাও রাজাকে রাজোচিত সম্মান দান করিয়া সমাজপতিপদে বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে বসু কুলীনবংশই চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সে সময় কিন্তু অন্যান্য কুলীনেরা বড়ই চিন্তা ও সমস্যায় পতিত হইলেন। মনুষ্য সকলই সহিতে পারে. কিন্তু সমকক্ষ লোকের নিকট কদাপি ন্যূন হইয়া থাকিতে চাহে না। নীচ বংশকে বরং উচ্চ আসন দিয়া তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকা যায়, তথাপি আপনার জ্ঞাতি, সমকক্ষ বা সমমর্য্যাদাশালীর নিকট কখনও কেহ অবনত হইতে চাহে না। কথায় বলে—

"অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।"

বসুবংশ রাজা হইলে সেইরূপই হইয়া পড়িল।

পরমানন্দ বসুর রাজত্বকালে সমাজ সমীকরণ লইয়া গোলযোগ হয়। কুলীনেরা বিবাহাদি কার্য্যে যেরূপ রাজার অনুমতি লইত, বসু রাজার নিকট তাহারা সেইরূপ অনুমতি লইতে অস্বীকৃত হয়। এই কারণে রাজা কুলীনদিগকে নানারূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। যাহারা উহা সহ্য করিতে পারিল তাহারা রাজার আজ্ঞা মান্য করিয়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু বসুবংশীয় রাজার জ্ঞাতিগণ উহাতে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্য বংশ মধ্যে গুহবংশীয় রামচন্দ্র নিয়োগীও তৎপথাবলম্বী হইলেন। এই সময় বিক্রমপুরে আর একটি রাজবংশের অভ্যুদয় হওয়ায়, বসুবংশীয়েরা কেহ কেহ সেই রাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিক্রমপুরাধিপতি রায়-রাজগণ তখন সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভূবৃত্তি দান করিয়া স্থাপন করিলেন। গুহবংশীয়দের এক শাখাও বিক্রমপুরাধিপতির বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমপুরে বাস করিতে লাগিল। রামচন্দ্র নিয়োগী আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা পরিত্যাগপূর্ব্বক সপ্তগ্রামে প্রস্থান করিলেন। জন্মভূমি বিচ্যুতি ও দরিদ্রতানিবন্ধন রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পতিত হইলেন, কিন্তু যত দিন তাঁহার গ্রহ প্রতিকূল ছিল, তত দিন কোন মতে শত চেষ্টা করিয়াও কাহারও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না। পরে যে সময় ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন, সেই সময় শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক পদস্থ কায়স্থ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। পরে রামচন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের মধুরতা প্রভৃতি অবগত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কন্যা সম্প্রদানও করিয়াছিলেন। শ্বশুরের অনুগ্রহে ও

চেষ্টায় পরে রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় এক মোহরের পদে নিযুক্ত হন।

কালক্রমে রামচন্দ্র বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। এ সময় তাঁহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই বালকেরা পরে সপ্তগ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় কার্য্য গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার সহিত রামচন্দ্রের মতান্তর ঘটে। রামচন্দ্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত গৌড়ে প্রস্থান করেন। এই সময় নবাব জালালুদ্দীন অন্তিম শয্যায় শায়িত। তাঁহার শিশু পুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। রামচন্দ্র সুযোগক্রমে রাজসরকারে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই নবাবের দেহাবসান হয় ও তাঁহার পুত্র শত্রু হস্তে নিহত হন। তৎপর করাণী-বংশীয় সুলেমান ১৫৬৩ খ্রীঃ অঃ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সৌভাগ্যের আলোকচ্ছটায় এই সময় রামচন্দ্রের প্রতিভাকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া নূতন নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু রামের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় অধিক কাল তাঁহাকে আর নবাবের অনুগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। রামচন্দ্রের দেহাবসানে নবাব সুলেমান তাঁহার পুত্রদিগকে সদয় ভাবে গ্রহণ করিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময় ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবপুত্রের সহিত একই মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিত। এই সূত্রে নবাবপুত্র দায়ুদের সহিত তাহাদের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে।

পরে যে সময় দায়ুদ পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে প্রধান অমাত্যপদে

বরণ করিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় উপাধি প্রদান করেন। এ স্থলে বোধ হয়, শ্রীহরিকে বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভকে রাজা বসন্ত রায় ধরিয়া গুহ বংশের বনিয়াদ ঠিক করা হইয়া থাকিবে। অন্যথা নামের উপাধি আবার নাম হয়। উহার ভাব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে হিন্দু মাত্রেরই নামকরণ কালে দুইটি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, হয় ত বা ঐরূপ ভাবেই তাহাদের দুইটি নাম হইয়া থাকিবে।

দায়ুদের সহিত মোগলসম্রাট আকবরের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। দায়ুদ আপনার ধনবল ও জনবলের আধিক্য সন্দর্শনে একটি মোগল দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এই জন্য বাদশাহ তাহাকে দমন জন্য ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে সেনাপতি মুনেম খাঁ ও রাজা তোডর মল্লকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মোগল পক্ষের বিপুল বাহিনীর পরিচয় পাইয়া নবাব দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পরে যুদ্ধে নিজ পরাজয় দেখিয়া দায়ুদ মোগল সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সন্ধি করেন। তদনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহার বাদশাহের হস্তগত হয়। মুনেম খাঁ গৌড়ের রাজধানীতেই অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া উহাকে জনশূন্য করিয়া তুলে। মুনেম খাঁও গতায়ুঃ হন। দায়ুদ সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় বাঙ্গলা আক্রমণ করেন ও আগমহলের যুদ্ধে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ছদ্মবেশে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে যে সময় তোডরমল্ল বাঙ্গলা জরিপ করিয়া করসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ঐ দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব নবাবের সময়ের যাবতীয়

কাগজ পত্র বুঝাইয়া দেন। এজন্য তোডরমল্ল সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে পুনরায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কয়েকখানা পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন।

দায়ুদ যে সময় উড়িষ্যায় পলায়ন করেন, তৎকালে তাহার বহু মূল্যবান সম্পত্তি সকল অমাত্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। অমাত্যদ্বয় তখন গৌড় বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থান করা শুভকর নহে বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন (পরে যাহা যশোহর নামে খ্যাত হয়)। শিবানন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যশোহরে না যাইয়া পৈতৃক পূর্ব্ব স্থান বাকলাতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের রাজ্য পদ্মার দক্ষিণ ভাগীরথী হইতে ভৈরব, কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আসমুদ্র বঙ্গাংশ, অর্থাৎ হিন্দু রাজার আমলের বাগড়া বিভাগ, মুসলমান আমলের সপ্তগ্রাম ও যশোহর সরকার, ইংরাজের প্রথমামলের যশোহর ডিবিজান ও বর্ত্তমান কালের প্রেসিডেন্সী ডিবিজনভুক্ত ছিল। কালীঘাট তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত-ছিল, এবং সে সময় অরণ্যময় ছিল। কালীর প্রথম সেবক ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে রাজা বসন্ত রায় প্রথম কালীর ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কালীঘাট প্রকাশিত করিয়া, কালীর সেবা সৌকার্য্যার্থ, রাজা কালীঘাট গ্রাম গুরুকে দান করেন। (১) বর্ত্তমান কালে ভাগীরথীবক্ষে ইংরাজ প্রদত্ত কণ্ঠহার

(১) ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্রবংশসম্ভূত কালীর বর্ত্তমান সেবক হালদার মহাশয়েরা রাজা বসন্ত রায় প্রদত্ত সেই ব্রহ্মত্র অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন। যশোহর রাজবংশের পতন সহকারে যখন কালীঘাট অঞ্চল সাবর্ণ চৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তখন সেই প্রসিদ্ধ রাজন্যবংশকৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ সৃষ্টি হইয়াছিল : বঙ্গীয় সমাজ, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

রূপী যে জুবিলী সেতু শোভমান আছে, সেই সেতুর পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী বর্ত্তমান হুগলী নগরের পরপারস্থিত নৈহাটি গ্রামে যশোহর রাজবংশের গঙ্গাবাসের বাটী ছিল ও তথায় অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা জিলার ডায়মণ্ডহারবার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রামে বসন্ত রায়ের অপর গঙ্গাবাসের বাড়ী ছিল। এইক্ষণ সুন্দরবন মধ্যে নানা স্থানে যশোহর রাজবংশের বহুতর কীর্ত্তিকলাপ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান আছে। ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ তোরণ, প্রাচীর ও গড় সহ প্রাচীন যশোহর নগর হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ ভীমা অটবীরূপে বিদ্যমান আছে এবং নৌকাবক্ষ হইতে তদ্দর্শনে বঙ্গবাসীর হৃদয় এখনও পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি সহকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে। এইরূপ চব্বিশপরগণা ও খুলনা জিলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের বহুতর স্থানে এইক্ষণ পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য উপলক্ষে বহুতর প্রস্তরময় কড়ি কাষ্ঠ ও জানালা দরজাদি বিশিষ্ট মন্দির ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত সৌধাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে মোগলাধিকারের মধ্যকালে, বর্ত্তমান শ্বাপদসঙ্কুল, জনসমাগম পরিশূন্য, অস্বাস্থ্যকর লবণাম্বু জলাভূমিবিশিষ্ট অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন সুন্দরবন অঞ্চল বহুতর জনপদে সমালঙ্কৃত ছিল।

বোধ হয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সুন্দরবনের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রভাবে, বহুতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তদিতর জাতীয়গণ, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়া বিত্তলাভ সহকারে বঙ্গের এই অংশে বাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্বতটবাসী বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজা বসন্ত রায়ের প্রভাবে তথায় স্থাপিত

হইয়াছিলেন। (১) এই সময় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিতামহ রামচন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপাধিপতির সহিত সামাজিক বিষয়ে বিবাদ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করেন। এখন সেই সমাজে যাহাতে চন্দ্রদ্বীপ-রাজ সম্যক প্রভুত্ব পরিচালন না করিতে পারেন, তৎপ্রতিকারে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিপতি হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ বলীয়ান হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা যে তৎসময় ফলবতী হইবে, তৎবিষয়ে আর সন্দেহ কি ? যাহাতে কুলীন কায়স্থেরা আপনাদের বংশ বিশুদ্ধ রাখিয়া আদান প্রদান করিতে পারেন ও নীচ সংসর্গ সংস্পৃষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিল। এই সময়ের পূর্ব্বে বাকলা সমাজ ভিন্ন বিক্রমপুর ও ভূষণা বা ফতেয়াবাদ নামক আরও দুই সমাজ পৃথক সৃষ্টি হইয়া দুটি রাজবংশের সাহায্যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। যশোহরাধিপতিরা ভিন্ন সমাজ সৃজনের মানস করিয়া উহার সফলতাও লাভ করিতে পারিলেন। বিভিন্ন সমাজ হইতে নানা সম্প্রদায়ী কুলীনেরা সমাগত হইয়া যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। রাজারা তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বসন্ত রায় কর্ত্তৃক যদুনন্দন বসু বিক্রমপুর পরগণা হইতে এবং তাঁহার জ্ঞাতি ভবানী দাস চৌধুরী বাকলা হইতে উঠিয়া আসিয়া যশোহরের অন্তর্গত মাঙ্গলপাড়া ও মাইহাটী নামক স্থানে সংস্থাপিত হন। এইরূপে বাকলা বিক্রমপুর ও ভূষণা সমাজ হইতে অনেকানেক

(১) বঙ্গীয় সমাজ, ১৪৩, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

কুলীন আসিয়া ক্রমে যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এই নব সংস্থাপিত সমাজের সমাজপতি পদে বিক্রমাদিত্য বরিত হইয়া বসন্ত রায়ের সাহায্যে সামাজিক শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য যথাক্রমে দুই বিবাহ করেন। প্রথমা উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যা, দ্বিতীয়া জগদানন্দ ঘোষের কন্যা। আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম পক্ষে প্রতাপাদিত্য ও দ্বিতীয় পক্ষে মুকুটমণি নামে দুইটি পুত্র হয়।

গৌড় নগরে প্রতাপের জন্ম হয়। তৎকালে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রাজামাত্য পদে বরিত থাকিয়া নিতান্ত যশের সহিত কাল কর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রবাদ শুনা যায় যে, প্রতাপ জন্মগ্রহণ করিয়াই বিকট শব্দে নিনাদ করিয়া উঠেন, তাহাতে রাজপরিবারস্থ সকলেই ভীত হন, পরে জ্যোতির্বিদেরা কোষ্ঠী-গণনাফলে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতাপ পিতৃঘাতী হইবে। এই সকল মনক্ষোভকর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিক্রমাদিত্য নবজাত শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত রায়ের ও স্বীয় বনিতার কাতরতায় অভিভূত হইয়া ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ইহাতে স্বভাবতঃ কুরুপতি দুর্য্যোধনের বিষয় মনে পড়ে, এবং পরে এই কায়স্থ রাজবংশও যে কুরুকুলের ন্যায় আত্মীয়, জ্ঞাতি, পুত্র কলত্রাদির রুধিরে উহার শেষ যবনিকা পাতিত করিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ক্রমে প্রতাপাদিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিকে যেমন তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি সঞ্চারের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর দিকে

আবার ঔদ্ধত্য, একগুয়ে প্রকৃতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ও তাঁহার প্রবৃত্তির অন্যতর উপকরণ স্বরূপ লক্ষিত হইতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য কোন মতেই পুত্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। পুত্রের মুখাবলোকনে কোথায় তাঁহার হৃদয়ে সন্তোষ উদ্ভাসিত হইয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে, তাহা না হইয়া তৎবিপরীত নানা অসন্তোষকর বিষয়ের নায়ক বিবেচনায় তিনি পুত্রকে বরং কুগ্রহবৎ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিদ্যা-বুদ্ধির কথঞ্চিত ন্যূনতা থাকিয়াও যদি প্রতাপ সচ্চরিত্রতার উচ্চ পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সস্নেহে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ রাখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পরে এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি পুত্রকে দূরতর প্রদেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বিদ্যাগবেষণার সহিত বহুদর্শিতা লাভ হইলে ভবিষ্যতে পুত্র নিজ হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কমনীয় প্রকৃতি হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া প্রতাপকে দূরদেশে রাখাই ঠিক হইল।

অচিরে উপযুক্ত লোক সহিত পিতৃনিদেশক্রমে প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

এ স্থলে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়, অপর একটি কারণ লিখিয়াছেন যে, প্রতাপ রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যব্যপদেশেই বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ স্থলে তদনুকূলে মত প্রদান করিতে পারি না।

১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—

দূরতর দেশে অবস্থান করিলে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধববিয়োগজনিত বেদনা তাঁহার (প্রতাপের) হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর করিয়া তাহার

স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিবে, বিবেচনা করিয়া, আগ্রাতে তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে, প্রতাপকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন।"

মানিলাম, জমিদারগণের রাজধানীতে, একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত অসম্ভব নয়, কারণ রাজ্যের যে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রাজধানীতে রাজসকাশেই হইয়া থাকে। কিন্তু কি কার্য্য উপলক্ষ করিয়া প্রতাপকে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখা যাউক। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আগরাতে রাজস্ব আদায় উপলক্ষ করিয়াই, প্রতাপ প্রেরিত হয়েন। যথা,—

"প্রতাপ যখন দেখিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত, তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, তাঁহাদিগের বার্ষিক দেয় কর প্রদান রহিত করিয়া দেন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা, সম্রাটের কর্ণগোচর হয়।"

অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, বোধ হয়, শাস্ত্রীকৃত গ্রন্থে, পাঠকমাত্রেই জানেন যে, প্রতাপ এই রাজস্ব বন্ধ করার কারণ, আপন পিতৃব্য বসন্তরায়ের স্কন্ধে চাপাইয়া, ও পিতা বিক্রমাদিত্যকে উদাসীন বানাইয়া পাকে প্রকারে, জমিদারিটা আপন হস্তে আনায়ন করেন। প্রতাপ ছলে বলে জমীদার হউন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু তৎসাময়িক বঙ্গীয় জমীদারগণ কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীতে কর প্রদান করিতেন, না তাঁহারা প্রদেশীয় নবাব বা দেওয়ানদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন, এই বিষয়টা দেখা আবশ্যক।

প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীতে রাজকর আদায় করিতে বরিত হন, তৎসময় মোগলকুলগৌরব আকবর সাহ দিল্লীর রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই বাদসাহের সমসাময়িক মহাত্মা আবুল ফজেল, তৎকৃত

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে, রাজস্ব আদায়ের বিধান সম্বন্ধে, যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"যখন পাতসাহ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আতমাদ খাঁ নামক একজন খোজা, রাজার এই সকল কার্য্যের সহায় ছিলেন। রাজার খাস মহল এবং জায়গীর জমি পৃথক রাখা হইল। যে যে মহলের রাজস্ব এক কোটী দাম, সেই সকল মহলের উপর একজন করিয়া তহশিলদার নিযুক্ত হইল। এই সকল মহলের পরগণার উপর একজন প্রধান কোষাধ্যক্ষ দারগা নিযুক্ত হইয়াছিল।"

দেখা গেল, তহশিলদার, কোষাধ্যক্ষ ও দারগা, ইহারা মহাল, পরগণা প্রভৃতির রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এখন দেখা যায়, তৎসময়ে বঙ্গদেশে কতটা মহাল ছিল ও কয়জন তহশিলদার থাকিয়া উহার আদায় তহশীল কার্য্য সম্পাদন করিত। তৎসময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশে ২২ বাইশটি সরকার নির্দ্দিষ্ট ছিল।* তন্মধ্যে যশোহর বা রসুলপুর সরকার খালিফেতাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই সরকারের মহালের সংখ্যা ৩৫, রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম, তন্মধ্যে যশোহরে (রসুলপুরে) ১৭২৩৫৬০ দাম অর্থাৎ ৪৩০৮৯ টাকা কর আদায় হইত। আমরা বুঝিলাম না, যশোহরের এই অল্প রাজস্ব হাবেলী খালিফেতাবাদের তহশিলদারের নিকট আদায় না করিয়া, কিজন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীর রাজকোষে দেওয়া হইত।

* ১ম টাণ্ডা, ২য় জেন্নেতাবাদ (গৌর), ৩য় ফতেহাবাদ, ৪ খালিফেতাবাদ, ৫ বাকলা, ৬ পূর্ণিমা, ৭ তাজপুর, ৮ ঘোড়াঘাট, ৯ পিঞ্জিরা, ১০ বারকাবাদ, ১১ বাজুহার, ১২ সোণারগাঁ, ১৩ সিলেট, ১৪ চট্টগ্রাম, ১৫ সেরিফাবাদ, ১৬ সলিমাবাদ, ১৭ সাতগাঁ, ১৮ মান্দারণ, ১৯ জলেশ্বর, ১০ ভদ্রক, ২১ কটক, ২২ কুলেনদণ্ডপৎ, এই বাইশটী সরকার।

২। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নানাদেশ হইতে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার প্রতাপের বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া, রাঢ়দেশীয় রাজন্যবর্গকে অধীনস্থ করেন।”

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকার হয়ত, তখন ইতিহাস লিখিবার অধিক সরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই জন্য সেই সময় ইতিহাস-পাঠানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে একটা উপকথা লিখিয়া, প্রবোধ দিয়া গিয়াছেন। তাহা বলিয়া এই গবেষণা পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার দিনে, সেই উপকথা প্রকাশ ও বক্তিগত অত্যুক্তিপূর্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া জন সমক্ষে প্রকাশ করা কতদূর সুসঙ্গত হইয়াছে তাহা কি আমাদের মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় একটুকুও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? তিনি যদি বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতেন, তবে উড়িষ্যা কেন, বঙ্গবিজেতা বলিয়াও প্রতাপের বর্ণনা করিতেন না। তবে “স্বাধীনতা-প্রয়াসী ও স্বদেশ বৎসল বলিয়াই প্রতাপের উপযুক্ত প্রশংসাবাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন। সেই গৌরবাত্মক কথা কয়েকটি বরং ঐ সকল অত্যুক্তি হইতে, অধিক উজ্জলতর থাকিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমধিক প্রতিফলিত হইত।

যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের পূর্ণ বিকাশ, তৎকালে বঙ্গদেশ মোগল-করতলগত। উহা বাইশ সরকারে বিভক্ত ও নবাবগণ দ্বারা শাসিত ছিল। বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা তখন সেই সকল শাসনকর্ত্তাদের অধীনে থাকিয়াই কালযাপন করিতেন। পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহাদের ছিল না। তন্মধ্যে মাত্র দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারী স্বদেশ-স্বাধীনতা-মন্ত্রে প্রণোদিত

হইয়া, জন্মভূমির উদ্ধার সাধনব্রতে কৃতসংকল্প হন। অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা নবাবকে পূর্ব্বে যেরূপ মান্য করিয়া চলিতেন, পরেও তদ্রূপই করিতেন, এই কারণেই অর্থাৎ সমুদয় জমিদারগণ একমতাবলম্বী না হওয়া প্রযুক্ত বিদ্রোহী জমীদারেরা অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হন। এস্থলে সমুদয় বঙ্গীয় রাজগণকে করায়ত্তকারী বলিয়া, প্রতাপাদিত্যকে অধিক বাড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? অবশ্য প্রতাপের বুদ্ধিবলে ও মন্ত্রণাগুণেই এই ভূঞাগণের পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্তু প্রথম সূত্রপাতের কারণ, মুসলমান পাঠানগণ।

৩। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ঈশার্খাঁ মসনদ আলি ও ঈশাখাঁ মছলন্দি, দুই ব্যক্তি ঠিক করিয়াছেন, উহা কোন্ ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, তাহা জানান উচিত ছিল। কিন্তু পুস্তকপাঠে হঠাৎ উভয়কে এক বলিয়াই ধারণা হয়।

৪। শাস্ত্রী মহাশয় ঈশাখাঁকে নিহত করিয়া উড়িষ্যায় তাঁহার কবর দিলেন, তৎপর প্রতাপ দ্বারা বিক্রমপুরাধিপতিকে দমন জন্য, পদ্মাপার পর্য্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিলেন, এবং একটা রণাভিনয় করিয়া চাঁদ ও কেদার রায় দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে কতকগুলি অনুনয় বিনয় করাইয়া, পরে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু এই কথাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতাপ কখনও যে রায় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বিক্রমপুরে সৈন্যপরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই মাত্র প্রথম শুনিলাম। যদি ইহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোনও তথ্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া লেখাই কর্ত্তব্য। অন্যথা এইরূপ কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৰ্দ্ধিত করা কোন ক্রমেও সুসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ মিত্রগণের সহিত শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন

করিতে যাওয়ায় প্রতাপের চরিত্রে একটা দোষ প্রবেশ করান ব্যতীত উহা তাঁহার সুখ্যাতির পরিচায়ক হয় না। এইরূপ নানা কথায় তাঁহার সহিত আমাদের মতানৈক্য আছে। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, তাঁহার গুণবত্তার কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত বিশদভাবে তৎকর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও বহু বিষয়ে তদনুসরণ করিয়াই প্রবন্ধ পরিপূরণ করিতে পারিব। এ পর্য্যন্ত বারভূঞা লিখিতে বসিয়া অন্য কাহারও নিকট কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই; বিষয়টি যে কতদূর গুরুতর, তাহা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, এজন্য ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত লোকের নিকট বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কত প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর বড় পাই নাই। অনেক খ্যাতনামা লেখকগণের নিকট আশা পাইয়াছিলাম, তাঁহারা কতকটা অনুসন্ধান লইয়া কোন কোন বিষয় যতদূর জানিতে পারেন, তাহা আমাকে জানাইবেন, পরে কিন্তু চিঠী লিখিয়াও তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাই নাই। এই কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক।

প্রতাপাদিত্য দিল্লী হইতে দেশে প্রত্যাগমন করার কিছুদিন পরেই রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা, পুত্র প্রতাপকে দশ আনা ও ভ্রাতা বসন্ত রায়কে ছয় আনা জমিদারী বিভাগ করিয়া দেন। এই সময় হইতে কতকদিন পর্য্যন্ত খুল্লতাতের সহিত প্রতাপ বড়ই সদ্ভাবে কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও সৌষ্ঠব সংসাধিত হইয়া, যশোহর বঙ্গের একটী প্রধান নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

বসন্ত রায়ের অভিমতে প্রতাপাদিত্যই রাজোপাধি ধারণ করেন। এই সময় তাঁহার সকল কার্য্যই পিতৃব্যের পরামর্শ গ্রহণান্তর সম্পন্ন হইতেছিল। কার্য্যও সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল। প্রতাপ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে খুল্লতাত কেবল নিজহিতকল্পেই সময় ব্যয় না করিয়া তাঁহার উন্নতি ও হিতজনক কার্য্যেও সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া তৎসম্পাদনে নিরত নিযুক্ত রহিয়াছেন। একারণে পিতৃব্যের প্রতি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বাস ও ভক্তি চক্ষেই তৎকার্য্য সমুদয় এখন প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এই সুখময় সুদিনে যশোহর রাজবংশের দ্বারা যে যে শুভকর ও পুণ্যজনক কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হইয়াছিল, আমরা উহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ক্রমে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রতাপ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পিতৃক্রোড় ও জন্মভূমিবিচ্যুত হইয়া, দিল্লীতে অবস্থান করেন। তৎকালে নানাবিধ কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে, তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। বিশেষতঃ মুসলমানেরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া, ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, কি নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ক্রমে পরাজিত করিয়াছে, তৎতৎবিষয় অতি বিচক্ষণতার সহিত বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

সেই সময়ে মিবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ যেরূপ অমানুষিক সাহস সহকারে, সুখ ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এমন কি, মহাবিপদে আত্মহারা না হইয়া, বাদসাহের ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের কৌশলজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে নিরত ছিলেন ; যখন জগৎ স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার সেই কার্য্যবত্তার,—পুণ্যকীর্ত্তি

সন্দর্শনে বিস্ফারিতনয়ন যখন সেই পুণ্যশ্লোক নরেশের উচ্ছ্বাসময় ও মহাপ্রাণতার জীবনব্যাপী সমরসন্দর্শনে শত্রুরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তদীয় গুণগানে নিরস্ত না হইয়া পারে নাই, তৎকালোচিত সেই অদ্ভুত বিবরণ প্রতাপাদিত্যেরও জানিবার বাকী ছিল না।

প্রতাপাদিত্য সেই রাজপুতরাজ্যের বীরচরিত যতই অনুধ্যান করিয়াছিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে যেন আর একটি নব দুরাকাঙ্ক্ষা-চিন্তা প্রসূত হইয়া তাঁহাকে এক অভিনবপথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রতাপের সেই নব ভাবনা আর কিছুই নহে, কেবল বিজাতীর হস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করা।

মোগল পাঠানের পরস্পর সংঘর্ষণে তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতাপ আত্মচিন্তা-সাফল্যের মহাসুযোগ পাইয়া, উহার প্রসার আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন। তখন পাঠান সামন্তগণ ও হিন্দু জমিদারেরা এক মতাবলম্বী হইয়া মোগল-বাদসাহের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া প্রথমতঃ মনোগত ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, এমন কি, মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রাজ্যমধ্যে দুর্গাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ধূমঘাটে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। নৈহাটির অনতিদূরে জগদ্দল, শালিখা, রায়-গড়, মাতলার নিকট, এতদ্ভিন্ন কালিন্দীতীরে বংশীপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে, ধূমঘাটের দুর্গ পাঁচবৎসর ধরিয়া বহু-সংখ্যক লোক কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বহু রথ্যা ও জলাশয় যশোহররাজবংশের কীর্ত্তিস্বরূপ আজিও বিরাজিত আছে। এতন্মধ্যে যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া

ঘাট্টারায়পুর যাইবার জন্য যে সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সুন্দরবনপ্রদেশে ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু বকুলবৃক্ষ বর্ত্তমান দেখা যায়।

বসন্তরায়ের নামানুসারে বসন্তপুর এবং প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে প্রতাপনগর বলিয়া দুইটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটের অনতিদূরে এক শিলাময়ী কালী সংস্থাপন করেন, ইনি পরে যশোহরেশ্বরী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই প্রতিমা সংস্থাপন সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প পরিশ্রুত হওয়া যায়। নিশীথে কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ অবলোকন করিয়া যশা প্রাটনী এই বিষয় মহারাজকে অবগত করায়; রাজাও অনুসন্ধানে ঐ ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন; পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে নিশ্চয় ভগবতী আবির্ভূতা আছেন বুঝিয়া তথায় দেবীপ্রতিমা সংস্থাপন করেন।

এতদ্ভিন্ন এই রাজবংশ দ্বারা উৎকল হইতে আনীত গোবিন্দজী ও উৎকলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যশোহরের রাজবংশীয়গণের নিকট যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদঙ্কিত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"নির্মমে বিশ্বকর্ম্মায়ং পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বর সংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গ মনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলাদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চতৎ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত, ৬৪ পৃষ্ঠা।

যশোহর রাজবংশের দানশীলতার বিষয় বিস্তর পরিশ্রুত হওয়া যায় ও রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্নস্থান হইতে আসিয়া যশোহরবাসী হন। বিশেষতঃ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের

"কল্পতরু" ব্যাপার ত এক অলৌকিক কাণ্ড। একার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিবে, দাতাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ এই কার্য্যে যে কত লোকের প্রার্থনীয় কত দান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জনপ্রবাদ শুনা যায়, কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য রাজমহিষীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, রাজা অম্লানবদনে তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে তৎকরে সম্প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন বিপ্রবর ভক্তিভরে মহারাজকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—"আমার রাজমহিষীতে কোন প্রয়োজন নাই, রাণী আমার মাতৃস্থানীয়া; কেবল মহারাজ যথার্থ ধর্ম্মভাবে কি লৌকিক আড়ম্বরে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, মহারাজ! রাণীমাতাকে পুনঃ গ্রহণ করুন; এবং মহারাজ সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন?" বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা গ্রহণে, নিষ্ক্রয়স্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করিয়া রাণীকে পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত গেল সব শুনা কথা, কিন্তু খুলনাঞ্চল পরিভ্রমণকালে আমি এতৎসম্বন্ধে যে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহার সম্যক্ বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

জেলা খুলনা বাগেরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত মূলঘর গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ। অনেক সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ তথায় বাস করিতেছেন; তন্মধ্যে বৈদ্যবংশীয় রায়চৌধুরী উপাধিধারী ব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ স্থানের (খরড়িয়া পরগণার) জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের জমিদারী মহারাজা প্রতাপাদিত্যেরই প্রদত্ত। এতৎসম্বন্ধে তত্রত্য জনসাধারণ

মধ্যে যে ইতিবৃত্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ দাশগুপ্ত মূলঘরের নিকট কোন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। তৎকালে ঐ স্থানে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত। উহারা সকলেই জানকীবল্লভকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিত। অদ্যাপি ঐ প্রদেশের লোকেরা পাঠশালার শিক্ষকদিগকে "বিশ্বাস" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। জানকীবল্লভও বিশ্বাস মহাশয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (১)

খরড়িয়া পরগণাটি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এতন্নিবন্ধন প্রজাদিগের অভাব, অভিযোগ ইত্যাদি যশোহরের রাজসদনেই করিতে হইত। কোন সময়ে বিশেষ জলকষ্টানুভব করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণ মহারাজকে আপনাদের অভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত করায়, রাজা রামদাস দেওয়ান নামক একজন অমাত্যের প্রতি প্রজাগণের অভাব তদন্ত করিয়া যাহাতে উহা নিরাকৃত হয়, তদনুরূপ আদেশ প্রদান করেন।

রামদাস দেওয়ান তৎকালে দক্ষিণ প্রদেশের করসংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অচিরে খরড়িয়া পরগণায় উপস্থিত হইলেন, পরে প্রজাদের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, তথায় এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে দেওয়ানের সহিত, বিশ্বাস মহাশয়ের বেশ আলাপ পরিচয় হয়। জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয়কে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, রামদাস

(১) ১৩১৭ সালের ঐতিহাসিক চিত্রের "রাজা হরিনাথ" প্রবন্ধে জানকীবল্লভ বিশ্বাস স্থানে সরকার লিখিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার উপাধি বিশ্বাস ছিল।

দেওয়ান পুষ্করিণী খননবিষয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। জানকীবল্লভও বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে আরব্ধ কার্য্য অচিরে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন দেওয়ান পরিতুষ্ট হইয়া জানকীবল্লভকে বলেন, "আপনি এতাদৃশ কুৎসিত স্থানে কেন অবস্থান করিতেছেন? আমার সহিত চলুন, অবশ্য আপনার উন্নতি সংসাধিত হইবে।" বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার কথায় আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান রামদাস জানকীবল্লভকে এক মোহরের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। কার্য্যপারদর্শিতাগুণে, পরে রাজানুগ্রহে বিশ্বাস মহাশয় প্রধান কাননগুর পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্য যখন কল্পতরু হইয়াছিলেন, সেই সময় বিশ্বাস মহাশয়ের উপর অনেক কার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, "কার্য্য সুসম্পন্নের সহিত তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী যদি তাহাতে কোনরূপ ত্রুটি ঘটে, তবে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" ভাগ্যদেবীর অনুকূলতায় জানকীবল্লভ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যশোলাভ করিতেই পারিয়াছিলেন। এজন্য রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনার অনুমতি প্রদান করেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া জানকীবল্লভ খড়রিয়া পরগণার জমিদারী প্রার্থনা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ পরগণার জমিদারী সনন্দ ও মজুমদার উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও জানকীবল্লভ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত ছিলেন না। পরে রাজা বন্দী হইলে পর, যখন প্রবল মোগলবাহিনী

রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল, তখন জানকীবল্লভ অনন্যো-পায় হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি লক্ষ্মীনারায়ণ ও একটি রাজরাজেশ্বর চক্র লইয়া স্বীয়াবাসে প্রস্থান করেন। (১)

রাজা বিক্রমাদিত্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার দেহাবসানে তদীয় প্রিয় ভ্রাতা বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের সদ্ভাব রক্ষা কঠিন। এজন্য জীবিত থাকিতেই জমিদারী বিভক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। তদনুসারে প্রতাপাদিত্যকে দশ আনা ও বসন্ত রায়কে ছয় আনা অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বসন্ত ও প্রতাপ কেহই তখন তাহাতে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লন। রাজলক্ষ্মী যতদিন যশোহরের প্রতি অনুকুলা ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্র ও খুল্লতাত সৌহার্দ্দের সহিত কাল যাপন করিতে-ছিলেন। কিন্তু চঞ্চলার মন ত সর্ব্বদাই অস্থির। বহুদিন এক ভবনে বাস করা তাঁহার কোন কালেই ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার আগমনের লক্ষণটা বরং কিছু বুঝিয়া লইতে সক্ষম হওয়া যায়, কিন্তু নির্গমন কাণ্ডটা এত ত্বরিতে সংঘটিত হয় যে ক্ষণস্থায়ী তড়িতের গতিকেও পরাস্ত মানিতে হয়। দুর্ভাগ্য-পবনে সৌভাগ্যের দীপ অতি সত্বরই নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

কমলার আসন টলিল। পিতৃব্যের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানাবধিই বসন্ত রায়কে সন্দেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। কিছু কাল পাংশু আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহা দৃষ্ট্যতীত ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যসমীরণের প্রথম সঞ্চারেই সৌভাগ্য-

(১) মূলঘরের চৌধুরী মহশয়দের বাড়ীতে আমি এই লক্ষ্মীনারায়ণ সন্দর্শন করিয়াছি। দেবত্রা ভূমির আয় দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাদিও চলিতেছে।

পাংশু চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আবার সেই দ্বেষ-বহ্নির সঞ্চারে রাজভবন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহা আর নির্ব্বাপিত হইল না।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, জামাতা রামচন্দ্র রায়ের সহিত প্রতাপের মনোমালিন্যের প্রধান নায়ক বসন্ত রায়। নাতজামাইয়ের বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করিয়া তিনিই স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপকে দুর্দ্দান্ত নর-রাক্ষস রূপে বর্ণনা করিয়া, রামের কোমল মনে মৃত্যুর বিভীষিকা প্রকটিত করিয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের মোহিনী রূপ ধারণ হইতে পলায়ন পর্য্যন্ত যত কিছু ব্যাপার সমস্তই সেই 'বুড়ো' বসন্তের ষড়্যন্ত্রের ফল মাত্র। প্রতাপাদিত্য এমন কাপুরুষ ছিলেন না যে তদ্দ্বারা জামাতৃবধ নামক একটা লোমহর্ষণ ব্যাপারের সংঘটন হইতে পারে। ধন্য বাঙ্গালী-লেখক!

কেহ কেহ বলেন চাকসিরি পরগণা বসন্ত রায়ের অংশে পতিত হয়। ঐ স্থানটি সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী থাকায় পোতাশ্রয়ের বিশেষ অনুকূল ছিল এবং প্রান্তবর্ত্তী জলদস্যু ও জলযুদ্ধকারীদিগের আক্রমণ নিবারণের পক্ষেও সুন্দর বন্দোবস্তের উপযুক্ত স্থান ছিল। তৎসদৃশ অন্য আর একটি পরগণা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রতাপাদিত্য উহা পাইবার জন্য পিতৃব্যের নিকট প্রস্তাব করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন না।

প্রতাপ নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে মোগল বাদসাহের সহিত তাহার সংঘর্ষণ অনিবার্য্য এবং এজন্য ঐ চাকসিরিতে দুর্গ নির্ম্মাণ ও জলযুদ্ধোপযোগী পোত বিনির্ম্মাণ প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া উঠিবে। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। এই সকল কারণে এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বসন্ত রায়কে বাদসাহের প্রতিপক্ষে আনিতে না পারায়,

প্রতাপ খুল্লতাতকে পরম শত্রু বোধ করিতে লাগিলেন। বসন্ত রায় ও তৎপুত্রগণের নিকটও এই বিবরণ অবিদিত রহিল না। এই সূত্রে যশোহরের সমুজ্জ্বল সৌভাগ্যগগনে দুর্ভাগ্যের তিমিরচ্ছটা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

বসন্ত রায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে জ্ঞাতি প্রতাপাদিত্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায় যে সময়ে শ্রাদ্ধ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে প্রতাপ সশস্ত্র ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন যে, বসন্ত রায় ঘটনাক্রমে এই সময়ে কোন পরিচারককে "গঙ্গাজল আনয়ন কর", এই কথা বলায়, প্রতাপ মনে করিলেন, পিতৃব্য তাহাকে বধ করিবার জন্য স্বীয় শর আনয়ন করিতে বলিতেছেন। বসন্ত রায়ের অস্ত্রের নাম ছিল "গঙ্গাজল"। অব্যবস্থিত-চিত্ত প্রতাপ এই কথাতেই উত্তেজিত হইয়া প্রথমেই বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দকে, পরে বসন্তরায়কে, তৎপরে ক্রমে জগদানন্দ, পরমানন্দ, রূপরাম, মধুসূদন, মাণিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের অন্যান্য পুত্রগণকেও শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বসন্ত রায়ের স্ত্রী দেখিলেন বংশ একেবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বালক রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর এই রাঘবই কচু রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময়ে বসন্ত রায়ের একটী পুত্র চাঁদ রায় ও অপর আর একটি পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করায়, তাঁহাদেরও প্রাণ রক্ষা পায়। বসন্ত রায়ের সাধ্বী পত্নী পতিসহগামিনী হইলেন।

এই কাণ্ডের অবতারণায় যিনি যতই বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করুন না কেন, প্রতাপই যে এজন্য সম্পূর্ণ দোষী তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভূমি লাভের জন্য জগতে এইরূপ ব্যাপার বহু সংঘটিত

হইয়া গিয়াছে। একই আসনে বহু শ্রমণ ও যোগী উপবেশন করিয়া বহুকাল কর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু একটি বিস্তৃত রাজ্যে একাধিক রাজার স্থান সংকুলন হয় না। দুই হইতে গেলেই তাহার পরিণাম ফল হাতাহাতি ও কাটাকাটি। যাহা হউক প্রতাপাদিত্যের এই বীভৎস ব্যাপার সংসাধনের পর রাজলক্ষ্মী প্রতাপের উপর বিরূপা হইলেন। মা যশোহরেশ্বরী ফিরিয়া বসিলেন। একটা ভুল ক্ষণে সমস্ত যশোহর যেন ভাসিয়া চলিল।

একদা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রতাপ দেখিতে পান যে বাটীর ঝারুদারিণী স্বীয় বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিয়াই স্বকার্য্য সাধনে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। তদবস্থা অবলোকনে রাজার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ভৃত্যগণকে সেই নির্লজ্জা রমণীর স্তন কাটিয়া ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য সম্পাদিত হইল। প্রবাদ এই যে ইহাতেই কুলদেবী যশোহরেশ্বরী নিতান্ত কুপিতা হইলেন। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলে দেখিলেন যে যশোহরেশ্বরী মন্দিরসহ উত্তরাস্যা হইয়া রহিয়াছেন। রাজাকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে, রাজা ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য মন্ত্রপূত "হস্তচালনা"র আশ্রয় লইলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত হইল।

"শুম্ভঃ সুরেন্দ্রবিজয়ী নিহতো নিশুম্ভঃ
সংগ্রামমূর্ধনি যয়া মহিষাসুরশ্চ।
সৈষা সুরাসুরগণার্চ্চিতপাদপদ্মা
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাহবমানা॥"

যশোহর রাজ্য সমুদয় হস্তগত করিয়া, প্রতাপ কোষ ও বলসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, ফিরিঙ্গি রুডা, রঘু, মদন লাল, প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণের সাহায্যে তাহার নৌসন্য

গণ এরূপ সুশিক্ষিত হইল যে তাহারা মোগল অনীকিনীগণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে লাগিল।

কোন এক বিশেষ আত্মীয়ের (রূপরাম বসুর) সাহায্যে বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়, বসন্তের প্রিয় বন্ধু হিজলীর মছন্দরীর * আশ্রয় গ্রহণ করেন। মছন্দরী কচুরায়ের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, প্রতাপ ও বসন্ত রায় ঘটিত সমুদয় বিবরণ দিল্লীশ্বরের গোচর করেন। প্রতাপ তাহাতে রুষ্ট হন এবং হিজলী আক্রমণ ও মছন্দরীকে পরাস্ত করিয়া, হিজলী অধিকার করিয়া লন।

প্রতাপের এই আচরণে রাজমহলের মোগলশাসনকর্ত্তা, সের খাঁ নামক একজন বীরপুরুষকে যশোহর আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন। যশোহরের সন্নিধানে উভয়পক্ষের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে মোগলেরা পরাস্ত হয় এবং সের খাঁ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহাই প্রতাপের মোগল-জয়ের প্রথম উদ্যোগ পর্ব্ব।

তৎপরে ইব্রাহিম খাঁ মোগল পক্ষ হইতে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া বহুসংখ্য সৈন্য সহ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। তথা হইতে নৌকা-যোগে ক্রমে মাতলার নিকট গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতাপ তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম তথা হইতে রায়গড় দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। মোগলেরা রায়গড় পরিবেষ্টন করিয়াছে, এই কথা অবগত হইয়া প্রতাপ আদেশ করিলেন যে কমল খোজা ও

*পরিশিষ্ট ভাগে হিজলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইবে, তাহাতে মছন্দরীর বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইবে। উাহাতে ঈশা খাঁ মছন্দরীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে খোজা ঈশা নামে কতুল খাঁর একজন মন্ত্রী ছিল।

সূর্য্যকান্ত স্ব স্ব দল সহ পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুন। সূর্য্যকান্ত স্বীয় দল সহ নৌকাযোগে এমন ভাবে আক্রমণ করিলেন যে মোগলেরা তাহার কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারিল না। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ইব্রাহিম কতিপয় সৈন্য তথায় রাখিয়া অন্যান্য সহচরগণ সহ মাতলার দিকে প্রস্থান করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই রুডা যুদ্ধতরীর ও সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, মদন মল্ল, সুখময়, সুন্দর প্রভৃতির কেহ বা পদাতিক, কেহ বা অশ্বারোহী, কেহ বা গজারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া, মাতলার দুর্গ রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জল ও স্থল উভয়দিকে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মাতলার প্রাঙ্গন ও তলবাহী স্রোতস্বতী নরশোণিতে রক্তাভ ও শবপূর্ণ হইয়া প্রেতভূমিরূপে পরিণত হইল। প্রতিপক্ষ তাহাদের সমস্ত বিক্রম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে কোনরূপেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এবারেও মুসলমান সৈনিকগণের উপর বিমুখ হইলেন। "জয় মহারাজ প্রতাপের জয়" এই রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরাজিত ইব্রাহিম লজ্জাবনতমুখে যশোহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

প্রতাপের এই সকল বিজয়বার্ত্তা বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ অনেকেই তাঁহার সহিত মৈত্র সংস্থাপন করিতে লালায়িত হইলেন। বুদ্ধিমান্ ও বীরবর প্রতাপ সময়োপযোগী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও বাদসাহের সহিত যুদ্ধকালে পরস্পর সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইলেন।

এই পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য কেবলমাত্র আত্মরক্ষণেই উদ্যোগী ছিলেন। ক্রমে দুই জন মোগল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন

দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। তিনি সেই দুর্দ্দমনীয় বেগ কোন মতে সংযত রাখিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ এই সময়ে অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মোগলাধিকৃত সপ্তগ্রাম বন্দর লুণ্ঠন করিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে প্রতাপের অভিপ্রায় হইল। পরে সেনানায়কগণকে এই কথা পরিজ্ঞাত করিয়া প্রতাপ বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, এ পর্য্যন্ত তোমরা কেবল আক্রমণ নিবারণ করিয়া কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ মাত্র, কিন্তু কোথাও আক্রমণকারী হইয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হও নাই। হিজলী বিজয় ত একটা সামান্য মৃগয়া ব্যাপার মাত্র, কিন্তু যদি তোমরা সিংহ, ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ মৃগয়া-ক্ষেত্রে আপতিত হইয়া উহা বধ বা বন্ধন করিতে সমর্থ হও তবেই বুঝিব যে তোমাদের অস্ত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে তোমরা অভ্যস্ত হইয়াছ। যদি গৃহের একাংশে বিষধরের অবস্থান হয়, তবে আর কত দিন জাগ্রত থাকিয়া তাহার আঘাত হইতে পরিত্রাণের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে? আর চিন্তিত মনে কতকালই বা জাগ্রত থাকা যায়? অতএব আমার ইচ্ছা, বন্ধুগণ, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রতিবেশী হিংস্র-জন্তুগুলিকে শীঘ্রই বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়া কতক দিন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া লও। অন্যথায় এমন এক দিন উপস্থিত হইবে যে, সেদিন হয়ত আমাদের এই নিদ্রাই মহানিদ্রারূপে পরিণত হইবে। এই সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, অতএব আমি ঠিক করিয়াছি যে মোগলাধিকৃত সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগের সেই অভাব পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এস ভ্রাতৃগণ, কেহই ভীত বা বীতশ্রদ্ধ হইও না। আমার কথা মানিয়া চল, দেখিবে যশোহরেশ্বরী অবশ্যই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।" প্রতাপের বাক্য সমাপ্তাহইতেই তাঁহার সহচরগণ সমস্বরে

বলিয়া উঠিল, "আমরা মহারাজের আদেশ অবশ্য প্রতিপালন করিব। যত দিন জীবন তত দিন পণ, মা যশোহরেশ্বরীর নামে আমরা এই শপথ গ্রহণ করিলাম।" বলা বাহুল্য অচিরে সপ্তগ্রাম বিলুণ্ঠিত হইল। মোগলশাসনকর্ত্তা বাধা প্রদানে অসমর্থ হইয়া পরিজন সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য বিজয়লাভান্তে যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যমুনা-তটে উপনীত হইলেন। পরে জাহাজঘাটায় অবতীর্ণ হইবা মাত্র বুরুজ-পোতা হইতে (১) ঘন ঘন তোপধ্বনি হইয়া মহারাজের বিজয় ও আগমনবার্ত্তা জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দিল। অমাত্য (২) লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী সকলের অগ্রণী হইয়া মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে সেনাপতিগণ ও অপরাপর কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে মহা সমা-রোহে রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। অসংখ্য জনতায় রাজপথ পরিপূর্ণ হইল। রণবাদ্যের তালে তালে সৈনিকগণের পাদবিক্ষেপ সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের ও জাগ্রত সমররসের মদিরাসার ঢালিয়া দিতে লাগিল। রাজা স্ববাসে উপনীত হইবা মাত্র বন্দীগণ সমস্বরে মহারাজের বিজয় ঘোষণার গানগুলি পঞ্চমে চড়াইয়া দিল। নারীগণের হুলুধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মহারাজকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ আজ মুক্ত-হস্ত। বড় বড় অমাত্য, সৈনাধ্যক্ষ হইতে, নিতান্ত ক্ষুদ্রবেতনভোগী পর্য্যন্ত সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ উচ্চহারে ও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণনন্দনেরা নিম্নহারে বিদায় পাইলেন।

(১) ইহার উপর কামান রক্ষিত হইত, এখন ইহার কতকটা ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

(২) এই মহাত্মা বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ।

দরিদ্রগণ আশাতিরিক্ত দান পাইয়া, সেই পুরাতন গাথার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিল ;—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ আদিত্য দাতা এ মহীমণ্ডলে ॥"

যশোহর আজ উন্মত্ত। একদিকে যেমন এই নব বিজয় ও অর্থসঙ্গতি সংগ্রহ জন্য উল্লাসে নৃত্যময়, অপরদিকে তেমনই ইহার পরিণাম ভাবিয়া অশ্রুযুক্ত। এই মহা ব্যাপারে সকলেই আমোদে বিহ্বল, কেবল একমাত্র রাজলক্ষ্মীরূপিনী রাজরাণী সচকিতা ও উদ্ভ্রান্তা, যেন কোন নিধি হস্তগত হইয়া তাহা পুনরায় হস্তচ্যুত হইল। এইরূপ একটা ভাব লইয়া তিনি জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তির ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন প্রতাপাদিত্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া রাণীর সম্মুখীন হইলেন, তখন রাণী তাঁহাকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রেমাশ্রুভাবেই উহা গ্রহণ করিয়া মহিষীকে হৃদয়ের প্রতিদান করিলেন। কিন্তু দম্পতির মনোগতভাব ইহাতে কিছুই পরিব্যক্ত হইল না।

রাজা স্নানাহ্নিক ও আহার পরিসমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলেন। তখন মহিষী সময় বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, আপনার সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া এই হতভাগিনী নিজকে ধন্য মনে করিতেছে, কিন্তু জানি না, সময়ে সময়ে কেন একটা দুর্ভাগ্যের আবরণ আসিয়া আমার এই সুখ-সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছ। অলক্ষিতে কেহ যেন আমার শ্রুতিমূলে এই কথার অবতারণা করিয়া যায় 'ললনে! সুখের পর দুঃখ বিধাতার চিরনির্দ্দেশ, অতএব যাহাতে ভবিষ্যতে সুখ বদ্ধমূল হয়, সেই উপদেশ পতিকে প্রদান কর। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সংঘর্ষণ কেবল নাশের সুপ্রশস্ত পন্থা মাত্র। এখনও সময় আছে। রাজা এখনও মহিমান্বিত বাদসাহের

সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিতে পারেন। উহাতে তাঁহার ও তোমার রাজশ্রী অটুট রহিবে।' মহারাজ, আমার এই সমস্ত ভাবোদয় কি কষ্টকল্পনাপ্রসূত, না গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূত্রপাতের পূর্ব্বলক্ষণ?"

প্রতাপ বলিলেন—"প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরি, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা এবং তোমার মনোগতভাব সমুদয়ই আমি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। কার্য্যের প্রথম সূত্রেই সমুদয় বিবেচনাসাপেক্ষ, কিন্তু উহাতে অগ্রসর হইয়া যে কাপুরুষ পথভ্রষ্ট হয়, তাহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। খুলিয়া বলিলেই বা কি, তোমার বিবেচনায় মোগল-মার্ত্তণ্ডের নিকট আমাদের মত উপগ্রহসকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। অতএব উহার সুতীক্ষ্ণ তেজ আমরা কিরূপে প্রতিহত করিব? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সূর্য্য বিশ্বব্যাপী হইলেও, নবঘনসঞ্চারে সময়ে সময়ে তিনিও অদৃশ্য হইয়া থাকেন। মেঘ সরিয়া গেলে পুনরাবির্ভূতও হইয়া থাকেন। যতক্ষণ মেঘের বিকাশ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত জগৎ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া থাকে। মোগল বাঙ্গালীর সংঘর্ষণে যত টুকু সময় অতিবাহিত হইবে, তত টুকু কালের জন্যও ত দেশীয় জনগণ মোগলের কঠোর অত্যাচার হইতে আপনা-দিগকে নিরাপদ ভাবিয়া কতকটা শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইবে? এই পুণ্যটুকু যদি উপার্জ্জন করা যায় তবে সেই সুযোগই বা পরিত্যাগ করি কেন? অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে? বাদসাহের পিতামহ বাবরসাহ এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুনসাহ সেই অর্জ্জিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। আবার তৎপুত্র আকবরসাহ নববলে বলীয়ান্ হইয়া হিন্দুস্থান গ্রাস করিয়া বসিতে উদ্যোগী। তিনি যে সফলকাম হইবেন, তাহারই বা বিশ্বাস কি? রাণাপ্রতাপকে ত তিনি এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া

উঠিতে পারিলেন না। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার পাঠানেরাই বা তাঁহাকে দেশাধিপতি বলিয়া কোথায় স্বীকার করিয়াছে ? তুমি যাহাই মনে কর না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠান ও বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা বলবতী থাকিলে, আকবরসাহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। বিশেষ সকলে একমতাবলম্বী হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি ; আর ফিরিবার উপায় নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আর এতৎ-সম্বন্ধীয় কোন কথাই আমার সমক্ষে উত্থাপন করিবে না, একমাত্র যশোহরেশ্বরীর পরমপদ ভাবিয়া দিন অতিবাহিত করিতে থাক। কার্য্যের ফলাফল চিন্তা করিয়া তুমি অনর্থক শরীর ও মন নষ্ট করিও না।”

প্রতাপের প্রতাপ যতই বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল, মোগল কর্ম্ম-চারীগণ ততই উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া দিল্লীতে নূতন নূতন সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। বাদসাহপক্ষীয় আজিম ওসান ও দ্বাবিংশতি আমীর পরাজিত হইয়া যশোহর হইতে বিতাড়িত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট আকবরসাহ লোকান্তরিত হন ও তৎপুত্র সেলিমসাহ, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর মসনদে অধিরোহণ করেন (১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে)।

রূপরাম বসু, কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া এই সময়ে দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আকবরসাহের পীড়া নিবন্ধন তখন পর্য্যন্ত রূপরাম কোনরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন নূতন বাদসাহের নিকট কচুরায়ের পক্ষ হইতে আর্জ্জি দাখিল করিলেন। তাহাতে প্রতাপ আদিত্যের যাবতীয় অমানুষিক দুষ্ক্রিয়ার কথা যথাভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা প্রতাপের বিরুদ্ধে যে সকল লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ সঙ্গে উপস্থাপিত করা হইল।

তখন জাহাঙ্গীর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, যিনি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গে আগমন করিয়া বহু বিদ্রোহীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই রণনীতিবিশারদ মানসিংহের উপরেই প্রতাপকে দমন করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এতদ্বিষয় অবলম্বনে মহাকবি ভারতচন্দ্রের অমিয়-লেখনী হইতে যে অমৃতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ উহা হইতেই প্রতাপের বলাবল ও আধিপত্যের বিষয় এবং মহারাজ মানসিংহের প্রতাপ-দমনজনিত বাঙ্গলায় আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে বাদসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায়, আছিলা বসন্ত রায়,
রাজা তারে স্ববংশে কাটিলা।
তাঁর বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা॥
ক্রোধ হৈল বাদসায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়,
মানসিংহে বাঙ্গলায় পাঠা'লা॥
মানসিংহ রণরঙ্গে, মজুমদারে নিয়া সঙ্গে,
কতদিনে বাঙ্গলায় আইলা।

পদ্যময় এই কতিপয় পংক্তিতে যশোহরের রাজপরিবারের আত্ম-কলহের ব্যাপার, বসন্তরায়ের নিধন, কচুরায়ের বাদসাহসকাশে ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ, প্রতাপ-দমন জন্য জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক প্রেরিত মানসিংহের বাঙ্গলায় আগমন ও ভবানন্দ মজুমদারের সহিত সম্মিলন ইত্যাদি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী কচুয়ায়কে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার কৃপাতেই, কচুরায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উহা পাঠ করিয়া আরও জানা গেল যে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্যক্তি মানসিংহকে এই সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভবানন্দকে যশোহর রাজবংশের কর্ম্মচারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে কি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে তাহার উল্লেখ নাই। এইরূপ অবস্থায় একমাত্র প্রবাদ কথার উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণ-নগরের স্থাপয়িতাকে যশোহরের রাজবংশের কর্ম্মচারি নির্দ্দেশ করা সঙ্গত কিনা তাহা পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন। কার্ত্তিকেয় বাবু প্রকাশিত ক্ষিতীশবংশাবলী পাঠে জানা যায় "হাবেলী পরগণা নিবাসী কাশীনাথের অনাথা পত্নী, একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস ও একটী দাসী এবং দুই সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা সহিত আন্দুলিয়া নিবাসী বাগয়ান পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণসমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লয়েন এবং তথায় সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক গৃহীতা হয়েন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঐ কামিনীকে অতি সুশীলা দেখিয়া দুহিতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উক্ত রমণী গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে পুত্র-বতী হইলেন। হরেকৃষ্ণ নবকুমারের অপরূপ রূপ লাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন এবং যথাকালে উপনয়ন ও বিবাহ দিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি

সমূহের উত্তরাধিকারী করিলেন এবং স্ব-বংশের সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন"। কাশীনাথের এই পুত্রই ভবানন্দ। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্বতঃই বোধ হয় যে হরেকৃষ্ণসমাদ্দার হইতেই কাশীনাথের জমিদারী প্রাপ্তি হয়। আবার শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত গ্রন্থে ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের কর্ম্মচারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থ ক্ষিতীশবংশাবলী হইতে প্রামাণ্য কি না আমরা জানি না। পাঠক মহোদয়গণই ইহার বিচার করিবেন।(১)

যে উপায় অবলম্বন করিয়া মানসিংহ পূর্ব্ব পূর্ব্ববার কেদাররায়, মুকুন্দরায় প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরপুরুষগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, প্রতাপের সহিত যুদ্ধোদ্যোগেও সেই নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এবার বিভীষণ পদে বরিত হইলেন, ভবানন্দ মজুমদার ও ভবেশ্বর রায় এবং তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা। মানসিংহ ঘাটঘাট সমুদয় বন্ধ করিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। নিয়ম মত শৃঙ্খল ও তরবারি প্রেরিত হইল। দূত প্রতাপের সমক্ষে উহা স্থাপিত করিয়া, দুইয়ের মধ্যে যেটি তাঁহার অভিরুচি হয় তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কোনটি গ্রহণ করিলে যে তাহার ফল কি হইবে তাহা বর্ণনা করিতেও ভুলিলেন না। দূতের কথা শুনিয়া প্রতাপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "বার্ত্তাবহ, তুমি সর্ব্বথা ক্ষমনীয়, কিন্তু আজ যদি তোমার প্রভু আমার সমক্ষে এই উপহার লইয়া উপস্থিত হইতেন, তবে তাঁহারও আমার এই উভয়ের মধ্যে অগ্রে তরবারির পরীক্ষা হইয়া পরে শৃঙ্খল যাহার যোগ্য তাহারই জন্য ব্যবস্থা করা হইত। সেই স্বদেশ ও স্বজাতি-

(১) যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজবংশকেও কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের কর্ম্মচারীর বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু চাঁচড়ার রাজগণ উহা একবারেই স্বীকার করেন না।

দ্রোহিকে বলিও সাক্ষাৎ মত তাঁহার সহিতই এই তরবারির পরীক্ষার পরিসমাপ্ত হইবে। তুমি শৃঙ্খল লইয়া উহা তোমার প্রভুর চরণে প্রদান কর। প্রতাপ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিবেন না।”

আমরা ইতিপূর্ব্বে পিতৃব্য ও তৎসন্তানগণের নিধন বৃত্তান্তে প্রতাপাদিত্যকে যথার্থ সংহারমূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছি। জামাতৃনিধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি ভয়ানক নির্ম্মমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া একটী রমণীর স্তন কর্ত্তন কার্য্যও তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়। বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা লিখিয়াছেন যে প্রতাপ রিপুবশীভূত হইয়া ইহা হইতে গুরুতর আর একটি পাপানুষ্ঠান করিতেও বিরত হন নাই। উহা এস্থলে উল্লেখ না করাই বিধেয়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে প্রতাপ স্বদেশের উদ্ধারসাধনরূপ মহৎ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যে মহাপ্রাণতার সহিত উহার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, যদি চরিত্রের পবিত্রতার সহিত তাহা উদ্‌যাপিত হইত তবে বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অধ্যায় বোধ হয় ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিত। যে স্থানে গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়বিচ্ছেদ ও যথেচ্ছাচার শাসন, ভাগ্যদেবী তথায় আর কতদিন তিষ্ঠিতে পারেন? তাই সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী ভগবতী প্রতাপের প্রতি বিরূপা হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্য একদিন ইষ্টপূজায় নিযুক্ত থাকা সময়ে, তাঁহার কন্যা উপস্থিত হইয়া প্রতাপকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক ইনি কন্যারূপধারিণী জগন্মাতা যশোহরেশ্বরী। প্রতাপ বার বার তাহাকে “চলিয়া যা” ইহাবলায়, কন্যারূপধারিণী দেবী বলিলেন “রাজন্, তুমি আমাকে বার বার চলিয়া যাইতে বলিতেছ। আমি এখনই যশোহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু জানিও ন্যায়ের অবমাননা ও সুনীতির বিপরীত ঘটনা

যথায় সংঘটিত হয়, তথায় ভাগ্যলক্ষ্মীর অবস্থান কখনই হইতে পারে না। আমি চলিলাম বটে, তোমারও পতন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। তুমি শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়া অন্ততঃ বীর নামের সার্থকতা সাধন করিয়া, সেই সুরভোগ্য ত্রিদিবধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। রাজা মহামায়ার চক্রান্ত সমুদয়ই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পরে তাঁহার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ, তৎপুত্র উদয়াদিত্য এবং অন্যান্য সেনানায়কগণ বহুদিন পর্য্যন্ত মানসিংহের সহিত সমানভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সময় সময় এমন হইয়া পড়িত যে মোগলবাহিনী রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পর্যান্ত প্রস্তুত হইত, কিন্তু মানসিংহের অদম্য উৎসাহের নিকট উহা অধিক্ষণ স্থায়ী হইত না। পরিনামে বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপ শত্রু হস্তে বন্দী ও তাঁহার সেনাপতিগণও পুত্র নিহত হইলেন। এই অলৌকিক লোক বিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া প্রতাপের পক্ষীয় বীরপুরুষগণ যে স্বর্গীয় স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজি পর্য্যন্তও কেহ বিস্মৃতি হইতে পারে নাই। প্রতাপ ও তৎপক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ প্রণালী সন্দর্শণ করিয়া মানসিংহ ও তৎপক্ষীয় সেনানায়গণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া ছিলেন। বাদসাহের আদেশ, প্রতাপকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে পারিলে যেন, পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া সেই নর শার্দ্দুলকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। মানসিংহ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই কথা স্মরণ করিয়া তদবস্থায় প্রতাপকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাকে আর দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিতে হয় নাই' বারানসী ধামে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই প্রতাপ বাঙ্গালার শেষ বীর বীরাগ্রগণ্য প্রতাপ, এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া,

বিশ্বেশ্বরের পদে বিলীন হইয়া গেলেন। মর্ত্ত্যধামের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিল না। (১)

মানসিংহ যশোহর প্রদেশ কচু রায়কে সমর্পণ করিয়া তথাকার রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে তিনি যশোহরজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র মুকুটমণি যশোহর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ বা বিক্রমপুরের কোন অংশে বাস করেন এইমাত্র অবগত হওয়া যায়।

ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন তজ্জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে কতক পরগণার জমীদারী ও ফর্ম্মান প্রাপ্ত হন। চাচড়ার রাজাগণও মানসিংহের অনুগ্রহে "যশোহরের রাজা" বলিয়া অভিহিত হন।

মানসিংহ বীরবর শঙ্করের বীরত্বে ও প্রভুপরায়নতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই জন্য বিরুদ্ধপক্ষ হইলেও তদীয় গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন, ভবিষ্যতে বাদসাহের বিরুদ্ধে কখনও আর যুদ্ধ করিব না শঙ্করকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়া ছিল।

প্রতাপাদিত্য একদিকে যেরূপ কুটনীতিজ্ঞ ও স্বজন পীড়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেন, অন্যদিকে কিন্তু, স্বদেশ প্রাণ ও দীনের অভাব মোচনে মুক্ত হস্ত ; পণ্ডিত প্রতিপালক, কাব্যামোদী, স্বধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও পর ধর্ম্মের প্রতি অস্পৃহা পরিশূন্য ছিলেন। বীরত্ব তাঁহার চিরজীবনের সাথী ছিল। একদিনের জন্যও তিনি উহা হইতে বিচ্যুত হন নাই, তদধীন বীরগণও তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন।

(১) মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ ইতিপূর্ব্বে ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে একবার যশোহর জয় জন্য প্রেরিত হন। ষ্টুয়াট ২০৪ পৃষ্ঠা।

তাঁহার দাতৃত্বের ও স্বদেশ উদ্ধার সাধনার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্বানগণের প্রতি ইহার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকা নিবন্ধন, শ্রীকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন নামক একজন অসাধারণ পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পঞ্চাননের ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পৌরহিত্য কার্য্যে বরণ করেন। প্রতাপ একজন গোড়াশাক্ত ছিলেন। মায়ের উপাসনার জন্য সময় সময় কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ভগবতীও তাঁহাকে বরপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ভবানীর প্রিয়পুত্র বলিয়া অনুমান করিতেন। "যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী" এই কথার উদ্ভবও ঐ সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল।

শাক্ত হইলেও যশোহরের রাজগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ও শ্রদ্ধা করিতেন। বৈদ্য বংশীয় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাশ প্রতাপের সভার এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণকেও ঘৃণা করিতেন না। (১৫৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে) খৃষ্টানগণ প্রতাপাদিত্যের অনুজ্ঞায় যশোহরাঞ্চলে এক গির্জ্জা প্রস্তুত করেন। মুসলমান প্রজাদের জন্য মৌতালি ও মুকুন্দ পুরের নিকট পরবেজপুরে এক মসজিদ নির্ম্মান করাইছেন। উহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আজিও ঐ মসজিদের কারুকার্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাজ প্রতাবাদিত্য সম্বন্ধীয় বহু বিবরণ বঙ্গভাষার নানা পুস্তকে বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এজন্য তদবৃত্তান্ত সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করিলাম। কিন্তু এইরূপ বীরবরের বিবরণ আকবরনামা গ্রন্থে কেন বিবৃত হয় নাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ষোড়াশ শতাব্দীতে বঙ্গের সাধারণ অবস্থা

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, মহামনা আকবরের রাজত্বের বিবরণকেই মূল স্বরূপ ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ বাবরসাহ, পিতা হুমায়ূন এমন কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহা আদর্শভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। হুমায়ূনের রাজত্বের মধ্যভাগে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সেরসাহ দিল্লীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে সেরসাহ কর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অশ্বারোহণে ডাক চলন, পান্থশালা সংস্থাপন প্রথাই সর্ব্ব প্রধান।

সেরসাহের মৃত্যুর কএক বৎসর পরে, হুমায়ূন পুনরায় ভারত রাজ্য প্রাপ্ত হন বটে কিন্তু অচিরেই লোকান্তরিত হওয়ায়, তৎপুত্র আকবর-সাহ পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হন। এই বাদসাহের রাজত্ব সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা পর্য্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাদসাহ আকবরের শাসন সময়ে চট্টগ্রাম হইতে করইবাড়ী পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে চারিশত ক্রোশ এবং উত্তরে হিমালয়ের নিম্ন ভূমি হইতে দক্ষিণে মদারণ পর্য্যন্ত বিস্তারে দুইশত ক্রোশ পরিমিত স্থান বাঙ্গালা নামে কথিত হইত। মুই আবগান নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বদিগে ভাটী নামে একটী প্রদেশ জয় করিয়া সুবেবাঙ্গালার অন্তর্গত করেন। আইনই

আকবরি প্রণেতা বলেন "এই নূতন আধিকৃত স্থানের আম্রবৃক্ষগুলি একজন মনুষ্যের তুল্য দীর্ঘকায় ছিল মাত্র। এই ভাটী প্রদেশের সীমান্তেই ত্রিপুরাধিপতির বিস্তৃতরাজ্য বর্ত্তমান ছিল। এই রাজার নামে মাণিক্য উপাধি দৃষ্ট হয়। (১) ঐ নামের সহিত নারায়ন শব্দ সংযুক্ত আছে। এই রাজ্যে অশ্বারোহীসৈন্য দৃষ্ট হয় না। ইহার উত্তর পূর্ব্ব দিকে কোচবিহার রাজ্য, এই রাজার এক সহস্র অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্য দেখা যায়। কামরূপ প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তৎসন্নিকটে আসাম প্রদেশ, এই রাজা অসীম ক্ষমতা শালী। বঙ্গ দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" বলিতে গেলে এই সময়ে বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী এই রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল, মোগল শাসনের সহিত উহাদের কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

---

(১) এ সম্বন্ধে একটীগল্প প্রচলিত আছে, ডাকতার ওয়াইজ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের এসিয়াটীক জার্ণেলের ২০৪ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ত্রিপুরার এক রাজা কতকগুলি মণি, মাণিক্য, উপঢৌকন সহ দিল্লীতে উপনীত হইয়া উহা বাদসাহাকে প্রদান করেন। বাদসাহ উহা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত পরিতৃপ্ত হন; এবং রাজাকে লাল, এই উপাধী প্রদান করেন। পারস্য ভাষায়, মাণিক্যকে "লাল" বলা হইয়া থাকে তজ্জন্য এই উপাধি প্রদত্ত হয়। কিন্তু রাজা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পারস্য "লাল" শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত মূলক "মাণিক্য" শব্দ ব্যবহার করিতে থাকেন। আইন আকবরিতে এই সমস্ত উল্লেখ আছে। ১৫৮৫ খৃঃঅব্দে যদিও মোগল সৈন্য ত্রিপুরার কথকাংশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু তথনও তথায় রাজ্য স্থাপন করে নাই।

নারায়ণ শব্দ কোচবিহার রাজপরিবারেই দৃষ্ট হইত। ইহাই জানা যায়।

এখন মোগলাধিকৃত বঙ্গদেশের কথা বলা যাইতেছে। বাদসাহী শাসন সময়ে বঙ্গদেশে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ একজন সুবেদর অবস্থান করিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষের ভার ও তৎপ্রতি অর্পিত হইত বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে দিল্লী হইতেও নূতন নূতন সেনাপতিগণ আগমন করিয়া সুবেদারের সাহার্য্য করিতেন।

সুবেদারের পরেই দেওয়ান, তৎপরে নায়েব দেওয়ানের পদ ছিল, বাদসাহের দেওয়ান উজীর নামে খ্যাত ছিলেন। প্রধান সেনাপতির নাম ছিল সরলস্কর, রাজস্ব বিভাগে বহু তহশীলদার ছিলেন, তাহাদের উপাধি ছিল, সীকদার, মজুমদার, চাকলদার, চৌধুরী ইত্যাদি সাধারণতঃ এককোটি দাম যে সকল মহলের আয় ছিল তাহাতে যিনি নিযুক্ত হইতেন তাহাদের উপাধি ছিল "ক্রোড়ী" এককোটি দামের মুল্য এখন আড়াই লক্ষ টাকা। টাকশালের প্রধান অধ্যক্ষের নাম ছিল দারোগা আমরা কিন্তু এখন পুলিশষ্টেনের ভার প্রাপ্ত প্রাধান কর্ম্মচারিকে দারগা বুঝি তাহার সহকারীর নাম ছিল সরফে। রাজস্ব, মুদ্রা বা শস্তের দ্বারা আদায় হইত। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ অর্থ দ্বারাই রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল।

তৎপর শাসন বিভাগ—চারিটী, পাঁচটী, ছয়টী, পরগণা একত্র করিয়া তদুপরি একজন ফৌজদার নিযুক্ত করা হইত, প্রত্যেক পরগণায় একজন কাজী থাকিতেন। ফৌজদারের সদর থানায় দুইজন কাজী, দুইজন মীরঅদন, দুইজন মুফুতী, দুইজন মৌলবী, দুইজজ, মুন্সী নিযুক্ত থাকিতেন। কাজি বিচার করিতেন, মুন্সী জবানবন্দী লিখিতেন, মুফুতী আইন সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, মুফুতী কতকটা বর্ত্তমান সময়ের উকীলের ন্যায়, মৌলবী আইনের বিধানগুলি কোথায় কোন ভাবে খাটা উচিত তাহা বলিয়া দিতেন। মীর আদন রায় পাঠ করিতেন।

প্রধান শান্তিরক্ষকের নাম ছিল কোতোয়াল, বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে দারগা বা সবইনস্পেক্টার বলে। বহু তদন্তের ভার থাকায়, তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি দেখিতেন, মদ, গাঁজা, ইত্যাদি নেশার বস্তু প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় না হয়; রাজপথে কেহ মাতলামী না করে; মহিলাগণের লজ্জাশীলতার বিঘ্ন কেহ না করিতে পারে; বেশ্যাপল্লীতে অধিকসংখ্যক পাহারা যাহাতে নিযুক্ত থাকে; ভদ্র-পল্লীর অভ্যন্তরে কেহ গণিকাসহ গমনাগন না করে; ঐ সকল পল্লীতে যাহাতে অশ্লীল গীত না হয়; কসাইখানা নগরের বহির্ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়; মহিষ, উষ্ট্র, বিশেষতঃ গো বধ যাহাতে না হয়। স্ত্রীর অনিচ্ছা স্বত্বে তাহাকে মৃত পতির সহগামিনী করিতে না পারে; চৈত্র অথবা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে জীব হত্যা না হয়; ইত্যাদি।

আকবর সাহের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী, যে কোন সুসভ্য রাজ-বিধান হইতে কোনরূপও নিকৃষ্ট ছিল না। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির গণের প্রতি কেহ কোনরূপ অবমাননার কার্য্য করিতে না পারে কোতোয়ালিকে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইত। এই সময়ে শূলদণ্ডের প্রথা রহিত হইয়া যায়।

দেওয়ান, মীরবকসী প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ বাদসাহ দরবার হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল বিভাগে বিশেষ বিশ্বাসী, সুপণ্ডিত ও সদ্‌বংশজাত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতেন।

সৌনিক বিভাগের উচ্চ পদে, বহু হিন্দু নিযুক্ত চিলেন, এইরূপ প্রায় অর্দ্ধশত লোকের নাম অবগত হওয়া যায়; যাঁহারা সাতহাজার হইতে একসহস্র সেনার সেনাপত্য কার্য্যে বরিত ছিলেন তন্মধ্যে রাজা তোড়রমল্ল ও রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারী পদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হন।

শিক্ষাবিভাগের প্রতি ও বাদসাহ সরকারের দৃষ্টি না ছিল এই কথা বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক জেলাদার বা ফৌজদারের অধীনে একটী করিয়া 'মথতব বা বিদ্যালয়' সংস্থাপিত থাকিত ঐ সকল বিদ্যালয় প্রায় মসজিদের সংসৃষ্ট ছিল। জমিনদার বা জায়গীর দারগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে জাতি অনুসারে, পারস্য ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভদ্রপল্লী মাত্রেই দেশীয় পাঠশালা সংস্থাপিত ছিল, তথায় গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে, অঙ্ক, জমিদারী ও মহাজনী হিসাব, পাট্টা, কবুলিয়ত, কর্জ্জপত্র, আদি লিখন পঠন ও জরিপ প্রণালী শিক্ষা দিতেন। তৎকালে অমনোযোগী ও দুষ্ট বালকগণ বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

ব্রাহ্মণগণ, ব্যাকরণ, কোষ, তর্ক, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, দশকর্ম্ম-পদ্ধতি শিক্ষা করিতেন। বৈদ্যেরা ব্যাকরণ, কোষ, কাব্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সাধারণতঃ কবিরাজী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে রত হইতেন। উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা টোল খুলিয়া ছাত্র অধ্যয়ন করাইতেন। ছাত্রেরা কোনরূপ বেতন প্রদান করিতেন না, বরং ঐ সকল পণ্ডিতেরা ও গ্রামস্থ বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা উহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিলে, তাহারা এই কালের মতনই উপাধি পাইতেন। তৎকালের প্রধান প্রধান কয়েক জন ব্যক্তির উপাধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

যে পণ্ডিত বরের পরামর্শ অনুসারে রাজা কংশনারায়ণ প্রথম দুর্গোৎসব প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার নাম ছিল রমেশশাস্ত্রী, রাজা মানসিংহ শিলাদেবীর অর্চ্চনার জন্য এ দেশ হইতে যাহাকে অম্বরে লইয়া যান তাঁহার নামছিল রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম, চাঁদ ও কেদার রায়ের

পুরোহিতের নাম ছিল কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার, রাজা প্রতাপাদিত্যের গুরু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন; এই সকল উপাধি বর্ত্তমান সময়েও চলিত আছে। তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞ এইরূপ শত শত পণ্ডিত যে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ দ্বারা এই কালে অনেক বঙ্গকাব্য বিরচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিগণের অমৃতনিস্যন্দ বীণার ঝঙ্কারে বঙ্গকানন তৎকালে যথার্থই মুখরিত হইয়া উঠিয়া ছিল এই জাতিত্রয় ব্যতীত অপরাপর জাতি এমন কি মুসলমান কবিগণ পর্য্যন্ত এই কবি-কুঞ্জে প্রবেশ লাভ করিয়া বঙ্গভাষার বিশেষ গৌরব সংসাধন করিয়া ছিলেন।

পুরমহিলাগণের শিক্ষারীতি একেবারে ছিল না তাহা বলা যাইতে পারে না। বড়ঘরের ও পণ্ডিতগণের গৃহের কোন কোন ললনার সুশিক্ষার কথা অবগত হওয়া যায়। রাজা গনেশের হিন্দুস্ত্রী বিদুষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মতিগতি, শ্বশুর, শ্বশ্রু, ও পতি সেবার এবং গৃহস্থালীর প্রতিই অধিক পরিমাণে আকর্ষিত হইত। গুরুজনের, উচ্চবর্ণের, বিদ্বানের ও বয়োধিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই করিতেন। রাজা সকলেরই ভক্তির পাত্র ছিলেন।

আকবর বাদসাহের রাজত্বের পূর্ব্বভাগে হিন্দুরা পারস্য ভাষা শিক্ষার প্রতি ততটা মনোযোগ প্রদান করিতেন না, মুসলমান সম্প্রদায় ত সংস্কৃতের কোন খোজখবর রাখিতেন না। বাদসাহ এই প্রথার প্রতি মনোযোগী হইয়া যাহাতে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়ন চলিতে পারে তজ্জন্য যত্নবান্ হন। তাহার ফলে হিন্দুগণ পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু মুসলমানেরা ততটা যত্নবান্ হন না। কয়েকজন মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ফৌজি ও

আবুল ফাজেলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, এই দুই মহাত্মা, রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ পারস্য ভাষাতে করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে শক ও সংবৎ হিসাবে বৎসর গণনা হইত। পরে মুসলমান এধিকার কালে পরগণায়তি সনের প্রথা প্রচলন হয়। মুসলমান অধিকার কালেই আমাদের দেশে পরগণা উদ্‌ভব হয়। সেই হিসাবে ১২০১ খৃষ্টাব্দে এই সনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ৭১০ পরগণাইতি সন হইয়াছে। আমরা যোড়শ শতাব্দীর কোন দলিল প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকখান দলিল হইতে এই বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পরিশিষ্ট ভাগে উহা সন্নিবেশিত করা যাইবে।

সাধারণতঃ মুসলমান শাসন কালে হিজরী সনের প্রচলিত ছিল। আকবর বাদসহের রাজত্ব কালে হিন্দু সম্প্রদায়, বাদসাহ নিকট জ্ঞাপন করেন, হুজুর আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণাদি বা কার্য্য কর্ম্মে হিজরী সন ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমাদের জন্য আর একটী পৃথক সন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। মহাযশা আকবর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন তিনি হিন্দুপ্রজার মনরঞ্জনার্থ হিজরী হইতে দশ, এগার বৎসর ন্যূন করিয়া এলাহি নামে আর একটী সনের প্রচলন করিলেন, যাহা আমাদের বঙ্গদেশে সন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিজরী ১৩২৯।৩০ চলিতেছে একক বাঙ্গালা ১৩১৮ সন। যোড়শ শতাব্দীব এই সন পরিবর্ত্তণ ব্যাপারও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে ১২০১ খৃষ্টাব্দে পরগণা বিভাগ আরম্ভ হয়।

এই শতাব্দীতে হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এই তিন

সম্প্রদায়ের লোকই অধিক ছিলেন, সৌর বা গাণপত্যের সংখ্যা তত দৃষ্ট হইত না বলিয়াই অনুমিত হয়। হিন্দুর প্রধান পর্ব্ব সারদীয় দুর্গোৎসব—তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ দ্বারা এই কালে প্রথম প্রচলন হয়। উহারি অব্যবহিত পরে ভাদুরিয়ার রাজা জগৎ নারায়ণ বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। বর্ত্তমান সময়ে সারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে যেরূপ দেশব্যাপী ঘটা হইয়া থাকে, তৎকালে বসন্তের শুভাগমন সহিত, বাসন্তী দুর্গোৎসব ও হোলি পর্ব্বের অনুষ্ঠান সেই ভাবে সম্পন্ন হইত; এজন্য ঐ দুইটী উৎসব উপলক্ষ করিয়া রাজকীয় অফিসাদি তৎকালে কতকদিনের জন্য বন্ধ থাকিত। তখন বিদেশ-বাসী হিন্দুগণ প্রবাস হইতে স্বদেশে গমন করিয়া কতক দিনের জন্য ও আত্মীয় পরিজন গণসহ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া যাইতেন। বিশেষ বর্ত্তমান সময়ের মত তৎকালে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে অবস্থান করার প্রথা ছিল না, কাযেই অধিকাংশ প্রবাসী এইকালে বাড়ী যাইবার লোভ কোনরূপেই পরিত্যাগ করিতেন না।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের প্রচলন এইকালে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। ব্রহ্মানন্দ গির্, সর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা, গোসাঞী ভট্টাচার্য্য, অর্দ্ধকালী সন্তান, বিল্বপুষ্করিণীর ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা এই শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কৃত শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী, সর্ব্ববিদ্যা প্রণীত সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী এই সময়ে বিরচিত হয়। রাজগণ ও অধিকাংশ বড়লোক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, তন্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইত বলিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইত না। অপরদিকে চৈতন্য সম্প্রদয়ীগণ দ্বারা বৈঞ্চব ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বৈষ্ণবকবি গোপালভট্ট গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, গোবিন্দ দাস জয়ানন্দ, যদুনন্দ দাস, জ্ঞানদাস রায় বসন্ত

প্রভৃতি মহাত্মাগণের ধর্ম্মপ্রচার ও সুধাময়ী কবিতা হইতে এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ওপ্রচুর উন্নতি সংসাধিত হয়। *

এই কালে দেবালয় প্রতিষ্ঠাত প্রতিনিয়তই হইত, আঢ্য হিন্দু মাত্রেই স্ব স্ব গৃহে শিলাচক্র সংস্থাপন করিতেন ; বড়লোকেরা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বিগ্রহ সংস্থাপন করিতেন, অর্চ্চনার জন্য দেবত্র ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল মন্দির, মঠ ইত্যাদি নির্ম্মাণ নিবন্ধন দেশে স্থাপর্য্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে হিন্দু তীর্থ যাত্রী হইতে বাদসাহ সরকারে একরূপ কর আদায় হইত। আকবর সেই প্রথা রহিত করিয়া দেন। হিন্দুরা চিরকাল তীর্থানুরক্ত, এই প্রথা তিরোহিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের তীর্থ পরিভ্রমণ করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

হিন্দু সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া মুসলমান হওয়ার রীতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতেই বঙ্গদেশীয় মুসলমানের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয় কিন্তু তিন জন সুবিখ্যাত উচ্চবংশ জাত হিন্দু এই শতাব্দীতে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মসলেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রথম রাজা গনেশ যিনি পরে গয়েস্‌উদ্দীন নামে পরিচিত হইয়া একরূপ গৌরের স্বাধীন নরপতি হন। ২য় রাজাচন্দ্র পরে কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত হন, তৎ কর্ত্তৃক উরিষ্যার স্বাধীনতা ধ্বংশ হইয়া মুসলমান রাজত্বে পরিণত হয়। বাঙ্গালার বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি তৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ৩য় কালীদাস গজদানী, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া সুলেমান নামে পরিচিত হন ও সুবর্ণ গ্রামের

* এইটি কতকটা আকবর সাহের রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা।

এক স্বাধীন জমিদার বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। সুবিখ্যাত ঈশা খাঁ মসনদ ইয়ালী ইহারই বীর পুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তৃতীয় ব্যক্তি অযোধ্যা দেশীয় রজঃপুত বলিয়া পরিচিত।

মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ, হিন্দু ধর্ম্মে যোগদান না করিত তাহা নয়; তবে রাজ শাসন ভয়ে উহাতে কেহ অগ্রসর হইত না, মুসলমান হিন্দু হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত কিন্তু মুসলমান মহিলার জন্য এই নিয়ম ছিল না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গারামশর্ম্মা মুসলমান স্ত্রী ভুষণা ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে ভেক প্রদান করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই জন্য আবদুলের প্রাণ দণ্ড হয়। গঙ্গারাম ভূষণার সহিত একত্র বাস করিতেন, এই জন্য তিনি হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হন। কতকদিন পরে ভূষণার মৃত্যু হইলে পর গঙ্গারাম স্ব সমাজ প্রবেশলাভ জন্য সিন্দুরিয়া নিবাসী বারেন্দ্র রাজার স্মরণাপন্ন হন। বিধি ব্যবস্থা মতে রাজা গঙ্গাইকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্ব সমাজে গ্রহণ করেন, কিন্তু সমুদয় বারেন্দ্র সমাজ উহাতে সম্মত না হওয়ায় দলাদলীর সৃষ্টি হয়। এই হইতে সিন্দুরিয়ার রাজসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ ভূষণাই পটী, নামে অভিহিত হন। যাহা আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র মত প্রায়শ্চিত্ত হইলে পরও যে আমাদের দেশীয় সমাজিকগণ একটা দলাদলীর সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাহা বহু কাল হইতেই অবগত হওয়া যায়; পক্ষান্তরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী গণের ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। *

আকবর বাদসাহ কোনরূপ সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার ইচ্ছাছিল বিবাহের পণাপণ বার টাকায় অধিক না হয়। সতীদাহ নিবারণ হয়, এবং অল্প বয়সে যাহাতে বালিকাদের

* এইটি আকবরের রাজত্বের পূর্ব্ব ঘটনা।

বিবাহ না হইতে পারে। কিন্তু তিনি উহা আইন বা আদেশ দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহস পাঠ করিয়া এই উপলব্ধি হয়, তখন পর্য্যন্ত বাদসাহ বঙ্গদেশ মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তৎ সময়ে উহার অধিকাংশ পাঠান সর্দ্দার ও ভূঞা উপাধিধারি রাজগণের করায়ত্ব ছিল। তাহারা বাহ্যিক ভাবে সময় সময় বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার কম্বিলেও কার্য্যতঃ কোনরূপ বাধ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেন না। "কল ও উইলফোর্ড" এ সম্বন্ধে যে বিবরনী প্রদান করিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় ভাগিরথী ও পদ্মা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার "বদ্বীপ" আকৃতি বিস্তৃত ভূভাগ মধ্যে এই দ্বাদশ ভূম্যাধিকারিগণ রাজত্ব করিতেন। এইটী ঠিক কথা নয়, কারণ বিক্রমপুর, সোণার গাঁ, ভাওয়াল, ভুলুয়া প্রভৃতি স্থান পদ্মার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ছিল। ফারনেল ডের লিখিত বিবরণ হইতে, আরাকান, চণ্ডীখান, শ্রীপুর এই তিনটী পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম কবগত হওয়া যায়। পাদ্রী সুইট ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন তৎ সময়ে তিনি স্থানীয় দ্বাদশ জন মধ্যে নয় জন মুসলমান, তিন জন হিন্দু জমিদারের নাম উল্লেখ করেন, শ্রীপুর, চণ্ডীখান ব্যতীত, রালফফিসবাকলার নাম উল্লেখ করিয়া ছিলেন। শ্রীপুর বিক্রম পুরের রাজধানী, চণ্ডীখান (যশোহর) বাকলা এই তিনটী হিন্দু রাজ্য ও তখন পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ ছিল। ফতেয়াবাদের মুকুন্দ রায় ও প্রথম মোগল শাসন মান্য করিতেন পরে বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন। ঈশা খাঁ প্রথম অবস্থায় বাদসহের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়া পরে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ না এদিক না ওদিক এইরূপ মধ্য পন্থী হইয়া দাঁড়ান।

ফলে পরিণামে মোগল বাদসাহই জয়লাভ করেন, তবে আকবরের জীবিত কাল পর্য্যন্ত সমুদয় গোল নিবারিত হয় নাই, জাহাঙ্গীর বাদসাহকে পর্য্যন্ত এই জন্য বেগ পাইতে হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই দেশীয় জনগন, আপনারাই স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া ছিল। তৎ সূত্রে নানাবিধ জাতির নামকরণ হয়। যে ব্যক্তি স্বর্ণাভরণ তৈয়ার করিত তাহার নাম হইল স্বর্ণকার; লোহার দ্রব্য প্রস্তুত কারকের নাম হইল কর্ম্মকার, কাংস্য দ্রব্য যাঁহারা নির্ম্মাণ করিত তাহারা হইল কাঁসারী এইরূপ তৈল ব্যবসায়ী তিলি, শঙ্খব্যবসায়ী শাঁখারী, কুম্ভ প্রস্তুত কারক কুম্ভকার নামে পরিচিত হইল। এইরূপ বহু জাতিতে বিভক্ত থাকিয়া হিন্দুগণ স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইত, ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী কোন দ্রব্যেরই অভাব ঘটিত না। ভূমি উর্ব্বরতা বশতঃ কৃষকেরা অল্লায়াসেই বহু শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। জমির নিরেখ অত্যল্প ছিল। ঈশা খাঁর গুণগান করিয়া তদধিন প্রজারা যে কবিতা রচনা করিয়াছিল, উহার একটি পদে আছে "কাণীক্ষেতে বিকায় চৌদ্দ বুড়ী" অর্থাৎ এক কাণী জমীর খাজনার নিরেখ ছিল চৌদ্দবুড়ী; স্থান বিশেষে দ্বিগুণ থাকিলে উহার খাজনা অধিক দিতে হইত না। সর্ব্বদা ধান চাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত, অন্ন বস্ত্রের জন্য কেহ কখনও কষ্ট অনুভব করেন নাই। তবে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কোনরূপ শস্য না জন্মিলে অথবা নষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে আমদানী কি রপ্তানি হওয়া তৎ সময়ে সহজ সাধ্য ছিল না, এই জন্য নিম্ন-হিন্দুগণ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্ম বিক্রয় দ্বারা ধনীগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সাহাবাজ খাঁর শাসনের প্রথম বৎসর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রালফিচ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া, প্রথম চট্টগ্রাম তৎপরে বাকলা শ্রীপুর ও সোণার গাঁ হইয়া পেগুতে গমন করেন তাহার লিখিত বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় ঐ সকল স্থানীয় রাজগণ সকলেই অমায়িক ছিলেন, খ্রীষ্টান দিগকে যত্ন করিতেন ওগির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে দিতেন। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে ফল, ধান্য, কার্পাস, রেশম উৎপন্ন হইত এবং ঐ সকল দ্রব্য সিংহল, পেগু, মলক্কা প্রভৃতি দ্বীপে প্রেরিত হইত। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিধান করিত। অধিকাংশ লোকেই ধনশালী ছিল; ইহারা সকলেই জেলালউদ্দী আকবরে বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। বাদসাহের সহিত যথন এই সকল রাজগণের যুদ্ধ ছিল তৎকালে রালফ ফীচ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া উহার যে সুখ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ছিলেন। নির্ব্বিবাদ অবস্থায় উহার সুখসম্ভার যে অধিক দৃষ্ট হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ অন্তঃবিদ্রোহ থাকিলেও দেশীয় জনগণ সুখেই দিন কর্ত্তন করিত, তবে যে স্থানে যুদ্ধ বাধিত তথাকার প্রজাগণ নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হইত। যে পক্ষই জয়লাভ করুক প্রজা সাধারণের প্রতি অল্পই দুর্ব্বেবহার হইত; প্রায়ই হইত না। পণ্ডিত ও কবিগণ স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতেন, কারণ দেশীয় ধনী ও জমিদারগণ সর্ব্বদা তাহাদেয় অভাব মোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন; বৃত্তি ব্রহ্মত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সম্পত্তিশালী মাত্রেই জলাশয় খনন, রাস্তা নির্ম্মান ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্যে মুক্ত হস্ত ছিলেন। কোনরূপ যশোলাভের জন্য উহা অনুষ্ঠীত হয় নাই, পুণ্য সঞ্চয়ের সোপান বলিয়াই ঐ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব প্রতিপালন করা যে একটা স্বাভাবিক কার্য্য তাঁহারা ইহাই বিবেচনা করিতেন। গলগ্রহভাবে তাহাদিগকে

গ্রহণ করিয়া সমুচিত যত্ন লইতে কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। কৃপণের নিন্দা বর্ত্তমান সময় হইতে তৎকালে সমধিক ছিল। যশঃ ও নিন্দা ভাট মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। দরিদ্রগণকে দান করা ত নিত্য নৌমিত্তিক ব্যাপার মধ্যেই পরিগণিত ছিল। সামান্য গৃহস্তও একমুষ্টি তণ্ডুল দান না করিয়া, কোন দীন হীনকে বাড়ী হইতে বিদায় করিতেন না, ধনী মাত্রেই অতিথি সেবায় তৎপর ছিলেন।

ষোড়শশতব্দীতে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণের কয়েকখানা কুলজীগ্রন্থ বিরচিত হয়, বোধ হয় মুসলমানগণের ইতিহাস লিখার পদ্ধতি অবগত হইয়া তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা বংশাবলীতেই পরিনত হয়, ক্বচিৎ দুই, চারিটী ঐতিহাসিক তথ্য উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

এইকালে দস্যুদলের উৎপাত বড়ই প্রবল ছিল ধনীগণ সশঙ্কভাবে কালযাপন করিতেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারনের মধ্যে, লাঠী ও কুস্তী শিক্ষার প্রচলন থাকায়, তীর, তলোয়ার, গুললবাশ, বন্দুকের ব্যবহার জানায়, ততটা বিপদ বোধ করিতেন না। কোথাও বা ডাকাইতের দল জয়লাভ করিয়া, গৃহস্তের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইত, কোথাও বা তাহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত, একতরফাকার্য্য প্রায়ই ঘটিত না। অস্ত্র আইনের বাধা বিপত্তি না থাকায়, সকলেই স্ব স্ব গৃহে উহা রাখিতে পারিত, ও আপৎকালে তদ্দ্বারা এই বিপদের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হইত।

স্থল হইতে জলে দস্যু ভয় সমধিক ছিল, আরাকানীয় মগ ও পর্টু-গীস দস্যুদল, প্রায়ই জলে, স্থলে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। ইহাদের উৎপাতে দক্ষিণবঙ্গের বহুস্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই কারনে এবং ১৫৮৪ খৃঃ ব্দের প্রবল ঝটীকায় সমুদ্রজল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গো-

পসাগরের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ ও যশোহর, চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণদিকস্থ স্থানগুলিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে, এই প্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ লোক প্রাণ পরিত্যাগ করে, চন্দ্রদ্বীপের রাজা জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর মহামারীতে ঐ স্থানের অবশিষ্ট জনগণ প্রায় অধিকাংশ লোকান্তরিত হওয়ায় অবশিষ্ট জনগণ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ঐ জনস্থান অরণ্যানীতে পরিণত হইয়া, সুন্দরবন নামে অভিহীত হয়।

মগ ও পটুগীসগণ সাধারণের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, কি বাদসাহসরকার কি দেশীয় রাজগণ সকলেই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেন। সময় সময়ই ঐ সকল মগ, পর্টুগীস দল দেশীয় রাজগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম, হুগলী, সপ্তগ্রাম, তিনটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, ইয়ো-রোপীয় বণিকগণ তথায় কুঠী সংস্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেন। দেশীয় মহাজনগণও তথায় বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এই সকল বন্দর হইতে নানাবিধ শস্য, ঘোড়াঘাটের রেশম বাকরাবাদের গঙ্গাজলী বস্ত্র, সোণারগার কাসা, বস্ত্র ও দাজুহায়ের বরগা, বিদেশে রপ্তানি হইত। চট্টগ্রামবাসীরা জলযান পরিচালনায় দক্ষ ছিল তাহাদের দ্বারা যান পরিচালিত হইত।

অস্ত্র, শস্ত্র, এই দেশেই তৈয়ারি হইত। শ্রীহট্টের ঢাল চির প্রসিদ্ধ, বিক্রমপুর সোণারগায়, কামান বন্দুক প্রস্তুত হইত। ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটিক জার্ণেলে লিখিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে একটী কামান আছে। উহাতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নাম ও "৩১৮" এইরূপ একটী অঙ্কচিহ্ন ও নির্ম্মাতা রূপিয়ার খাঁ সাং শ্রীপুর এই কথাগুলি অঙ্কিত

আছে। এই কামানটী পিত্তল নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন ঢাকার চকবাজারে বহুকাল হইতে আর একটী কামান পতিত রহিয়াছে, নোয়াখালীর অন্তর্গত সহরকস্‌বা (হুদাভূলুয়া) তে কএকটী প্রাচীন কামান দেখা যায়। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত সোণারগার, মনোহরবাগ নামক স্থানে, এক কৃষক হলকর্ষণ কালে ভূগর্ত্তে কএকটী কামানের অনুসন্ধান পাইয়া, নারায়নগঞ্জের সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা অবগত করায় তিনি উহা উঠাইয়া আনিয়াছেন, উহার একটীর গাত্রে ঈশাখা মসনৎআলীর নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল কারণে নিশ্চয় অনুমিত হয়, তৎকালে ঐগুলি স্থানীয় কারিকর দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আইনই আকবরিতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশে লৌহের খণি ছিল, সরকার মাদারণের অন্তর্গত "হান্যান্" নামক স্থানে হীরকের খণি ছিল বলিয়া উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তবে ঐ খণিতে অল্প হীরাই পাওয়া যাইত।

এই শতাব্দীতে সঙ্গীতের চর্চ্চাও সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তানসান বাদসাহের সভায় প্রধান গায়ক ছিলেন। রাজা মানসিংহের দরবারে নায়েক বাস্থ, মঝু ও ভাউনী, এই, তিনজন প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাহাদের দ্বারায় বাঙ্গলায় খেয়াল, টপ্পা, প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে আমীর খসরু খেয়ালের উদ্‌ভাবনা করেন ও মৃদঙ্গকে দুইভাগ করিয়া, তবলা ও ডগির আকারে পরিবর্ত্তিত করেন।

বর্ত্তমান সময়ের মত তখন, যাত্রা, থিয়েটার প্রচলিত ছিল না, কবিগান বা পাচালীরও নিয়ম ছিল না। দেশীয় গোস্বামীগণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি গাহিয়া, গৃহস্থ মাত্রকে তৃপ্তিদান করিতেন। শিবসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় গান বিশেষভাবে

গীত হইত। ধর্ম্মের গান, মনসার গান, শিবের গাজন বাধিয়া গান করিত। হরি সংকীর্ত্তণের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, হিন্দু গৃহস্ত মাত্রেই বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এই গানের দল ডাকিয়া আপন আপন বাড়ীতে হরিনুঠ বিলাইয়া দিত। সভা বিশেষে কালোয়াত, নর্ত্তক, নর্ত্তকীগণ খেয়াল, টপ্পা, গাইয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিত। বড় বড় মজলিসে ফাউগের (আবিরের) সহিত সুগন্ধীজলের সংমিশ্রন দ্বারা সভাসীন গণের বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দেওয়ার রীতি ছিল।

বলিতে গেলে ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয়জনগণ বিশেষ সুখেই কাল কর্ত্তণ করিতে পারিয়াছিলেন। গবাদি পশুচারণের জমি ও সাধারণ-রাস্তারউপযোগী স্থান না রাখিয়া প্রজার নিকট জমি বিলি করা হইত না। ইহাতে গো ও মহিষ ইত্যাদির খাদ্য প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা ছিল। তন্নিবন্ধন উহাদের দুগ্ধেরও প্রাচুর্য্য ছিল। দেশ নদী ও বিল বাহুল্য থাকায় যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যাইত। ধান্যও ডাল প্রচুর উৎপন্ন হইত। সমুদয় জিনিসের মূল্যই অত্যল্প ছিল, কাযেই ভাত, ডাল, মৎস্য, দুগ্ধ প্রায় সকলেই প্রচুররূপে আহার করিতে পারিত। এজন্য জনগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ট ছিল। হায় আজ আমাদের দেশের সেই সুখ, শান্তি এখন কোথায়? সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে ২৪শে আগষ্ট তারিখে মৎকর্ত্তৃক এইটী ব্রাহ্মদেবালয়ে পঠিত হয়। উহার শেষাংশ এইরূপ ছিল :—

আমি আজ অতি সংক্ষেপে ষোড়শশতাব্দীর সাধারণ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমার এমন কোন লিপিচাতুর্য্য বা পদবিন্যাসের ক্ষমতা নাই যাহাতে আপনাদের ন্যায় সুধীমণ্ডলির মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। সাদাসিদা ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। কাব্যের রং

ইতিহাসে প্রতিফলিত করিয়া বাহুল্যতার অবতারনা করাও আমার বাঞ্ছনীয় নয়, অথবা আমার ক্ষমতার অতীত।

অতঃপর আমার বক্তব্য এই যে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ প্রাণস্পর্শী সুগন্ধী ও সুন্দর ফুলের প্রয়োজন ও প্রচুর উপকরণ সমন্বিত নৈবিদ্যের দরকার, আমার মত অক্ষম জনের দ্বারা সে সংগ্রহ কোথা হইতে হইবে? তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সত্যের অপলাপ না হয়, এই শুদ্ধিটুকু লইয়াই এই দেবাধামে প্রবেশ লাভ করিয়াছি। যদি কোথাও সে পবিত্র পন্থা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকি তবে সেইটী আজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়াই আপনারা মনে করিয়া লইবেন। যাহা হউক ইহার একাংশও যদি দেবতার উপভোগ্য হইয়া থাকে তবেই পাঠক নিজকে কৃতার্থ বোধ করিবে।

প্রথম পরিশিষ্ট

(জয়পুরের ইতিহাস ও শিলাদেবী)

জয়পুর কলেজের প্রফেসার নবকৃষ্ণ বাবু ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় নিকট যে চিঠী প্রেরণ করেন যাহা ১৩১২ সনের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশ হয় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। *

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মেঁ বা বণারস কাশীমেঁ জার অমল কানু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো। পাছে পটনামেঁ জা অমল কীনূ ঔর উঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজীমে পৈতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পঠান জগন্নাথজী মাঁহ ছো। জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীসূঁ জারে জগড়ো করি। ফতে পাই। উকা সারা রাজ মেঁ অমল কীনূ। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধান সূ পূজন করায়ো। ঔর স্থাপন কর্যা। ঔর পাছে উমন ছা জীঠে গয়া। সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীরূ গয়া। ঔর মীরূসূঁ জগড়ো করি। মীরূ মে অনল কীনু। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ঔর কুতল মেঁ অমল কীনু সারী পূরব মেঁ অমল কীনূ। অর পূরব মাহঁ ঈসন খাঁ পঠান ছো। জীসূঁ

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার একদশ বর্ষের ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রাম জয়পুর সংস্কৃত কলেজের প্রফেসার মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য এই পত্রের আভাষ প্রদান করেন্ তিনি কিন্তু কেদার রায়কে জানিতে পারেন নাই।

জগড়ো কীন্‌, সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ সমুদ্র পার গয়ো। পাছে উঠা সূঁ চঢ়া স্যো কোম সাটি কা চালা, ব্রহ্মপুত্র গয়া, অর রাজা পরতাপদীপ সূ জগড়ো কীন্‌, অয় ফতে পাই। অর পরতাপদীপকে গড় ছো জীনে খোস্‌ লীনো। অর বেটো দুরজন সিংঘজী মানসিংঘজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রাব পরতাপদীপ-কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ। সরঞ্জাম ভৌৎ ছো। জীসূঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো। সো রাজা বাৱৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সে মাতা কা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিংহজী পুছী—ইসো কাঁইকো বল ছে। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাস্‌তে হোম উগরৈছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন হুই। অর কেদার রাজা সূঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজা হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্যা। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী। অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈয়াঁ তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছল লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সমুদ্র মেঁ নাখি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাখি দীনা ছৈ। সো উঠা সূঁ কাট লীজ্যো মেহ তোসূঁ প্রসন্ন হুবা॥ জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নে মানসিংহ ঘঞ্জীকোঠৌ ভেজ্যো মদীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংঘজী উকী বেটী মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ

ফুরমাই সো থারো রাজ ছে সো তোনে দীনূ। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব স্থকাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো জী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মেঁভী রহস্তোঁ। জীঁ দিন বলদান রোজীনা হোতে রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা স্থঁ কূঁচ করি আয়া"।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনীপুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টী শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরূ গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরূ অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকীম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্ব্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা

হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পরতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভি-হিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গী-কার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপে তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে

করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমায় রাজ্য তোমার দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব॥ যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালিদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।

রাজ স্থানের ইতিহাস ভট্টগ্রন্থ ও চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত; মহাত্মা টড্ চারণদিগের যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া গিয়াছেন। টডের পুস্তক অনুসরণ করিয়া এবং চারণদিগের মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চারণবংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি জয়পুর রাজপুত স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার। তাঁহার পুস্তক হইতে এক অংশ উদ্ধার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার হিন্দি ভাষা সহজেই বোধগম্য হইবে। দুই এক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে অর্থও লিখিয়া দিলাম :—

'তখ্ত পর বৈঠ্ কর সলীমনে অপনা নাম জাহাঙ্গীর রখ্‌খা। উস্‌নে মানসিংজী কো বঙ্গালে কে পূর্ব্বী প্রান্ত মেঁ জো হিন্দুয়োঁকে স্বতন্ত্র

(স্বাধীন) রাজা থে, উন্‌কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংহ জীনে পূর্ব্বী বঙ্গালমে পঁহুচ্‌ কর্‌ পহিলে রাজ্য প্রতাপাদিত্যকে রাজ্য পর চড়াই কী জিস্‌কী সেনামে হাথী বহুৎ থে ; প্রতাপাদিত্যকে সাথ জো লড়াই হুই, উস্‌মেঁ মানসিংহজীকে ছোটে কঁবর (কুমার দুর্জ্জন-সিংজী কাম আয়ে (মারা পড়েন) ঔর প্রতাপাদিত্যজী জীতা পকড়া-গয়া। মানসিংহজী নে উসকো ধীর্জ বন্ধয়া। (আশ্বাস দিলেন, ধীর্জ ধৈর্য্য) ঔর কহা কি আগরে চলকর তুম্হারা রাজ্য তুম্‌ কো হী দিলা দূংগা। পরন্তু দীন প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্‌ কর মার্গমেঁ হী (মার্গ-পথ) কালবশ হুয়া (কাল প্রাপ্ত হইলেন)। মানসিংহজী নে উস্‌কে ভতীজে (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরিরায় কো উস্‌কা রাজ্য দিলায়া।

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্ট থা ; মানসিংহজী কী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুদ্র কী ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্‌ গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হয়) তো মেরী পুত্রী মান-সিংহজীকো দে কর সন্ধি করলেনা ; মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া মানসিংহজীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহ কা পাদসেবী বনা কর কস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে॥

* * * সল্লাদেবী কো মানসিংহজী বঙ্গালেমেঁ সে লায়েথে। বংপাবলিয়োমেঁ (চারণ দিগ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী) লিখা মই কি দেবী নে মান সিংহজী সে কহা থা "মৈঁ তুম্হারে যাঁহা (তোমার স্থানে বা নিকটে) তব তক্‌ হী রহূংগী জবতক্‌ তুম ঔর তুম্হারী সন্তান মুঝে নিত্য এক ছাগ কা বলি দেতে রহোগে, জব তক মৈঁ তুম্হারে যহা রহূংগী তব্‌ তক্‌ তুম্হারে বা তুম্হারী সন্তানকে রাজ্য কো কিসী প্রকার কা ভয়

নহী হৈ।” ইস্ দেবী কা মন্দির আম্বেরকে গড়মেঁ বনা হুয়া হৈ; পূজারী বঙ্গালী হৈ। ঔর অদ্যাবধি নিত্য মূর্ত্তিকে সামনে এক ছাগ কা বলি হোতা হৈ।” (ইতিহাস রাজস্থান, ৩১০৩।৪ পৃষ্ঠা)।

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ মানসিংহের রাজত্ব-কাল বর্ণনা করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন—

"Oosman, Oomar, Meroo, Hakim Khan, Kutloo Khan, Isa Khan and other Pathans had raised a rebillion in the eastern part of the empire, such as Jagannath Puri &c. Mansingh quelled all these Nnw he advanced by sea to the country of Brahmaputra where he defeated the Raja of the land and took the country.

After this he defeated the Kayastha Raja Kaidar Nath (a Shaktik by religion and a favorite of Silla Devi) of Oodey. He then restored his *raj* to him and brought with him the idol of Silla Devi with promises that he would offer the usual sacrifices to it.'

ঈশাখাঁ

ঈশা খাঁর পিতার নাম কালীদাস, এই ব্যক্তি মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্থলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন। ঈশা কোচবিহার পর্য্যন্ত

আক্রমণ করিয়াছিলেন। খিজিরপুরের ৩০ মাইল উত্তরে ঈশাপুর নামে একটী স্থান আছে। উহা ঈশার নামানুসারে হইয়াছিল।

প্রবাদ মানসিংহ ঈশাকে দিল্লীতে লইয়া যান। বাদসাহ ঈশাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানিতেন, এজন্য তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন, কিন্তু পরে মানসিংহ নিকট ঈশার অন্যান্য গুণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে তাহার "দেওয়ান মসনদই য়ালী" উপাধি ও কয়েকটী পরগণার অধিকার প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ঈশা প্রজারঞ্জক ছিলেন, তাঁহার অধিকত্য সময়ে সোণার গাঁ অঞ্চলে বহু খাল ও পুষ্করণী খণিত হইয়া জল সরবরাহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া দেশের শান্তি সংরক্ষণ করিত। এই সময়ে টাকায় ৪৴ মন চাউল বিক্রয় হইত। দুর্ভিক্ষ যে কি তাহা ঈশার প্রজাগণ কখনও বুঝিতে পারেনাই। অতি অল্পহারে প্রজার নিকট কর আদায় হইত। এইজন্য "কাণিক্ষতে লাগিল চৌদ্দবুড়ি" * এই গান করিয়া খাঁ সাহেবের যশ ঘোষণা করিত।

পূর্ব্বে ময়মনসিংহের অন্তর্গত, হাজরাদী পরগণা বা "তজ্জা" সরকার বাজুহারের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। লক্ষ্মণ হাজোনামীয় এক কোচ জঙ্গল বাড়ীর নিকট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

ঈশার্খা এই স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করেন, তথায় তাঁহার আর একটা বাড়ী নির্ম্মিত হয়।

ঈশাখাঁর জীবিত সময়ে একমাত্র বাজুহায়ের উত্তরাংশে সুসঙ্গের রাজগণ, সীমান্ত প্রদেশে আধিপত্য করিতেছিলেন।

---

* ২৮০ কৌড়িতে চৌদ্দবুড়ি হয়।

১৫৯৮ খৃঃ অব্দে বীরবর ঈশা কালগ্রাসে পতিত হন (আইনই আকবরি ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা)

প্রবাদ ঈশার হিন্দুস্ত্রী সোণাবিবি মগদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলে, প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সোণাকান্দার দুর্গ, এই বীরললনা সোণাবিবির দ্বারা বিনির্ম্মিত হয়। খিজিরপুরের দুর্গও সুন্দর মসজিদ, গোয়ালদীর মসজিদ, প্রভৃতি এই শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশার্খার দুইপুত্র ; প্রথম দেওয়ান মুসাখাঁন, দ্বিতীয় দেওয়ান মহম্মদ-খাঁন। মুসাখানের জ্যেষ্ঠপুত্র মাসুম খাঁ, ইহার সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, হুগলীর অবরোধকালে (১৬৩২ খৃঃ অব্দে) ইনি মোগল জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পাদসা নামেতে জানাযায় আসাম আক্রমণ কালে মাসুম খাঁ ২৫ খানা কোষা নৌকা মোগল সৈন্যাধ্যক্ষকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। মাসুম খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মনোর খাঁ।

এই মনোর খাঁর নামানুসারে দেওয়ান বাগ বা মনোর খাঁর বাগ নামে একটী স্থান নরায়ণগঞ্জের ৭ মাইল পূর্ব্বকোনে বিদ্যমান আছে। বিগত ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখে একজন কৃষক হলচালনাকালে এই স্থলের ভূগর্ভে সাতটী কামান প্রাপ্ত হইয়া, নারায়ণগঞ্জের সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই সংবাদ প্রদান করে, আফিসার উহা আনয়ন করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করেন। ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, মিঃ এইচ্, ই, ষ্টেনলটন, বি, সি, এস্ প্রতি উহার সময় নিরূপণ প্রভৃতি ভার অর্পিত হয়। এই কামান কতকটা পিত্তল নির্ম্মিত। ইহাতে ঈশা খাঁর নাম ও ১০০২ এই সখ্যা অঙ্কিত আছে। উহা বোধ হয় হিজীরীসন হইবে।

ত্রিপুরা

স্বনাম বিখ্যাত প্রদেশ, মহাভারতের সময় হইতে এই রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন বলিয়া পরিচিত ছিল, বর্ত্তমান সময়েও উহার কতকাংশ স্বাধীন ত্রিপুরা নামে উক্ত হইয়া থাকে।

আইনই আকবরিতে উল্লেখ আছে "ভাটী প্রদেশের সীমান্তেই ত্রিপুরার রাজার বিস্তৃত রাজ্য। এই দেশের রাজার নামে মাণিক্য উপাধি সংযুক্ত আছে এই দেশের রাজার এক সহস্র হস্তী ও দুইলক্ষ পদাতি সৈন্য আছে, এই রাজ্যে অশ্বারোহী সৈন্য নাই বলিলেই হয়। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য। (আইনই আকবরি) এই মাণিক্য উপাধি সম্বন্ধে ডাকতার ওয়াইজ লিখিয়াছেন "প্রবাদ এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাদসাকে কতকগুলি (রত্ন) উপহার প্রদান করায়, বাদসাহ তাহাকে "লাল" এই উপাধি প্রদান করেন। কারন পারস্য ভাষায় মাণিক্যকে "লাল" বলিয়া থাকে। রাজারা এই "লাল" উপাধি পারস্য শব্দ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃত মূলক মাণিক্য উপাধিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় "লালা" এই উপাধিটীও "লাল" এই শব্দে লা অপভ্রংশ হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। সুজাউদ্দীন খাঁর নবাবী সময়ে মীরহবীব ত্রিপুরার কতকাংশ মোগল গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত করেন, তাহাতে এই ভূভাগের কতকাংশ মোগলরাজ্যের অন্তর্গত হইয়া, মোগলান নামে পরিচিত হয়।

কোচবিহার

সুবেবাঙ্গার উত্তর পূর্ব্বদিকে কোচরাজ্য। এই রাজ্যে একসহস্র অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। কামরূপ এই রাজ্যের

অন্তর্গত। তত্রত্য অধিবাসীগণ অতি সুশ্রী এবং তাহারা ভোজবিদ্যায় পারদর্শী। এই দেশ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। তথায় এক প্রকার পুষ্প জন্মিয়া থাকে যাহার সুগন্ধি পাঁচ, সাতমাস পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে (আইন আকবরি)

বিশ্বসিংহ ১৪৯৮—১৫০৮ পর্য্যন্ত পরে তৎপুত্র নরনারায়ণ ১৫২৮ খৃঃ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি স্বনামে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচার করেন। ১৫৫০ খৃঃ অব্দে এই রাজবংশ দ্বারা কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৫৮৪ খৃঃঅব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে কোচবিহার প্রদেশ ও ভ্রাতুস্পুত্র রঘুদেবকে আসাম প্রদেশ প্রদান করিয়া যান। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে নবাব ইসলাম খাঁ তাহাকে পরাজয় করিয়া বন্দী করেন ও আসাম মোগল রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লন। বর্ত্তমান সময়ে উহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনরাজ্যরূপে পরিগণিত।*

আরাকান

"সুবেবাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্বে আরাকান রাজ্য; চাটগাঁ বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্যে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্ব বড় মাহার্ঘ্য! উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এখানে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এদেশে গাভী বা মহিষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার লোকে গাভী জাতীয় এক প্রকার জন্তুর দুগ্ধ ব্যবহার করে। এদেশের লোক না হিন্দু না মুসলমান জমজ ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ এদেশে প্রচলিত আছে। মাতা পুত্রে ব্যতীত আর সকলের সঙ্গে সকলের বিবাহ হইতে পারে।

* মানসিংহ কর্ত্তৃক কোচবিহার আক্রান্ত হয়, তিনি কোচবিহারের রাজকন্যাকে গ্রহণ করিয়া, সন্ধি করিয়া চলিয়া যান।

এদেশের লোকে তাহাদের পুরোহিত "ওয়ালীর" সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ। এখানকার রাজদরবারে স্ত্রীলোকেরা প্রহরীর কার্য্য করে, পুরুষেরা গৃহে বসিয়া থাকে। আরাকানের নিকটেই পেগু প্রদেশ। এই দেশে শ্বেত-হস্তী পাওয়া যায়। এই দেশে বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতুর খণি আছে; সেই খণি লইয়া ইহাদের সহিত আরাকানবাসিগণের সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে"। (আইনই আকবরি)

ষোড়শশতাব্দিতে ত্রিপুরা, কোচবিহার, আসাম, আরাকান, বাঙ্গলা প্রান্তবর্ত্তী এই কয়েকটী রাজ্য স্বাধীন ছিল।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইব্রাহিমপুর

সুবেবেহারের অন্তর্গত, পাটনার নিকটবর্ত্তী। ইব্রাহীম আবুবেকার মালিকভূঞা এই স্থানে একটী দরগা স্থাপন করেন; উহা নগরের উত্তর পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের উপর সংস্থাপিত। সম্ভবতঃ এই ইব্রাহিমের নামানুসারে এই স্থলের নাম হইয়াছে ইব্রাহীমপূর। জার্নেল ১৮৭৩। ৩০০ পৃষ্ঠা

ঈশ্বরীপুর

বড়গঙ্গার তীরস্থ ধূলীয়াপুরের দক্ষিনাংশে, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। এসিয়াটীক জার্নেল ১৮৭৩। ২২৭ পৃষ্ঠা

আবদুল্লাপুর

বিক্রমপুরের অন্তর্গত; এই স্থান রামপাল হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে।
(এসিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।৪৩ পৃষ্ঠা)

একডালা

সোণারগাঁর ৩ মাইল পশ্চিমে এবং ঢাকা হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে খিজরপুরের অন্তর্গত। ১ম সোণাকান্দার দুর্গ, ২য় হাজি-

গঞ্জের দুর্গ অতিক্রম করিয়া পরে দেশাভ্যন্তরে একডালা দুর্গের সংস্থিতি, এই স্থানে একটী মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদ দেখা যায়, উহা জাহাঙ্গীর বাদসাহের একতনয়া দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

(এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৪।২১২ পৃষ্ঠা)।

এতদ্ভিন্ন দিনাজপুর, বগুরা ও রাজসাহীতেও একডালা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুরের একডালা দুর্গ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু দিনাজপুরের এই স্থানটীর নাম যোগডালা বলিয়া জানা যায়।

এগারসিন্ধু

নারায়ণগঞ্জের নিকট। লক্ষা ও ব্রহ্মপুত্রনদের সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গ ছিল; এই স্থানে ঈশা খাঁর সহিত মানসিংহের একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (এসিয়াটিক্ জার্ণেল ১৮৭৪।২১৩ পৃষ্ঠা)।

কলাগাছিয়া

স্বনামখ্যাত নগরের তীরে একটি দুর্গ, যাহা সোণার গাঁ হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিতি ছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রীপুর হইতে উহা অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না।

(এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৪।৮৭ পৃষ্ঠা)।

কর্ত্তাভুপুর

সরকার বাজুহারের অন্তর্গত একটী তপ্পা বা পরগণা (১৮৭৪। ২১৪ পৃষ্ঠা জার্ণেল)

লক্ষানদীর তীরে অধুনা তপ্পানামে প্রসিদ্ধ খিজিরপুরের বিপরীতদিকে। (এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৫। ১০৮ পৃষ্ঠা)

কালীগঞ্জ

সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বর্ত্তমান রঙ্গপুরের অধীন। ভাওযাল পরগণার অন্তর্গত ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী স্থানের নামও কালীগঞ্জ বলিয়া জানা যায়।

কচুয়া

বাখরাগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাউফলথানার অধীন, তেতুলিয়া নদীর পশ্চিমতীরে। (লঙ্গসিলেকসন ১৭৪৮ খৃঃঅব্দ) বিভারিজবৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তিনি এই স্থানে একটি ভগ্নমন্দির দেখিয়াছিলেন। (বাখরগঞ্জের ইতিহাসে ৭২।৭৩ পৃষ্ঠা)

কাকষাল

Stewarts History of Bengal Footnote on Pages 198-99

"গঙ্গানদীর উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত কাকষাল দেশনামে প্রসিদ্ধ ছিল। ডাঃ বুকানন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঙ্গানদীর উত্তর পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে জনসাধারণের অবস্থার বিবরণ ঘটিত জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে এই সকল নগরে মোসলমানের সংখ্যাদৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। উহারা আফগান এবং ককেসেলানদিগের বংশধর হওয়াই খুব সম্ভব এবং দুইশত বৎসরের মধ্যে হিন্দু সংমিশ্রনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যে হেতু ১ম হিন্দুস্ত্রী হইতে উৎপাদিত সন্তানাদি ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময়ে উহারা, বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক বালক ক্রয় করিয়া মোসলমান ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত। এই সকল বালকগণ এবং যাহারা স্বীয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোসলমান ধর্ম্মাবলন করিত তাহারা আরবদেশীয় "শেখ" উপাধি ধারণ করিত।

বোধ হয় তাহাদের সন্তান সন্ততিবর্গ আদিম বিশুদ্ধ মোসলমানগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক।"

কোঙর সুন্দর বা কুমারসমন্দ

তোটকের বীপরিতদিকে ব্রহ্মপুত্রের অপর তটে।

ইলিয়ট V. VI. Page 74

আইন আকবরি পাঠে জানাযায় যে সোণার গাঁর অন্তর্গত কাটা সুন্দর নামক স্থানে একটি জলাশয় ছিল, যাহার জলে মলিন বস্ত্র পরিস্কৃত হইত। এই কুমার সমন্দকিসেই কাটা সুন্দর?

কোকরা

বর্দ্ধমান জেলার ১৮ মাইল উত্তরদিকে পাহারের মধ্যবর্ত্তী স্থান। (ইলিয়ট)

খিজিরপুর

নরায়ণগঞ্জের একমাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে, এই স্থানেই ঈশা খাঁর এক দুর্গ ছি। (এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৪। ২১১ পৃষ্ঠা), পরে মীরজুমলা কর্ত্তৃক তথায় আর একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। যাহা খিজিরপুরের কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ। (ষ্টুয়ার্ট ৩৩২ পৃষ্ঠা) ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে মীরজুমলা আসাম বিজয়ে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (ষ্টুয়ার্ট ৩৩২ পৃষ্ঠা)

বর্ত্তমান সময়ে খিজিরপুরান্তর্গত কতকস্থান গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের অন্তর্গত; তৌজিরনম্বর ৯৮৭১ উহা দুইভাগে সার্ব্বে হইয়াছে।

(১৮৬৫ সনের সার্ব্বে)

ঘোড়াঘাট

টোডমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে উহা একটি সরকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। সদর স্থান ছিল খাসনসরতাবাদ সহর। ঘোড়াঘাট চেকগাণ্ডী; করোতোয়ার দক্ষিণদিকে। সম্প্রতি দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুরা জেলায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। "দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে" ইহার রাজস্ব ছিল ৮৩৮৩৭২ দাম। (আইন) ও ইলিয়ট ৫ম খণ্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা

গড়িয়া বা ঘাড়ী

সাতগার নিকট পদ্মা ও ভাগীরথী বিভক্ত হইয়া বরাবর সুতী পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে অগ্রসর হইয়াছে তৎপর ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী হইলে ঐ নদীতীরে গড়িয়া বা ঘাড়ী নামক স্থান। "ঘড়ি" বাঙ্গলার দ্বার স্বরূপ পার্ব্বত্যময় প্রদেশ, রাস্তার প্রশস্ততা মাত্র এইরূপ যে একজন অশ্বারোহী সহজে চলিতে পারে না। অন্যদিকে কতকগুলি নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হওয়ায় উহাও সহজে অনতিক্রমনীয়।

(ইলিয়ট ৭ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

চৌযা

কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল পশ্চিমোত্তর; বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেসন।

চুটীয়া

ছোটনাগপুর; ইহার অন্তর্গত সিংহভূম, চৌবাসা প্রভৃতি স্থান। এতদ্ভিন্ন চুটিয়া পটিয়া নামে মালদহ জেলায় একটি স্থান আছে।

(এসিয়াটিক জার্ণেল ২১৩ পৃষ্ঠা)

চণ্ডভণ্ড

সুন্দরবন দেখ।

জলেশ্বর

উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি সরকার। টোডরমলের বন্দোবস্ত অনুসারে উহার রাজস্ব ছিল ৫০০৫২ দাম মহালের সংখ্যা ছিল ২৮। অধুনা বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত।

জগদ্দন

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চন্দননগরের অপরপারে আজিও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। অপরজগদ্দন রাজমহল নামে খ্যাত প্রতাপাদিত্যের নিখাত রাজপুষ্করিণী আজিও বর্ত্তমান আছে।

জাহানাবাদ

সরকার মাদারনের অন্তর্গত দারকেশ্বর নদীর তীরে বর্ত্তমান সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা সবডিভিসন (ষ্টুয়ার্ট ২০৫ পৃষ্ঠা)

ঝারখণ্ড

ময়ূরভঞ্জ হইতে ছোটনাগপুরের সমস্ত স্থান ঝারখণ্ড নামে পরিচিত। দেওঘর ও বৈদ্যনাথ উহার অন্তর্গত মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে উহার পরিচয় আছে যথা—

"ঝারখণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর তথৈব চ
বীরভূমৌ সিদ্ধনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ"

ঝুন্দ

সাসীরামের নিকটবর্ত্তী স্থান। (সাসীরাম দেখ)

তাজপুর

সরকার তাণ্ডার অন্তর্গত ও সরকার সোনারগার অন্তর্গত দুইটী তাজপুরের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথমটীর রাজস্ব ছিল ২০১৯৯৭ দাম দ্বিতীয়টীর রাজস্ব ছিল ৪৫৪৩৪ দাম। এতদ্ভিন্ন সরকার তাজপুর মহানন্দার পূর্ব্ব, ইহার রাজস্ব ৬৪৮৩৮৫৭ দাম। আইন আকবর ও এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৩।২১৫ পৃষ্ঠা।

ত্রিবেণী

গঙ্গা' যমুনা ও সরস্বতী সম্মিলনে যেরূপ এলাহাবাদ ত্রিবেণীনামে বিখ্যাত। আবার ঐ নদী ত্রয়ের বিচ্ছেদ নিবন্ধন নবদ্বীপের নিকট আর এক ত্রিবেণীর পরিচয়। তদ্রূপ ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষা এই নদ ও নদী ত্রয়ের পরস্পর সম্মিলনহেতু, ঢাকা জেলার অন্তর্গত নরায়ণগঞ্জের সন্নিকটে, সোণার গাঁ পরগণাতে এই ত্রিবেণীর পরিচয়।

(এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৪।৯৫ পৃষ্ঠা)

তাড়া বা তাণ্ডা

তোডড়মল্লের বন্দোবস্তে উহা একটি সরকার বলিয়া পরিচিত হয়। ইহার রাজস্ব ছিল ২৪০৭৯৩৯৯ দাম। এতদ্ভিন্ন রেনেল গৌড়ের নিকটে পাগলা নদীর তীরে তাণ্ডার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে গঙ্গা এই স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত তাণ্ডা রাজস্ব ২১৪৪৪৩ দাম।

"তাণ্ডা গঙ্গানদীর তীরে, গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি স্রোত সাতগাঁ ও উড়িষ্যার দিকে অপর ধারা মহম্মদাবাদ, ফতেয়াবাদ ও সোণারগাঁর অভিমুখে প্রবাহিত ছিল।" (ইলিয়ট)

তুকারো বা তুকারাম

মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারী (ব্লকম্যান)। আমরা দুইটি মোগলমারীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১ম কাঠালবাড়ী, মোগলমারী, কোচবিহারের অন্তর্গত। ২য় বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যবর্ত্তী। তুকারো বা তুকারাম মোগলমারী, এই স্থানে মোগলপক্ষীয় সৈন্যগণ দৌয়ুদসাহকে পরাস্ত করিয়া প্রাণবধ করে। (১৫৭৫খ্রীঃ)

তিরা বা তিরুল

তিরুল সম্ভবতঃ টীরা নামেই পরিচিত হইয়াছিল, এই স্থান ব্রহ্মপুত্র ওলক্ষীয়ার সঙ্গমস্থলে অঙ্কিত দেখা যায়। (রেনেলের ম্যাপ ১২ নং দেখ)

তোটক

ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে, কুমারসমন্দের বিপরীত দিকে। এই স্থানে একটি দুর্গ ছিল।

(এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৩। ২১৩ পৃষ্ঠ)

(এনাইতুল্লা আকবরনামা, ইলিয়ট অনুবাদ ৬ ভলম, ১০৯পৃঃ

দড়িয়াপুর

দড়িয়ানদী ব্রহ্মপুত্রের শাখা কোচবিহারের উত্তরপশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত! ভিতরবন্দ ও বাহিরবন্দ পরগণাদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া এই দুইটিকে পৃথক করিতেছে। দড়িয়ানদীর তীরে দড়িয়াপুর গ্রাম সংস্থাপিত।

(এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৩। ১৪০ পৃঃ)

(হিজলীর ঠিক বিপরীত দিকে রসুলপুর নদীর পূর্ব্বতীরে দড়িয়াপুর নামে আর একটি পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান আছে)

ধরমপুর

সরকার বেহারের অন্তর্গত একটি মহাল। ইহার রাজস্ব ছিল ৫০০০০০০০০০০ দাম।

ধূমঘাট

২৪ পরগণার অন্তর্গত কালীগঞ্জ ষ্টেশনের অধীন। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। উহা প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে। এই স্থান অধুনা খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দর বন প্রদেশে। অরণ্য মধ্যে আজিও বহু ভগ্ন অট্টালিকা ও দেবালয়ের নিদর্শন এবং প্রশস্ত রাজপথ পরিদৃষ্ট হয়। আজিও রাস্তার উভয় পার্শ্বে, কতকগুলি বকুল বৃক্ষ ছায়া প্রদান করিতেছে।

(ওয়েষ্টলেণ্ড ২৪ পৃঃ)

ফতেয়াবাদ

টোডরমল্লের বন্দোবস্তে উহা একটি সরকার মধ্যে পরিগণিত ছিল। মুর্শিদকুলীখাঁর শাসন সময়ে যখন সরকারের পরিবর্ত্তে চাকলার উদ্ভব হয় তখন উহার অধিকাংশ ভূষণা চাকলার অন্তর্ভূক্ত হয়। বর্ত্তমান কালে উহা যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

(আইন আকবরি ও মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্ত দেখ)

ফকির উদ্দীন আবুল মোজাফর সেরসাহের রাজত্বকালে, সেরিফাবাদ, মহম্মদাবাদ এবং ফতেয়াবাদে টাকশাল ছিল।

এসিয়াটিক জার্ণেল। ১৮৭৫। ২৯৬ পৃঃ

ফতেপুর সিকড়ি

জৈনপুরের নিকটবর্ত্তী ছাপরঘাট হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী। ছাপরঘাট আগ্রা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ফতেপুর আগ্রা হইতে

পশ্চিমদিকে। বাইরাম খাঁর স্ত্রী সলিমা বেগমকে আকবরসাহ পুনঃ বিবাহ করেন, সলিমা বেগমের বাগান এই স্থানে নির্ম্মিত হয়।

এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৫। ২৯৯ ও ৩০০ পৃঃ

ফতেজঙ্গপুর

তিনটি ফতেজঙ্গপুরের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর ফতেজঙ্গপুর, ২য়টি ফতেয়াবাদ ফতেজঙ্গপুর পরগণা, এই দুইটি বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। অপর ফতেজঙ্গপুর পরগণা নদীয়া ও যশোহর জেলার অন্তর্গত। বিক্রমপুরের কেদার রায়কে, ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে ও যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া জয়নিদর্শনরূপে মানসিংহ এই তিন ফতেজঙ্গপুরের নাম পত্তন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান, উহা বনবিষ্ণুপুর নামে প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই স্থানের রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বীর হাম্বীরের রাজধানী।

বংশীপুর ও বসন্তপুর

কালীন্দী নদীর তটে। বসন্তপুর কালীগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটে বিভারকোট নদীর তীরে।

বজরাপুর

তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটি পথ ছিল, উহা একটি নদীতীর ধরিয়া, অপরটি ভাওয়াল পরগণার মধ্য দিয়া। সম্ভবতঃ ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান হইবে।

ভদ্রক

উড়িষ্যার অন্তর্গত, সরকার ভদ্রকের অন্তর্গত ২১টি মহালের রাজস্ব ছিল ৯১৪৩৭৭২৭৩০ দাম। উহার মধ্যে নিজ হাবেলী ভদ্রকের রাজস্ব ৯৫৪১৭৬০ দাম।

বালকোণা

গয়া জেলার অন্তর্গত এক পরগণা। ইহার নামান্তর "বালাউলজার"।

এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৩। ১১৮ পৃঃ

ভাটী

হুগলী নদী ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগ পূর্ব্বসময়ে ভাটী নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে বাঙ্গালার ভূঞারা রাজত্ব করিতেন। সাধারণতঃ এই ভূ-ভাগের দক্ষিণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানই ভাটী নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার ও ব্রহ্মপুত্রের সহিত লক্ষার সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত ভাটী নির্দ্দেশ করিতেন। উহা ১৮ ভাটী নামে পরিচিত ছিল॥ আইন আকবরিতে দেখা যায় ত্রিপুরার দক্ষিণাংশও ভাটী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান কালে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলিই ভাটী নামে নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। (এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৩ ইং)

আইন আকবরিতে ভাটী সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

ভাওয়াল

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ পরগণা।

ভাতুরিয়া

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চলনবিলের মধ্যবর্ত্তী একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ।

মীরজানগর

কপোতাক্ষ নদীতীরে, ২৪ পরগণা ও যশোহরের মধ্যবর্ত্তী, এই স্থানে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

মঙ্গলকোট

বর্দ্ধমানের ১৮ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত একটি গণ্ড গ্রাম।

মন্দারণ বা মাদারণ

বীরভূম জিলার অন্তর্গত নগর হইতে রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী মণ্ডলঘাট পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান। এই স্থানে একটি দুর্গ থাকায় উহা গড়মন্দারণ নামে প্রসিদ্ধ। সরকার মাদারণ ইহার রাজস্ব ছিল ৯৪০৩৪০০ দাম। বীরভূমের অন্তর্গত নগর, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ এবং হুগলীর অন্তর্গত কান্তঘোষ, জাহানাবাদ, চন্দ্রঘোনা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। দুর্গেশ নন্দিনীর পাঠকগণ যে গড়-মন্দারণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাই এই মদারণ বা মন্দারণের অন্তর্গত।

মশ্বাদিগ্রান

সোণারগাঁর অন্তর্গত; নবাব মুরশিদকুলী খাঁ, মুকসুদাবাদকে যেরূপ স্বীয় নামে পরিণত করিয়া "মুরশিদাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন, সেইরূপ বৈদ্যবংশীয় মহেশ্বর নামা এক বর্দ্ধিষ্ণু লোক মশ্বাদীকে,

মহেশ্বরদী নামে একটি পরগণার গঠিত করেন। সোণারগাঁর কতক গ্রাম লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়।

মেদস্মল

সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত একটি পরগণা, বর্ত্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত। উহার পত্তন কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে, মাতলা রেলওয়ে লাইনের উভয়পার্শ্বস্থ স্থান। বারুইপুর ও অন্যান্য গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

যশোহর

প্রাচীন যশোহর ২৪ পরগণার অন্তর্গত কালীগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যে।* আজিম খাঁ ১৫৯২—১৬০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এই স্থানের ফৌজদার বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বর্ত্তমান জেলা প্রথম মুরলী, পরে কসবায় সংস্থাপিত হইয়া, কসবাতেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহা যশোহর জেলা নামেই পরিচিত। গুহ রাজবংশের সময়েতেই যশোহরের পূর্ণ উন্নতি। তৎসময়ের জনৈক কবি যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ এক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

যশোহরপুরী কাশীদির্ঘীকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চানন ব্যাসঃ বসন্তকালভৈরবঃ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপাদিত্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

(ওয়েষ্টলেণ্ড হিষ্টরী ২৪ পৃঃ)

রায়পুর

পাটনার পূর্ব্বদিকে একটা বৃহৎ জনপদ। কোন কোন ইংরাজ লেখক ইহাকে জেসুয়ান নামে পরিচিত করিয়াছেন। বাণ্ডোক্রকের

* বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত।

ম্যাপে আর একটি জেসুয়ানের পরিচয় পাওয়া যায় উহা মোরঙ্গের পূর্ব্বদিকে।

(এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৩।২৪৪ পৃষ্ঠা)

রায়গড়

২৪ পরগণায় অন্তর্গত বরিষা বেহালার সন্নিকটে।

রোটাস

শোণ নদের তীরবর্ত্তী রোটাস নামক বিস্তৃত ভূভাগ বা সরকার। এইস্থানে একটি দুর্গ আছে। তন্নিকটবর্ত্তী আকবর পুর ও বলন্দু নামে আরও দুইটি দুর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। সরকার রোটাসের রাজস্ব ৪০৮১৯৪৯৩ দাম বেহারের অন্তর্গত, রোটাসের রাজস্ব ছিল ২২৫৮৬২০ দাম। (বেনেলের ম্যাপ নং ৩)

(আইনই আকবরি)

এই স্থান সাহাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত। সেরসাহ স্বীয় নামে একটি দুর্গ প্রস্তুত করেন (সেরগড়) ১৫৩৮ হইতে ১৫৪৫খৃঃ মধ্যে। রোটাস হইতে ১৮ মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে।

(এসিয়াটীক জার্ণেল ১৮৭৫।২৯৬ পৃষ্ঠা)

শালিখা বা শাল্‌খীয়া

এই স্থানে একটি পুলিশ ষ্টেসন আছে, যশোহর ও ঢাকা রোডের সন্নিকটে। যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা সভডিভিজনের নিকটবর্ত্তী। হাবড়া জেলার একাংশ শালিখা নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর

ইলিয়ট. কৃত ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে এই শ্রীনগরে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের শেষ যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বীরবর কেদার রায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। কেদার প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে। এইস্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

বর্ত্তমান সময়ে উত্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত যে শ্রীনগর বর্ত্তমান আছে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার কোন পরিচয় ছিল না। তখন উহারাই সবর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান প্রকৃত শ্রীনগরের একাংশের নাম, ফতেজঙ্গপুর ও অপর অংশনগর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং ষ্টেশনের অধীন।

শ্রীপুর

ডাক্তার ওয়াইজ এই শ্রীপুরকে চড়াতে পরিণত দেখেন। তৎকালে উহাকে "শ্রীপুরের টেক" বলিত। তথায় বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের অফিস ছিল। সম্পূর্ণ নদীগর্ত্তস্থ হইয়া উহার একটুকুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা "শ্রীপুরের টেক" নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

এই টেক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে।

মনাইফকির নামে একজন মুসলমান সিদ্ধ পুরুষকে, জনগণ প্রশ্ন করিয়াছিল, এই কীর্ত্তিনাশা নদীর বিস্তার কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। তদুত্তরে ফকির সাহেব বলেন, তোমরা আমার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া থলিয়ায় পুরিয়া এই নদীর মধ্যে ফেলিয়া দাও, সপ্তাহ পরে পুনরায় এইস্থানে আগমন করিলে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য সমাধা হয়। তৎপর উত্তর প্রার্থীরা সমবেত

হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ফকির তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তৎ-সম্বন্ধে আমি যতটা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। "কীর্ত্তি-নাশার উত্তর তটে চাচুরতলার ঠাকুরাণী বাড়ী ও দক্ষিণ পারে মাঐসারের দিগম্বরী বাড়ী বলিয়া যে দুইটি জনপদ ও দেবীস্থান বর্ত্তমান দেখিতেছ, তাহাই এই নদীর উভয় তটে বর্ত্তমান থাকিবে। এতদ্ মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় স্থান নিশ্চয় নদীগর্ত্তে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। আর এই যে রাজনগরের সতেররত্ন ও একুশরত্ন প্রভৃতি দেখিতেছ, উহার নিম্নে সোনার ইলিস মৎস্য নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ঐ সকল মৎস্য এই নদীর জলে নিশ্চয় বিচরণ করিবে। তবে শ্রীপুরের যে টেক বর্ত্তমান আছে উহার বিলয় সাধন কোন কালেই হইবে না।"

আজ পর্য্যন্ত ঐ সিদ্ধ পুরুষের কথা কতকটা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কারণ চাচুরতলার ঠাকুরাণীর বাড়ীর দিকে বহুবার নদী অগ্রসর হইয়াও পুনরায় চড়ায় পরিণত হইয়াছে। রাজনগরের সেই অভ্রভেদী চূড়া সমন্বিত মন্দির সমূহ অতীতের স্মৃতিগর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এবং শ্রীপুরের সেই টেক কখন বা নদীর জলে, কখন বা চড়ায় বেষ্টিত থাকিয়া আপনার শীর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম রহিয়াছে। কত শত জনপদ, কত কীর্ত্তিরাজী কীর্ত্তিনাশার গর্ত্তে বিলীন হইয়া কীর্ত্তি-কর্ত্তার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ফকিরের নির্দ্দেশ একটুকুও নড়ে চড়ে নাই। দৈবশক্তির যে কি অপূর্ব্ব মহিমা তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কিরূপে বুঝিব! ১৮২২ খ্রীঃঅব্দে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট জন পীটারসন ঢাকা জেলার দুর্গ-সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে চণ্ডীপুরের নিকট একটি প্রাচীন কেল্লা ছিল, যাহা শ্রীপুরের কেল্লা বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান

সেটেলমেণ্ট অফিসার, এফ্, ডি, এস্‌কলি কলিকাতা এসিয়াটীক জার্ণেলে "বাঙ্গালার বদ্বীপ" সম্বন্ধীয় যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, রেনেলের সময়ে শ্রীপুর বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তিনি এই প্রসিদ্ধ স্থানটী সম্বন্ধে কোন কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই।

সাতগাঁ

সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত, হুগলী নদী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। উহা একটী শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর ছিল। (এসিয়াটীক্ জার্ণেল ১৮৭৩।২১৭ পৃষ্ঠা)। সরকার সাতগাঁর রাজস্ব ছিল ১৭৬২৯৯৬৪ দাম। সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামকে মোসলমান লেখকগণ মোগল সরকারের "বুলঘাকখানা" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বুলঘাকখানা অর্থ বিদ্রোহী স্থান।

সাসীরাম

রোটাস প্রদেশের অন্তর্গত একটী স্থান। এই স্থানে একটী দুর্গ আছে। ইহার পশ্চিমে শনিগড় (একটী ক্ষুদ্র দুর্গ) ও পূর্ব্বদিকে বামজারনগর। (রেনেলের ম্যাপ দেখ)। এই স্থানটী বর্ত্তমান সময়ে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী সবডিভিসন।

সুগন্ধা ও সোন্দারকুল

সরকার বাক্‌লার অন্তর্গত সুগন্ধা নদীর পরিচয়, অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে উল্লেখ আছে সুগন্ধা নদীতে ভগবতীর নাসিকা পতিত হয়। এজন্য উহা একান্ন পীঠের অন্যতম। পনাবালীয়ার নিকটবর্ত্তী শ্যামরাইলে ভৈরব ও শীকারপুরগ্রামে শক্তিপীঠ বর্ত্তমান আছে।

উহা সুতালড়ী, রায়েরকাঠী, ঝালকাটী, মধীপুর, মাধবপাশা প্রভৃতি স্থান হইতে ইদ্রাকপুর গৌরনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার তটবর্ত্তী যাবতীয় ভূভাগ "সোন্ধারকুল" নামে পরিচিত ছিল। এই নদীর তটবর্ত্তী অরণ্যময় প্রদেশের বৃক্ষরাজী হইতেই প্রথম সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হয়।

সোন্ধারকুল পরগণার ভূভাগসমূহ অধুনা চন্দ্রদ্বীপ, সিলেমাবাদ ও হাবেলী সিলেমাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য দশসনার বন্দোবস্ত সময়ে এই প্রত্যেক পরগণার সহিত "গয়রহ" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। রেনেলের ম্যাপে সোন্ধারকুলের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত আছে।

ইংরেজ লেখকেরা কেহ কেহ সোন্ধাকে "ফ্রেগ্রেণ্ট" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সোন্ধা হইতে সুন্দরবন নামের উক্তিও তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। *

বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ২৪।২৬।৪০ ও ১২৪ পৃষ্ঠা।

সেরপুর

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দশকাহনীয়াবাগিরদা (রেনেলের ম্যাপ) সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত সেরপুর মুরচা। ইহার রাজস্ব ছিল ১২০৭৭১৫ দাম। এতদ্ভিন্ন মুরশিদাবাদ জেলাতে ও সেরপুর নামে

* "ভেন ডেন ব্রুক্" সেরপুর ফিরিঙ্গি নামক স্থানকে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ধলেশ্বরী নদীর তীরে ইদ্রাকপুর নামক স্থানের দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। এই ইদ্রাকপুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ। উপরে যে ইদ্রাকপুরের কথা লেখা হইল উহা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী পরগণা।

দুইটী স্থান আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গতও সেরপুর আটীয়া নামে একটী স্থান আছে। উহা সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত। এই স্থানে মানসিংহের সহিত আফগানদের যুদ্ধ হয়;

আইন-ই-আকবরি, ৩৪১ পৃষ্ঠা ও এসিয়াটীক্ জার্ণেল,
১৮৭৩।২১৮ পৃষ্ঠা ও ১৮৭৫।২৯২ পৃষ্ঠা।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৭ সনের ৫ম খণ্ডে অতিরিক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ দাস কুণ্ড মহাশয় সেরপুরের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, "বগুড়ার অন্তর্গত সেরপুর মুরচা ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত দশকাহনীয়া সেরপুর, করতোয়া নদীর উভয় তীরে বিদ্যমান ছিল। এই নদী পার হইতে হইলে খেয়া পার জন্য দশকাহন কড়ি দিতে হইত বলিয়া, উহার নাম দশকাহনীয়া।" এখন দেখিতে হইবে এই উভয় সেরপুর করতোয়ার তীরে বিদ্যমান ছিল কি না।

রেনেলের ম্যাপে দেখিতে পাই বগুড়ার সেরপুর করতোয়ার পশ্চিম তীরে এবং ময়মনসিংহের সেরপুর ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে ঝিনাই নদী, বাজু পুরগণা ও জাফরসাহী প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মপুত্র যে করতোয়ার পরবর্ত্তী নদ তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহার কথা স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাইএর অস্তিত্ব থাকে কোথায়? উভয় সেরপুরের ব্যবধান সোজাভাবে প্রায় ৪৪ মাইল। রেনেলের সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৪।৬৫ খৃষ্টাব্দে করতোয়ার পরিসর ছিল অর্দ্ধ মাইল এবং ব্রহ্মপুত্রের পরিসর ছিল ১॥ মাইল হইতে ৪ মাইল। ইহার মধ্যে কতকটা দ্বীপবৎ স্থানও বিদ্যমান ছিল। ঝিনাইএর পরিসর অর্দ্ধ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। এই সকল কারণে

আমরা উভয় সেরপুরকে এক বলিয়া কথনই মনে করিতে পারি না। আমরা উভয়কে করতোয়ার তীরবর্ত্তী বলিয়াও স্বীকার করি না।

সুন্দরবন ও চণ্ডভাণ্ডা

"সুন্দরবন" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে ইহা সুন্দর অর্থাৎ মনোরম ও বন এই দুইটি শব্দ হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন এই বনে 'সুন্দরী' গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সেই জন্য ইহার সুন্দরবন নাম হইয়া থাকিবে। বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ নামে যে জমিদারী আছে সেই জমিদারীনামব্যঞ্জক 'চন্দ্রদ্বীপ বন' হইতে সুন্দরবনের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও কোনও কোনও ব্যক্তির ধারণা। চণ্ডভাণ্ডা (Chandabhanda) নামে সুন্দরবনের অধিবাসী এক জাতির নামানুসারে এই বনের নাম হইয়াছে কেহ কেহ এরূপও মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।* গ্রাণ্ট সাহেব 'চন্দ্রবাঁধ' হইতে ইহার সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। এই 'চন্দ্রবাঁধ' তাহার সময়ের ইউরোপীয়গণ Soonderbund রূপে লিখিতেন।

---

* ইদিলপুরে প্রাপ্ত সোসাইটির অধিকারে একখানা তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে Baguli, Bittogada এবং Udayamana গ্রাম কেশব সেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১৩৬ খৃঃ) জবরদেব (Jovaradev) শর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে Chandabhanda জাতির উল্লেখ আছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে এই Chandabhandaই গোবিন্দরাম কর্ত্তৃক Chattabhatta নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

(Vide, J. A. S. B. VII, 40),

দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র দক্ষিণ ভাগের (অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল) সুন্দরবনাভিধান আধুনিক। পূর্ব্বে ভাঁটার জল বহু দূর পর্য্যন্ত নামিত। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ সেই জন্য হুগলী নদীর মোহনার নিকট হইতে মেঘনা নদীর মোহনার নিকট পর্য্যন্ত স্থান 'ভাটী' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখনও সময়ে সময়ে এই 'ভাটী' শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে সেই সমস্তও আকবরনামা হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশ দ্বাদশ জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়। কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন যে আরাকান ও কুমিল্লার রাজগণ এই দেশের প্রভুত্ব ও এই দ্বাদশ জন ভূঞার উপর কর্ত্তৃত্বের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোথায় আমরা জানি না (Asiatic Researches XIV, pages 1 & 51).

(See J. A. S. B., No. 3 of 1873 page 226)

হোসেমপুর, ঢাকা

রেনেল এই স্থানকে ওসমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেল 'সার্ব্বে' উপলক্ষে ১৭৬৫ খৃঃ ২২শে জুলাই তারিখ এখানে পৌঁছিয়া স্বীয় ডায়রিতে লিখিয়াছেন—এই স্থানে একটি পর্টুগীস গির্জ্জার ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই গ্রাম ঢাকা হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ইহার তলবর্ত্তী খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিকে বরাবর সিলেট নদীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

এখানে যে গির্জ্জা আছে হাণ্টার সাহেব তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। List of Ancient Monuments নামক গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই। Pere Barbier এর ১৭২৩ খৃঃ

১৫ই জানুয়ারী তারিখের পত্রে উস্নমপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পত্র Lettres Edifianteset Curienses সংজ্ঞক পত্রাবলীর অন্তর্ভূক্ত। (Form XIII page 272). এই উস্নমপুরে মোগল বাদশাহের অনেক পর্তুগীজ কর্ম্মচারীর অবস্থান এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তিনি নিজে Bishop Laynez এর সহিত ১৭১৪ খৃঃ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পত্র Rev W. K. Firminger মহোদয় কর্ত্তৃক 'Bengal, Past and Present' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

আর একটি হুসেনপুর পরগণা নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশ পরগণার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ভূমির পরিমাণ ১৫০ বর্গমাইল। ইহার রাজস্ব ২৮ ভাগে বিভক্ত; ৪৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং মাত্র। সমুদায় রাজস্ব নদীয়ার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে।

(ইম্পিরিয়েল গেজেট)

হাজিগঞ্জ

সোণারগাঁর অন্তর্গত ও নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও লক্ষীয়ার সঙ্গমস্থানে, উহা নির্দ্দেশিত হয়। রেনেলের ১৭ নং ম্যাপে তথায় একটী দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহা কেল্লা বলিয়া লিখিত আছে।

এসিয়াটীক্ জার্ণেল ১৮৭৪।৮৬ পৃষ্ঠা।

অপর হাজিগঞ্জ

বর্ত্তমান ফরিদপুর হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

(রেনেলের ডাএরি ২২ পৃষ্ঠা, অনুবাদ ঢাকা রিভিউ ৩৩০ পৃষ্ঠা)

হাজিপুর

হাজিপুর পাটনার অন্তর্গক গণ্ডক নদীর তীরে। মোসলমানদের রাজত্ব সময়ে তথায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। সরকার হাজিপুরের রাজস্ব ছিল ২৭৩১০৩০ দাম। খাস হাজিপুরের কর ছিল ৩৮৩৩৭৬০ দাম (আইন-ই-আকবরি)।

এসিয়াটিক জার্ণেল ১৮৭৩।২২১ পৃষ্ঠা, ইলিয়ট ৫ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা।

হিজলী

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাজখান মসনদ-ই-আলী ও তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান, সাগর দ্বীপের বিপরীতদিকে রসুলপুর নদীর তীরবর্ত্তী এই স্থানে বাস স্থাপন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থানে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালন করেন। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে এই স্থানে মোগল-বাদশাহের আধিপত্য সংস্থাপন হয়। এই সময়ে তথাকার অধিপতি মসনদ আলী সাহ স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া স্বেচ্ছায় কবর গ্রহণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ ও দিনেমারেরা তথায় বাণিজ্য জন্য কুঠি সংস্থাপন করেন। ষ্টুয়ার্ট (২০ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন খোজা ঈশা কুতুলখাঁর মন্ত্রী ছিলেন। ইলিয়ট লিখিয়াছেন উকীল। "মথ্জানে আফগানই" গ্রন্থে জানা যায় ঈশা খাঁ কুতুল খাঁর ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু হিজলীর ঈশা খাঁ মছন্দরী কে ছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে হিজলী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। উহার পাঁচ মাইল দূরে খিজিরী নামে একটী গ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এসিয়াটীক্ জার্ণেল ১৭৭৩।২২৫ পৃষ্ঠা।

হাতীয়া গড়

ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিকটে। উহা সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মহাল। তাহার নাম ছিল হাতীকুণ্ড। রাজস্ব ছিল ৫৫৭০২ দাম (আইন-ই-আকবরি)। উহার উত্তর পূর্ব্বে বরিটার্টি ও মেদিনীমল, উত্তর পশ্চিমে পোর্টক্যাণীং। মাইহাটী, ধূলীয়াপুর, ভালুকা হইতে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত।

এসিয়াটীক্ জার্ণেল ১৮৭৩।২২৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য যেরূপ বীরপুরুষ ছিলেন, তদনুরূপ পণ্ডিত বলিয়া ও খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন। তদ্‌বিরচিত "বিখ্যাত বিজয়" নামক একখানা নাটকের কথা অবগত হওয়া যায়, উহা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধ অবলম্বনে লিখিত হয়। এই নাটকের সূত্রধর-প্রস্তাবটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। বীররচিত এই নাটকে বীর-রসের লক্ষণ যে অধিক লক্ষিত হইবে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ কি ?

"প্রক্ষাবৎ পরিতোষনিস্তলমহামাণিক্যরত্নাকরঃ।
প্রাকৃসৎপুরুষপৌরুষোৎকরকথাস্রোতস্বতীভূধরঃ॥
দৃপ্যচ্চারণচাতুরীমধুকরীপ্রাগল্‌ভ্যপুষ্পাকরঃ।
শ্রীলক্ষ্মণভূপতেরভিনবস্তাদৃক্‌ প্রবন্ধোত্তরঃ॥
আশ্রয়ো যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধোভূভূজাবদ্ধস্তস্মিন্নৌপয়িকশ্রমঃ॥

শুনা যায় প্রায় এক মণ ওজনের একটী কবচ পরিধান করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। উহার কিয়দংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা বড় কম কথা নয়।

বর্ত্তমানে এমন কোন্ বীর আছেন যে অর্দ্ধ মণ শরীরে চাপাইয়া, নড়া চড়া করিতে পারেন।

লক্ষণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলরাম রায় ভুলুয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৫৯৭ খ্রীঃ)। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার না করায়, অমর ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া বলরামকে করদানে বাধ্য করেন। অমরমাণিক্যকর্ত্তৃক বাকলা আক্রমণের বিবরণ ও লুণ্ঠনের কথা এই সময়ে অবগত হওয়া যায়।

ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী

"ঢাকা অতি প্রাচীন সময় হইতে পরিচিত। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি "ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন।" সমতটের পাশাপাশি 'ডবাক' নাম থাকায় উহা বর্ত্তমান ঢাকাকেই বুঝাইতেছে। এতদ্ভিন্ন আইন-ই-আকবরির সরকার বিভাগে 'ঢুথাবাজু' বলিয়া যে নাম দৃষ্ট হয় তাহাও ঢাকাবাজু।

প্রবাদানুসারে, রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক ঢাকেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। তবে তিনি কোনও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা ঘটসংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান ঢাকেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি মানসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন ইহাই প্রসিদ্ধ কথা।

সাধারণের বিশ্বাস, জয়পুরের শিলাদেবী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়; নবকৃষ্ণ বাবু ঐতিহাসিক চিত্রে এতৎসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেই উহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বরং ধাতুময়ী ঢাকেশ্বরীর সহিতই উহার সৌসাদৃশ্য সম্ভব হয়।

হিন্দু দেবমন্দির পূর্ব্বদ্বারী হইতে পারে

"অথ দ্বারনির্ণয়ঃ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—গ্রামমধ্যে চ পূর্ব্বে চ প্রত্যগ্‌দ্বারং প্রকল্পয়েৎ। বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু তথা প্রত্যঙ্মুখং ভবেৎ॥ দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিমে প্রাঙ্মুখং ভবেৎ॥".

শব্দকল্পদ্রুম, মন্দির শব্দ।

পরগণাতি-সন-সম্বন্ধীয় দলীল

শ্রীশ্রীদুর্গা

স্বহায়

ইয়াদি বারিভূমি জমাশূন্য বিক্রয় পত্রমিদং—শ্রীজয়নারায়ণ সেন স্বচরিতেষু শ্রীরামকান্ত শর্ম্মা ওলদে রুদ্রদেব শর্ম্মা ইরণে রামপ্রসাদ শর্ম্মা কস্য লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোণারগাঁও কিস্মত ছয় পারা আমার উৎসর্গ দত্ত অনন্তরাম সেন মাপ জমী মহাফিক চিঠা ⁄৪ এক কানী ষোল কড়া ভিটী ৬॥ গণ্ডা নাল ১৭॥ গণ্ডা এই এক কানী ষোল কড়া জমী এহার মূল্য ভিটী দর ফি কানী ১২০ রূপাইয়া কাত ৩৯ রূপাইয়া নাল ফী কানী দর ৪৮ রূপাইয়া কাত ৪২ রূপাইয়া এবুনে ৮১ একাশী রূপাইয়া জমা শূন্য বিক্রয় করিলাম ইত্যাদি ইতি সন ১১৮৩ এগার শত তিরাশী বাঙ্গলা, পরগণাতি ৫৭৪ পাঁচ শত চৌসত্তরি তারিখ ৯ মাহ চৈত্র।

সম্পূর্ণ।

অভিমত

বারভূঞা প্রবন্ধসম্বন্ধে প্রফেসর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সম্প্রতি আমাদের দেশে যে কয়েকজন ব্যক্তি বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন, আনন্দ বাবু তন্মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন কিংবদন্তী ও স্বদেশের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কিয়দংশ এখনও রক্ষিত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ দিকে একবারে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নাই। ইতিহাস উদ্ধারের ঐ উপায়গুলিও ক্রমে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, এখনও যাহা উদ্ধারের উপায় আছে, কিছুদিন পরে তাঁহাও থাকিবে না। আনন্দ বাবু যেরূপ আন্তরিকতা সহকারে এ বিষয়ে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের উঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি তাঁহাকে এজন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করি। আনন্দ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মুখে কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পরিষদ বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উহা যথাকালে বাহির হইয়াছে। লেখক যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন, ঐ প্রবন্ধ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আনন্দবাবু বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত আছেন ও অনেক কিংবদন্তী ও বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সংকলিত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। দেশের ধনী ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ লেখককে সাহায্য করিবেন। সাহিত্য পরিষদের অর্থবল থাকিলে আমি পরিষদকে প্রচারের ভার জন্য অনুরোধ করিতাম।

সংবাদপত্রের অভিমত

HISTORY OF FARIDPUR

We have received a copy of the first part of the History of Faridpur by Babu Ananda Nath Roy. It is one of the happiest and most pregnant signs of the time that along with political and economic movements there is a movement for historical researches in Bengal. We have thus got a history of Murshidabad, of Rajshahi, of Dacca, of Backergunj and now Babu Ananda Nath Roy has come forward with a valuable contribution in the shape of a history of his own district. These little books dealing separately with the histories and traditions of the various important districts of Bengal are particularly valuable at this period of transition, as they are sure to supply very important materials for the future historian of Bengal. It was very much to be wished that the present book were published as a whole and not in parts; but we have no doubt the enterprising author will complete it in no time and establish his claim among the pioneers of historical researches in this country. The book bears unmistakable evidence of the author's grasp of his subject and the labour he has taken in compiling and marshalling the various important and useful informations which he has collected. The language of the book is elegant and its subjects highly interesting. Some of the maps and photographs, particularly those of Rajnagore, the ancient

capital of Maharajah Rajbullubh, which illuminate this book are, inded, very valuable, and we heartily wish the learned and adventurous author a complete success in his arduous task.

The Bengalee, 21st December, 1909.

HISTORY OF FARIDPUR

It is one of the best signs of the time that our literary men have directed their energies to the historical researches of the country. In the absence of a comprehensive history of Bengal beyond a certain period these men have very prudently proceeded to compile and record the history of the country district by district. Thus we have got a history of Murshidabad, Rajshahi, Dacca, Mymensingh and Backergunge and now we are about to have a history of Faridpur by Babu Ananda Nath Roy, a scion of the ancient family of Lala Ramprosad Sen, the nephew of the historical Rajah Rajbullubh. These fragmentary chronicles will at no distant date form the basis for a comprehensive history of Bengal. We have received a copy of the First Part of this history of Faridpur and it shews an amount of research which is truly admirable. Babu Ananda Nath seems to have taken considerable pains in getting all the interesting facts connected with his district, collecting pictures and drawings of the famous monuments and temples and ressuscitating the relics of the

famous Chand Roy, Kedar Roy, Rajah Seetaram Roy and Maharaja Rajbullabh. We are told he has collected also some of the ancient coins and plates relating to the bygone days of the district. Mr. Higgins, the late Sub-divisional Officer, seems to have interested himself in this laudable enterprise of Babu Ananda Nath Ray. He writes as follows :—"I have read the first volume of Babu Anandanath Rai's 'Faridpurer Itihash' and am very pleased to testify to its worth. By unremitting labour and study Ananda Babu has succeeded in making it interesting and instructive. My limited knowledge of the language prevents me from speaking of its literary quality, but I have no hesitation in pronouncing it of considerable value as a work of archæological and historical research."

We are glad to notice that in his arduous task Babu Ananda Nath Roy is also being materially assisted by some of the leading men in his district. We heartily wish the enterprising author complete success in the noble but arduous task he has undertaken.

The Bengalee, 14th July, 1910.

HISTORY OF FARIDPUR

"Faridpurer Itihash," Part I, by Ananda Nath Roy, Calcutta, Price As. 10.

This brochure forms no. 25 of the Bengal Sahitya Parishat series. As the name implies, it seeks to give

use, we are afraid, they will irretrievably be lost before it is too late. There are the chronicles of several important Districts put together after diligent research by several English civilians, and it is curious that Indian scholars were so long blind to the significance of this branch of literary activity. Happily, a change has come over their spirit in these days, and we have already the histories of other Districts dealt with by competent writers. Among this batch, the name of Babu Ananda Nath Rai is prominently before the pnblic. He has already made important contributions to elucidate several dark corners in the history of Bengal. His account of the twelve *Bhuinya* chims of Bengal is characterised by such originality as is unfortunately not often met with in the domain of historical research in this country.

In his present work which is expected to be completed in there volumes, the author has strang together a few interesting accounts of the geography, topography, statistics and history of Faridpur, which cannot but be highly prized not only by the inhabitants of the District, but by all interested in the history of Bengal. The compiler had to undertake extensive travels to collect the variety of information which he has given— drawn from sources which would not have been available a few years hence. Fortunately he received the ungrudging help and co-operation of some well-known gentlemen which stood him in good stead in the accomplishment of his task. It speaks well for the

the ancient history and geographical position of the district of Faridpur and as such reflects very great credit on the author for the research and labour which he must have undertaken to get "at the materials." If similar acconnts of all our districts, towns, etc. could be prepared it would be advancing the cause of the country a long way because it is in these there lie the germs of future greatness. A map of ancient Faridpur from Rennel's Atlas, as also some photo engravings have been inserted in the work to enhance its value.

The Amrita Bazar Patrika, 16 August, 1910.

HISTORY OF FARIDPUR

It is gratifying sign of the times that efforts are being made togather materials for a commhensive history of these Province which are to be brought out from oral traditions, old manscripts or other sources. To vary and apply the well-known words of Colonel Todd, every District in Bengal has a tale to tell, and there are stone mounds, and other ruins which have not yet been turned to the required advantage. Indian scholars have exceptional opportunities for the performance of this task and we wish that many more may be for-th-coming to share such fruitful toil. The labour of the future historian of Bengal may well be lightened if the hisrory of every District is compiled beforehand, and unless the materials that still exist are turned to

compiler that he has published information on several matters which remained unknown so long, and was not obtained even by the diligence of Western scholars. The heartiness which he brought to bear upon his work, abundantly illustrated in every page of the book before us, has made possible the pnblication of such an eminently instructive and informing piece of history. He entered into his task, fired by the true historical spirit, and we hope that his work will meet with due recognition at the hands of the public. The book is included in the publications of the Sahitya Parishad, which makes clear the verdict of this competent literary body on the labours of the compiler. We hope that the two remaining volumes of the book will soon see the light, so that there may be a work in the historical branch of Bengali literature which is found to be regarded as a acquisition to it. • The whole book is priced at two rupees which is hardly to be accounted much, considering the immense paiws which the compiler has taken to give the public the result of his valuable reseaches.—Indian Mirror."

30th July, 1910

গ্রন্থ সমালোচনা

শিক্ষা-সমাচার (ঢাকা)

বুধবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস

আনন্দনাথ রায় প্রণীত প্রথম খণ্ড

আনন্দ বাবু দ্বাদশ ভৌমিক লিখিয়া ঐতিহাসিক [illegible] যশস্বী হইয়াছেন।

আমাদের দেশে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার ন্যায় দুরূহ কার্য্য অতি অল্পই আছে। ভারতের অতীত ইতিহাস বিলোপের কুক্ষিগত, গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সিদ্ধান্তের ক্ষীণ আলোকরেখার অভাবে প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত মন্দির গভীর তিমিরাচ্ছন্ন, সুতরাং দুষ্প্রবেশ্য। কিন্তু শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ে ভয়ে ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। যে সকল সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসপ্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি বিভীষিকাময়ী পুরাকাহিনীর নিরপেক্ষ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশুদ্ধ প্রমাণযুক্তিসঙ্কলনে যে সকল নিরলস অনুসন্ধিৎসু মহাত্মা পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহারা ধন্য, প্রশংস্য ও আমাদের নমস্য। যাঁহারা দেশের বিলুপ্তপ্রায় রত্নরাজির উদ্ধারে উদার ভাবে প্রাণপাত করিতেছেন, যাঁহারা দেশের বিনষ্ট গৌরব বিস্মৃতির জলধিতল হইতে স্মরণপথে লোকচলাচলের সম্মুখে আনয়ন করিতে, উপস্থাপিত করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য, প্রশংস্য ও আমাদের নমস্য।

আনন্দ বাবু ইতিপূর্ব্বেই অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গম অতীত প্রবিষ্ট হইয়া-তিমিরাবৃত পুরাতত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বেই বিস্মৃতিপঙ্কেবিলীন "দ্বাদশ ভৌমিক"কে জনসমাজের নিকট সজীব-ভাবে যথাযথরূপে পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাওয়াতে পণ্ডিতমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। "বারভূঞার" বিলুপ্তকীর্ত্তি কীর্ত্তনে আনন্দ বাবু সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহার পক্ষপাতী।

ফরিদপুরের ইতিহাস আলোচনাতেও ইনি যেরূপ গবেষণা-ভূয়োদর্শনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বগৌরব অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই ভরসা করি। ফরিদপুরের ইতিহাস শেষ হইলে নিশ্চয়ই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন ঐতিহাসিকের যশোরাজি দিগ-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই বহু জ্ঞাতব্য তথ্যোপূর্ণ পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র প্রচার করা হইয়াছে, শীঘ্রই এই পুস্তকখানিকে পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করি। আমরা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে উহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব, ইচ্ছা করিতেছি।

বঙ্গবাসী

১৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রথমেই

রেণেল সাহেব কর্ত্তৃক অঙ্কিত ফরিদপুরের প্রাচীন মানচিত্র। রাজনগরের একুশরত্নের চিত্রও এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের সীমা, প্রধান চর, বিল, নদী, খাল, পথ, পশু, পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদির বিবরণ এবং বিক্রমপুরের সেন রাজবংশের কথা, চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কথা, কালাপাহাড়, সীতারাম রায় প্রভৃতির কথা আলোচনা হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস যত অধিক সঙ্কলিত হয়, ততই ভাল। এই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়।

নায়ক

শুক্রবার, ২রা পৌষ ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত

এই গ্রন্থে শিক্ষনীয় বিষয় অনেক আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা সেই পরিশ্রমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ফরিদপুর হিতৈষিণী

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফরিদপুরের ভূগোল ও ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতেছে। ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকিলে গ্রামে গ্রামে সকলকে তাহা সংশোধন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে পরগণা, জমির সংখ্যা,

খাস, তৌজী, চর, বিল, নদী; খাল, পশু, পক্ষী, মৎস্য, প্রাচীন মন্দির, জাতি, ধর্ম্ম, হিন্দুদিগের শ্রেণীবিভাগ, জাগ্রত দেবতা, ধর্ম্মশালা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, শস্যের স্থান নির্দ্দেশ, প্রাকৃতিক বিবরণ, বিক্রমপুর, সেন রাজবংশ, দ্বাদশ ভূম্যধিককারীর বৃত্তান্ত, কালাপাহাড়, সংগ্রামসাহা ইত্যাদি। ফরিদপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনানৈপুণ্য অতি সুন্দর, পুরাতন বিলুপ্ত প্রায় রত্নরাজী উদ্ধার করিয়া আনন্দবাবু সাধারণের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি অমর হইয়া ভাবী বংশধরগণের নিকট বহুল সম্মানে বিরাজ করিবেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ ইহাকে অর্থ ও সংবাদ প্রদানে উৎসাহিত করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

হিতবাদী

২৭শে ফাল্গুন, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, শ্রীআনন্দনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। আমরা এ পুস্তকের প্রশংসা করিতে বাধ্য, কেন না ইহা সুলিখিত।

নব্যভারত

অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড। ভৌগোলিক তত্ত্ব ও ...র এবং দেশের ইতিবৃত্ত। শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। একখানি ম্যাপ ও ... ছবি আছে। আমরা বহুদিন এই গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা কর...

যদিও কতকাংশ পাইলাম বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। গ্রন্থকারের গবেষণা অসাধারণ। তাঁহার লেখা বারভূঞার কথা চুরি করিয়া কত লেখক প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইয়া উঠিয়াছেন। সে কথা থাকুক। আনন্দবাবুর বাঙ্গলা প্রাঞ্জল। আশা করি, ফরিদপুরের প্রতি হিতৈষীর নিকট এই পুস্তক বিশেষ আদর পাইবে। স্বদেশী মিলের কাগজে ছাপা।

প্রবাসী

মাঘ, ১৩১৬ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। নব্যভারত প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহা প্রথম খণ্ড। ইহাতে ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে। ফরিদপুর জেলার নদ, নদী, খাল, বিল, পথ, ঘাট, জাতি, ধর্ম্ম, পশু, পক্ষী, মৎস্য, দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পপ্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একখানি ম্যাপ ও রাজনগরের একুশ রত্নের মঠের একখানি চিত্র আছে। ইহা সাহিত্যপারিষদ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। জাতীয় ঐতিহাসিক ইহার মধ্যে বহু উপকরণ পুঞ্জীভুত দেখিতে পাইবেন। ভাষা ভাল। ছাপা কাগজ চলনসই। এই সকল গ্রন্থ প্রত্যেক লোকের পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এই রকম গ্রন্থেই আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর এক্ষণে ঢাকা ও ফরিদপুরের এজমালি। সুতরাং বিক্রমপুরের গৌরব এখন উভয় জেলার আলোচ্য ফরিদপুর সম্প্রতি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাতে ভুল ও সমালোচ্য গ্রন্থে দুই গ্রন্থকার স্বাধীন গবেষণায় যে সব করিতে অনুরোধ হইয়াছেন তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া ভবিষ্য

প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। এইরূপ গ্রন্থ ভাষাকে সম্পৎশালী করিতেছে। আমরা আশা করি, ফরিদপুর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঐতিহাসিক চিত্র

ফাল্গুন, ১৩১৬ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। প্রথম খণ্ডেই রায় মহাশয় ঐতিহানিক তত্ত্বানুসন্ধানের এবং তৎসম্বন্ধে নিজের যুক্তিতর্ক বলে তথ্য নির্ণয়ের অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুরের ভৌগোলিক তত্ত্ব লইয়াও বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন জমিদারীর কাগজপত্র দেখিয়া তিনি যেরূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অল্প দিনের ও অল্প পরিশ্রমের ফল নহে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের প্রাচীন ইতিহাস আলোনায় তিনি সেন বংশের, পাল বংশের, মুসলমান রাজত্ব কালের নবাব ও সুলতানের, বারভূঞার এবং বহু প্রাচীন জমিদারবংশের অধিকার, রাজত্ব, যুদ্ধ, বিদ্রোহ প্রভৃতির সপ্রমাণ বিবরণী এত অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন যে, পড়িতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি পুস্তকখানিতে কৌতুহলজনক বাঙ্গালী জাতির গৌরবজনক, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবর্দ্ধক, আত্মসম্মানবর্দ্ধক ও অতীতের বহু পুরাতন মধুর কথা সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রার্থনা করি ভগবৎকৃপায় রায় মহাশয় সত্বরে অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত করিয়া দেশের ও দশের নিকট আদর ও সম্মান লাভ করুন। আশা করি ফরিদপুরবাসী প্রত্যেকে এবং ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তকের গ্রাহক হইয়া দেশের প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলনকর্ত্তাদিগকে উৎসাহিত করুন।

ভারতী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস

শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত ১ম খণ্ড

ইতিহাসের প্রতি বাঙ্গালী লেখক ও পাঠক উভয়ের যে আগ্রহ দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা যে দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি হইতে লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে একখানি প্রাচীন মানচিত্র রাজনগরের একুশ রত্নের একখানি প্রাচীন ম্যাপ আছে।

বঙ্গদর্শন

বৈশাখ, ১৩১৭ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত ইতিহাসের উপকরণ যতই সংগ্রহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। হিসাবে সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উপকারিতা আছে। ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রাবণ, ১৩১৭ সন

আনন্দবাবু পরিণত বয়সে যে উৎসাহে ফরিদপুরের ইতিহাস উদ্ধা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অনুকরণ যোগ্য এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহু যত্নে যে সকল কিংবদন্তীর সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল ঐতিহাসিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ভরসা করি এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

	Jun/45	48-0-0		
	Tax $\frac{1}{3}$ rs. of Rs 8/7/- p.a.p. for Nov/45	2-13-0		
Western Set of Munsif's qrs at Kalwan	Vacant	-	-	-